মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥২।১৫
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥২।১৬

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

চুয়াল্লিশ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ
১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
সহঃ সম্পাদক : শ্রী আশুতোষ ঘোষ

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৯'০০ টাকা। গ্রাহক গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১'৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পাইকারী হারে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১৫'০০ টাকা ও ৭'৫০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত করা হয়। বার্ষিক-গ্রাহক-গ্রাহিকাশ্রেণিকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে 'বিশ্ববাণী' না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।

- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে 'বিশ্ববাণী' অফিসে জানাইতে হয়।

- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।

- 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহকশ্রেণিভুক্ত সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হইবে এবং দস্তুরীতি চাঁদা ধার্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে 'বিশ্ববাণী' বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।

- 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০'০০ টাকা (১০%) কমিশন পাইবেন।

- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank-এর চেক পাঠাইলে Bank Charges বাবদ অতিরিক্ত ২'০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৫৫ ১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ১০-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:।

॥ অনুরোধসূচক বিজ্ঞপ্তি ॥

বিশ্ববাণীর সহৃদয় পাঠকপাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য জানাই যে, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি, ছাপার খরচ বৃদ্ধি এবং ডাকমাশুল তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 'বিশ্ববাণী' প্রকাশের ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে বিশ্ববাণীর বর্ধিত গ্রাহকমূল্য বার্ষিক সডাক ১৪·· টাকা ধার্য হওয়ায় বেশকিছুসংখ্যক গ্রাহকগ্রাহিকা এপর্যন্ত মূল্য পাঠাইতে সমর্থ হন নাই। ফলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং বর্ধিত ব্যয় সংকুলানের জন্য পুনরায় গ্রাহকমূল্য বৃদ্ধি করাও সম্ভব নহে। এই জটিল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহকসংখ্যার উন্নতি। এই গুরু-দায়িত্ব বিশ্ববাণীর কর্তৃপক্ষ এবং অনুরাগী পাঠকপাঠিকাবর্গকে সমানভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস যে, দীর্ঘকালব্যাপী সমাজসেবায় ব্রতী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের শিক্ষা ও ভাবাদর্শের প্রচারক এবং একই সাথে উচ্চতম মানের ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, সাহিত্য ও চিন্তাধারার ধারক ও বাহক 'বিশ্ববাণী'র অগ্রগতি অব্যাহত রাখা দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রই নিজ কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

'বিশ্ববাণী'র এই সঙ্কটাবস্থায় সকল গ্রাহকগ্রাহিকার নিকট তাই বিনীত আবেদন যে, তাঁরা নিজ নিজ আত্মীয়পরিজন অথবা বন্ধুমহলে যথাসাধ্য নূতন গ্রাহকগ্রাহিকা করুন। ভাদ্র মাস হইতে 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যাইবে। ষাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য মাত্র ৮·· টাকার বিনিময়ে পূজার বিশেষসংখ্যাসমেত পরপর ৬টি সংখ্যা পাইবেন। M.O. মারফৎ গ্রাহকমূল্য ৮·· টাকা এবং M.O. কুপনে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলে নূতন গ্রাহক/গ্রাহিকাদের নাম 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহকতালিকাভুক্ত করা হইবে এবং ভাদ্র '৮৯ সংখ্যা হইতে মাঘ '৮৯ সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হইবে। ডাকের গোলযোগে কোন সংখ্যা না পাইলে সেই সংখ্যাটি পুনরায় পাঠানো হইবে। পত্রিকা এই অফিস হইতে সংগ্রহ করিলে ষাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য ৮·· টাকার পরিবর্তে ৭·· টাকা মাত্র জমা দিতে হইবে। বার্ষিক গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক হইলে M. O.-যোগে ১৪·· টাকা পাঠাইতে হইবে। বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকাদের বর্তমান বর্ষের শুরু, গত ফাল্গুনের বিশেষ সংখ্যাসমেত এযাবৎ প্রকাশিত সকল সংখ্যাই ডাকযোগে পাঠানো হইবে। ফাল্গুন '৮৯ হইতে বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ১৪·· টাকা পাঠাইয়া সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাই 'বিশ্ববাণী'র বার্ষিক গ্রাহকতালিকাভুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই অফিস হইতে সংগ্রহকারী গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ১৪·· টাকার পরিবর্তে ১৩·· টাকা জমা দিতে হইবে।

'বিশ্ববাণী'র পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আগ্রহী পাঠকপাঠিকাদের এই অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করি।

—কর্মাধ্যক্ষ

প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ চতুর্থ ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

- এই চতুর্থ ভাগে ২৩টি পরিচ্ছেদ, একটি পরিশিষ্ট ও শ্রীশ্রীকথামৃত যে সাহিত্য ও দর্শন-মুখর একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ তাহা লিখিত হইয়াছে।
- এই চতুর্থ ভাগের প্রধান আলোচ্য বিষয় : হঠযোগ ও রাজযোগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, প্রতিমাপূজার প্রতিপাদ্য বিষয়, ঈশ্বরের অবতরণ ও অবতারবাদ, ষটচক্রের বিশদ বর্ণনা ও সপ্তভূমির সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি, পঞ্চকোষসাধন ও তার ক্রম, বেদান্তে আনন্দময়-অধিকরণ ও পঞ্চকোষরহস্য, মন্ত্রসাধনা ও জপমালা, অনাহত বা অবাঙ্ময়-নাদ, ষ্টার-থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ, বিজয় গোস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণযাত্রায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে-চারিশত পৃষ্ঠা, ডিমাইসাইজ। ছবি : শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীমা সারদাদেবীর একটি নূতন চিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাতের লেখা এবং রামায়ণের পুঁথি-নকলের ২ পৃষ্ঠা, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের বেঞ্চিতে বসা একটি গ্রুপ-ফটো এবং শ্যামপুকুর-বাটির ৪টি ছবি।

মূল্য—পঁচিশ টাকা

প্রকাশোন্মুখ—

মন ও মানুষ—দ্বিতীয় ভাগ

অভেদানন্দ দর্শন—প্রথম ভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক

শৈলালাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট · কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড
শান্তিরস সালসা
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে
বাত বেদনায় অব্যর্থ
৯০১/৭ এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

ফোন : ৪৪-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'অমুদ্রাক্ষ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৪৪,৪৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৪৪ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০৭৩

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০.০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	১০.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম্ম	২৫.০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৭.০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০.০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫.০০	বাংলার কবি	১০.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪.০০	বাংলার মনীষী	৪.০০
		বাংলার বিদুষী	৭.০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

Phone : 55-2526
64-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004
(Front of Shyambazar Tram Dept)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timestar, Shreeshyla, Sandoz, Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hes, Anglo-Swiss & Favre-Leuba Time Pieces,

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কেয়োড়

মহাড়ম্বরোজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্র'স

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

ফোন নং ২৩-১৮০৫-৯ (৫টি লাইন)

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, ডাক্তার সুধাকর মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধালয়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

শ্রাবণ, ১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন। ● স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়। ● প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ। ● ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন। ● প্রতি রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন · ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার

ফটো

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি, ৬

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোং

প্রস্তুতকারক :- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও "JECY" ব্রাণ্ড পলিথিন গাইজ ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা - ৭০০০০৯

কেশুতে পাতার রসে ও গন্ধে

কেশুত

কেশতৈল

নিধ্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

বিশ্ববাণী

শ্রাবণ, ১৩৮৯

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	২১৯	
২।	কামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ	২২৬	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	২৩১	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৪।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	২৩২	শ্রীঅচিকেতা ভরদ্বাজ
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে : শশধর তর্কচূড়ামণি	২৩৭	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৬।	বৌদ্ধ সম্মেলন ও বৌদ্ধচিন্তা— স্বামী অভেদানন্দ	২৪১	অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৭।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা	২৪৪	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৮।	অভিনবগুপ্ত-কর্তৃক রসসূত্রের ব্যাখ্যা	২৪৭	অনুবাদক : শ্রীপরিমল চট্টোপাধ্যায়
৯।	গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে	২৪৯	শ্রীতপন কলিরাজ
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২৫২	
১১।	সংঘ-বার্তা	২৫৪	

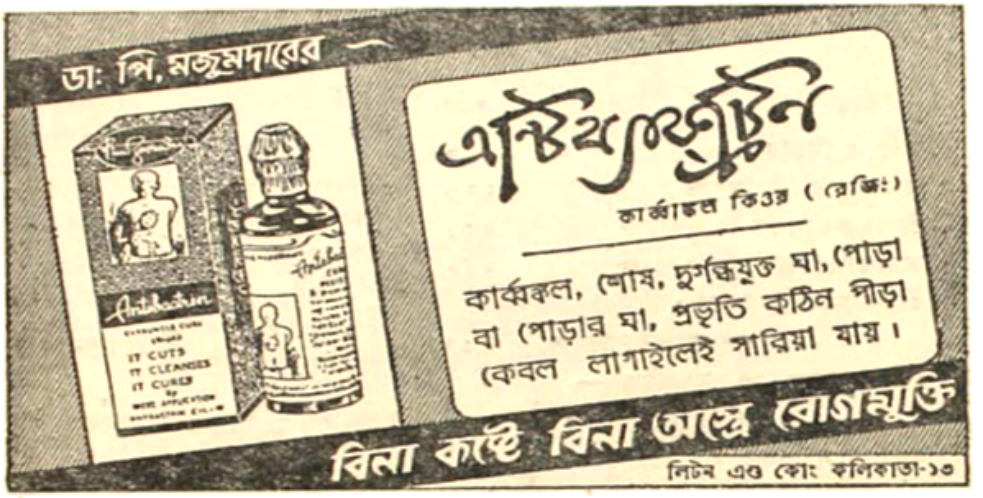

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMA

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

87, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

চুয়াল্লিশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩৮৯

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি ॥

(পূর্বভাগ)

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি। তারা (কর্ণেল অলকট—Colonel Olcott প্রভৃতি) কি ভক্তি খোঁজে? তা হলে ভাল। ভগবান-লাভ যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলেই ভাল।.....তাঁর (ঈশ্বরের) পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জিনিষ থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে (ঈশ্বরের) লাগাতে হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, (১৩৬৬), পৃঃ ২৩৭

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, উনবিংশ খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রসঙ্গ। শিরোনামার আলোচ্য বিষয়: 'পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকযোগ—রাধাকৃষ্ণ, তাঁরা কে? আদ্যাশক্তি'। "এইবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাদচারণ করিতেছেন—কখনও ঘরের ভিতর, কখনও ঘরের দক্ষিণদিকের বারান্দায়, কখনও বা ঘরের পশ্চিমদিকে গোল-বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ছোট-খাটটিতে বসিলেন। বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ভক্তেরা আবার মেজেতে আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর ছোট-খাটটিতে বসিয়া চুপ করিয়া আছেন। এক-একবার ঘরের দেওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দেওয়ালে অনেকগুলি পট (ছবি) আছে। ঠাকুরের বামদিকে শ্রীশ্রীবীণাপাণির পট, তাহার কিছু দূরে নিতাই-গৌর ভক্তসঙ্গে

কীর্তন করিতেছেন। ঠাকুরের সম্মুখে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ছবি ও মা-কালীর মূর্তি। ঠাকুরের ডানদিকে দেওয়ালের উপর রাজরাজেশ্বরী-মূর্তি; পিছনে দেওয়ালে যীশুর ছবি রহিয়াছে—পীটর ডুবিয়া যাইতেছেন, যীশু তুলিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে (শ্রীম-কে) বলিতেছেন: 'দেখ, সাধু-সন্ন্যাসীর পট ঘরে রাখা ভাল। সকাল-বেলা উঠে অন্য-মুখ না দেখে সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখ দেখে উঠা ভাল। ইংরাজী-ছবি দেওয়ালে—ধনী, রাজা Queen-এর ছবি— Queen-এর ছেলের ছবি, সাহেব-মেম বেড়াচ্ছে তার ছবি রাখা—এ'সব রজোগুণে হয়"।

শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় স্মৃতির ফলকে জাগরূক রাখার জন্য অদূর ও দূর-ভবিষ্যতের সকল শ্রেণীর মানুষদের জন্য তখনকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের যেন ছবি এঁকেছেন। অতীতকে মনে রাখা সকল মানুষের পক্ষেই ভাল, কেননা তাহলে বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে অতীতের পরিবেশকে মিলিয়ে নিয়ে মনে রাখার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। আর সেই মনে রাখার কাজ মনে বিচিত্র-ভাবের উদ্দীপনা বা জাগরণকে সাহায্য করে। মাষ্টার মহাশয়ের প্রচেষ্টা এখানে সার্থক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই এর ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: "যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে, সেরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ (আবার গুণও)। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ (association) লোকে খোঁজে। পরমহংসেরা দু'পাঁচজন ছেলে (শিশু) কাছে রেখে দেয়,—কাছে আসতে দেয়—পাঁচ-ছয় বছরের। ঐ অবস্থায় (সিদ্ধ-পরমহংসের অবস্থায়) ছেলেদের (সরলমতি শিশুদের) ভিতর থাকতে ভালোলাগে। ছেলেরা (একেবারে শিশুরা) সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ কোন গুণের বশ নয়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৬)। তারপর বলেছেন: "গাছ দেখলে তপোবন মনে পড়ে—ঋষি তপস্যা করছে,—উদ্দীপন হয়"। স্থানের ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের উদ্দীপন হয় (অর্থাৎ স্মৃতির ফলকে বাস্তব-দৃশ্যের মানস-ছবি মনে ভেসে মনকে প্রেরণাদীপ্ত করে)।

নিরোগ-স্বাস্থ্যবান শরীর ও মন গড়ে তোলার জন্য সকল-কিছুরই প্রয়োজন আছে। সেজন্য শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীকথামৃতগ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার ও উপদেশের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি অবস্থায় ও কি পরিবেশের মধ্যে সেই সকল কথা ও ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন তাদের চাক্ষুষ পরিচয় দিয়েছেন মাষ্টার মহাশয়। শ্রীম-কে তাই একাধারে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী বলা যায়।

ঐ প্রসঙ্গক্রমে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শিশুদের কথা বলেছেন, কেননা পরমহংস বা স্থিতপ্রজ্ঞ-মহামানব ও জীবন্মুক্ত যাঁরা—তাঁরা মায়ার কুহেলিকার ভরা সংসারে থেকেও সকল-কিছু সংকীর্ণতা ও বন্ধনের পারে অবস্থান করেন। মন তাঁদের স্বচ্ছ-সরল, কেননা তাঁদের মন পরমপবিত্র চৈতন্যে রূপায়িত হয়। এজন্য সংসারের সঙ্গীরূপে তাঁরা সহজ-সরল-স্বভাবসম্পন্ন শিশুদের সঙ্গ ভালবাসেন এবং ভালবাসাই স্বাভাবিক। গীতার (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মুখে 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা···স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমাসীত ব্রজেত কিম্' (২।৫৪) প্রভৃতি পরমহংস ও মহামানবদের বাহ্যিক-লক্ষণের কথা বা প্রশ্ন-প্রসঙ্গ এনে পরিশেষে বলেছেন—

'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থীতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎপ্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥'

অর্থাৎ অর্জুনের চারটি প্রশ্ন : (১) পরমহংস ও স্থিতধীর লক্ষণ কি ? (২) জীবন্মুক্ত-পরমহংস বা স্থিতধী কি (কিরকম) কথা বলেন ? (৩) কিভাবে সংসারে তাঁরা বাস করেন ? ও (৪) কিভাবে বিচরণ অর্থে সংসারী লোকের সঙ্গে তাঁরা বাস করেন ও ব্যবহার করেন ? এই চারটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : 'যিনি আত্মতুষ্ট, যাঁর সকল বাসনা-কামনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে, আত্মানুভূতিতে যিনি ভালো-মন্দ-কোন-কিছুর সঙ্গেই যুক্ত নন, যিনি সর্ববিষয়ে নিরাসক্ত সুতরাং পক্ষপাতিত্বহীন উদাসীন, তিনিই প্রজ্ঞাবান পরমহংস। গীতার এই লক্ষণযুক্ত পরমহংসের নিদর্শন শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সম্পর্কেই পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন ব'লে মনে হয়।

তারপর স্বামী দয়ানন্দের প্রসঙ্গ। ব্রহ্মের দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) যখন (১৮৭২-১৮৭৩ মার্চমাসে) কলকাতায় ঠাকুরদের নৈনালের প্রমোদকাননে গিয়েছিলেন তখনই সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাৎকার হয় সেখানে কেশবচন্দ্রের ও নেপালের কাপ্তেনের সঙ্গেও।

কর্নেল অলকট প্রভৃতি থিয়োজফিষ্টরা অতিবাহিক-দেহধারী 'মাহাত্মা' প্রভৃতি পুরুষদের কথা বিশ্বাস করতেন। আর বিশ্বাস করতেন চন্দ্রলোক, সূর্যলোক প্রভৃতি গ্রহে স্থানের কথা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন (যা এখনো থিয়োজফিষ্টরা বিশ্বাস করেন) যে, 'মহাত্মা'-নামধারী মহামানবরা সূক্ষ্মদেহে সর্বত্র গমনাগমন করতে পারেন এবং জিজ্ঞাসু লোকের বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিচিত্র সমস্যার সমাধান করেন। আতিবাহিক তাঁদের দেহ, লোককল্যাণ-সাধন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য ও জীবনব্রত। অবশ্য এ'সকল বিষয়ে প্রশ্নেরও অবকাশ আছে অনেক এবং এদের সত্যতাও কতদূর তা চিন্তার ও বিচারের বিষয়।

সিংহির একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত থিয়োজফিষ্টদের মতবাদ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন : 'আজ্ঞা মহাশয়, আপনার থিয়োসফি কি রকম বোধ হয় ?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রত্যক্ষভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলেন : "ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি। তারা (থিয়োজফিষ্টরা) কি ভক্তি খোঁজে ? তা হ'লে ভাল। ভগবান-লাভ যদি উদ্দেশ্য হয়—তা হলেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই সব নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না। তাঁর (ঈশ্বরের) পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন করা চাই, ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই" প্রভৃতি।

অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে থিয়োজফিষ্টদের ধর্ম ও বিশ্বাস-সম্বন্ধে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে যে উত্তর দেন নি—তা নয়, তবে সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে কোন বাদানুবাদ তিনি করেন নি। তিনি

বলেছেন সকল ধর্মের ও ধর্মসাধনার সারকথাই ভক্তি এবং সেই ভক্তির নাম ঈশ্বরে ভক্তি। ঈশ্বরকে লাভ করাই সকল ধর্মের ও সকল অধ্যাত্মসাধনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু বিষয়াভিলাষীরা সূক্ষ্মদেহধারী মহাত্মাদের দর্শনলাভের জন্যই সর্বদা উৎসুক, আর উৎসুক চন্দ্র-সূর্যাদি বিভিন্ন গ্রহ-লোকের সম্পর্কে জানার। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'এক সারকথাই—ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরই সকল-কিছুর মূলে ; সুতরাং সকল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসাধনার লক্ষ্য ও সারকথা ঈশ্বরের সম্বন্ধে জানা এবং তাঁর প্রত্যক্ষভাবে দর্শন লাভ করা'।

কিন্তু ঈশ্বরের দর্শন-লাভ করার সত্যকারের অর্থ কি ? বেদান্তে সাকার ও নিরাকার দু'রকম ভাবেই ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হয়েছে। শক্তিসাধক রামপ্রসাদ বেদান্তের ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই বলেছেন—'সাকার আকার নিরাকারা',—যা চৈতন্যময়ী ও নিত্যানন্দরূপিণী কালী সাকার বটে, আবার নিরাকারও বটে। ভক্তের জন্য তিনি সাকার—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, ত্রিপুরসুন্দরী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা এই সব, আবার বিচারী-জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর জন্য নিরাকার। অবশ্য তন্ত্রে কালী বা মহাকালীকে দিগম্বরীও বলা হয়েছে। দিগম্বরী—দিক বা দশদিক তাঁর অম্বর বা বসন, এবং তার অর্থ মা-সচ্চিদানন্দময়ী কালী, মহাকালী বা মহাবিদ্যা 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যা'। এজন্য কালীকে দিগ্বসনাও বলা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক ও অখণ্ড মহাচৈতন্য-ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকারের অর্থ করেছেন অতিসুন্দরভাবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, একই জল, তাপে বাষ্প হয় এবং শীতে বা ঠাণ্ডায় বরফ হয়। অর্থাৎ একই জলের তিন রকম রূপ—জল, বরফ ও বাষ্প। আধুনিক বিজ্ঞানে শক্তিময় ও বাষ্পময় (ধোঁয়ার মতো) নিহারীকা (Nebula) ঘূর্ণায়মান ঝড়ের আকারে কত-শত-গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হয় এবং চিরদিন মহাকাশের কোলে এই সংঘটন অনবরতই হচ্ছে। শক্তিরই ঐ সকল লীলাখেলা। শক্তি বাতাসের মতোই চোখে (চক্ষে) দেখা যায় না, কিন্তু শক্তির প্রবাহ ঘূর্ণীঝড়ের মতো অতিবেগে যখন নিহারীকাপুঞ্জকে গতিশীল ও চঞ্চল করে,তখন তা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত অসংখ্য গতিশীল গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম হয় এবং সেগুলিকে চোখে দেখা যায়। আমাদের পৃথিবীও তেমনি একটি গ্রহ। শক্তির আকারে (পৃথিবী) প্রথমে অদৃশ্য ছিল, বাষ্পের বা শক্তিকণাসমন্বিত ধোঁয়ার আকারে পরে প্রকাশিত হলো এবং পরিশেষে ধীরে ধীরে কঠিন আকারে গ্রহ-উপগ্রহে পরিণত হলো। সমগ্র মহাকাশে নিত্য-নূতন এই খেলা চলেছে। সমগ্র পৃথিবীতে শক্তির প্রেরণায় কত-শত জীব-জন্তু-প্রাণী-পদার্থ প্রথমে অদৃশ্য ও পরে দৃশ্য আকারে নিত্যনূতনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, পরিপালিত হচ্ছে, আবার ধ্বংস হচ্ছে। গীতায় 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি, ব্যক্তমধ্যানি ভারত, অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা' শ্লোকগুলিতে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-রূপ দৃশ্য-অদৃশ্য-তত্ত্বের মর্মকথার আভাস দেওয়া হয়েছে। সাধক রামপ্রসাদের 'সাকার-আকার-নিরাকারা' ও শ্রীরামকৃষ্ণের জল-বাষ্প-বরফের উদাহরণ ঐ একই রহস্য বা মর্মকথার প্রকাশক। সগুণ-নির্গুণের কথাও তাই। যিনি বিশ্বচরাচরের কারণ এবং অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার অধীন—অথচ অধিশ্বর হয়ে বিশ্বকার্য (যেন) সম্পন্ন করেন, তাঁর মহিমার ও লীলারহস্যের ইতি বা নির্ণয় করা অসম্ভব,—আবার সম্ভবও। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'ভক্তিই একমাত্র সার—ঈশ্বরে ভক্তি'-কথার প্রসঙ্গে তাই ভক্তির ও প্রপত্তির আশ্রয় নিতে

বলেছেন। পরিশেষে তিনি বলেছেন: "তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হবার জন্য সাধন চাই; ব্যাকুল হ'য়ে ডাকা চাই। নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে (ঈশ্বরে) লাগাতে হয়"। ছড়ানো-মনকে একত্রিত ও কেন্দ্রগত না করলে মন পরিশুদ্ধ হ'য়ে চৈতন্যে রূপান্তরিত হয় না। মন চৈতন্য না হ'লে মহাচৈতন্যের সঙ্গে তার মিলন হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন পাকা-মনোবৈজ্ঞানিক (Psychologist), তার কারণ তিনি ভালভাবেই মনে বিশ্লেষণ ও বিচার ক'রে বুঝেছিলেন যে, একটানা অর্থে কেন্দ্রমুখী বা একমুখী মন না হলে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি বা যথার্থ-অনুরক্তি হয় না: কিংবা মন ও মুখ এক বা সমান্তরাল না হ'লে মন যথার্থভাবে ব্যাকুল হয় না, সুতরাং (ঈশ্বরে) অনুরাগও আসে না। এই অনুরাগের অর্থ একটিমাত্র বস্তুতে, পদার্থে বা দেবতায় মনের আসক্তি হওয়া। মনের একান্ত-অনুরাগ বা অনুরক্তিই পরিশেষে ভক্তিরূপে দেখা দেয়। এই ভক্তির নাম প্রেমাভক্তি। ভক্তি পাকা অর্থাৎ একান্তভাবে তীব্র ও গাঢ় হ'লে তবে প্রেম হয়। তখন মনের আর অন্য-কোন বৃত্তি বা বিষয়ই থাকে না, একমাত্র ঈশ্বরই হয় বিষয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনন্তভাবে লক্ষ্যও হয় ঈশ্বর, আর তখনই সঞ্চার হয় প্রেমাভক্তির। প্রেমের মধ্যেও আবার তর-তম-বিচার ও পার্থক্য আছে। বৈষ্ণবাচার্যরা শুদ্ধপ্রেমের কথা বলেছেন। শুদ্ধপ্রেম তাঁদের মতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন প্রেম।

একে অনেকে 'জ্ঞানমিশ্রা'-ভক্তি[১] বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই বলেছেন 'কলিতে নারদীয়া বা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি'। এর অর্থ শ্রীভগবানে একান্ত-অনুরক্তির ভাব যেখানে দেখা যায় সেখানেই প্রকাশ পায় অনন্যভক্তি। তবে জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি বলতে মনে হয় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিচারসহকৃত-ভক্তির কথা বলেছেন, সুতরাং কেবলই অনুরাগের বিকাশ ও তারপর ভক্তির আসক্তি নয়, সেই আসক্তির মধ্যে অবশ্যই নিত্য-অনিত্যের বিচার থাকবে। জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধকের মধ্যে তাই থাকে প্রথমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মনোবৃত্তি নিয়ে এবং তারপর একনিষ্ঠার ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে অনন্য বা একান্ত-অনুরক্তিরূপ ভক্তি।

বৈষ্ণবদর্শনে প্রেম, ভক্তি, রতি প্রভৃতির অর্থ একটু ভিন্ন। প্রেমের বিভিন্ন স্তর কল্পনা করেন বৈষ্ণবাচার্যরা। শ্রদ্ধা-সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধ হ'লে অভিপ্রেত সাধ্যবস্তু ইষ্টের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রেম প্রথমে তরল ও সাধারণ, তারপর ঐকান্তিকতার স্পর্শে ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর ও গাঢ়তম হয়ে যথার্থ-প্রেমে রূপান্তরিত হয়। প্রেমের প্রথম-আবির্ভাব বা প্রাথমিক-স্তরকে 'প্রীত্যঙ্কুর' (প্রীতিভাবের অঙ্কুর) বলে। প্রীত্যঙ্কুর আবার রতি ও ভাব দুটিরূপে প্রকাশ পায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বলেছেন: 'প্রীত্যঙ্কুরের রতি ভাব হয় দুই নাম' (২।২২।১৩)। রতির অর্থ প্রেমের প্রথম-প্রকাশ বা প্রীত্যঙ্কুর। রতি বা ভাব ক্রমশ গাঢ় হ'তে হ'তে হয় প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২।১৯।১৫১-৫২ পদে

১। 'জ্ঞানমিশ্রা'-ভক্তি বৈষ্ণবদর্শনে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি বৈষ্ণবাচার্যদের চেয়ে ভিন্ন।

এ'সকল প্রকাশের উল্লেখ করেছেন। তবে মোটামুটি প্রেমের স্তর নয়টি। প্রেমের রূপ-গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে আটটি স্তরের কথা বলেছেন (স্থায়িভাব ৪৪-৪৫ দ্র°)। মহাভাবের আবার দু'টি স্তর—রূঢ়-মহাভাব ও অধিরূঢ়-মহাভাব। অধিরূঢ়-মহাভাব পুনরায় মোদন ও মাদন-রূপে প্রকাশিত। মাদনই গাঢ়তম—সর্বশেষ উচ্চস্তরের ভাব।

রতিরও রকমভেদ আছে। বৈষ্ণবদর্শনে দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, কান্তারতি, কৃষ্ণরতি এই পাঁচ রকম প্রকারান্তর আছে। ঠিক সে'রকম প্রেমও বিভিন্ন প্রকারের কল্পনা করেছেন বৈষ্ণবশাস্ত্রীগণ, যেমন দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম প্রভৃতি। ভাবেরও তেমনি শ্রেণীভেদ আছে—দাস্যভাব, সখ্যভাব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্তর। প্রেমের জীব-গোস্বামী 'প্রীতিসন্দর্ভ'-গ্রন্থে বলেছেন : 'তত্রা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিনিত্যং ভক্তবৃন্দেষেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ-প্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে',—অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধারই সর্বাতিশায়িনী বৃত্তি ভক্তবৃন্দে নিয়ত-প্রতিষ্ঠিত হয়ে 'ভগবৎ প্রীতি' নাম ধারণ করে। এই হ্লাদিনীশক্তিও ভক্তে নিক্ষিপ্ত বা প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এবং সেই বৃত্তি ভক্তগণের বিশুদ্ধচিত্তে গৃহীত হয়ে 'প্রেম'-রূপে প্রকাশিত হয়।[২] একথা মনে রাখতে হবে যে, স্বরূপ-চিচ্ছক্তির হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ এই তিনটি শক্তি।

'জ্ঞানমিশ্রা'-ভক্তির একটু ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন বৈষ্ণবদার্শনিকরা সাধ্য ও সাধকের মধ্যে ভেদভাব নিয়ে।[৩] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গ্রন্থের কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলেছেন : 'রায় কহে—জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্যসার' (চৈতন্যচরিতামৃত ২।৮।৫৭)। শ্রীধর-স্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব-বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ভাষ্য এবং টীকাকারগণও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ পরাভক্তির প্রসঙ্গে বলেছেন—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।

পরমভক্তি ও পরাভক্তি এককথা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (২।৮।৫৭) 'জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি সাধ্যসার' কথাগুলি পুরীধামে গম্ভীরায় রায়-রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের 'কথোপকথন'-প্রসঙ্গকে অবলম্বন ক'রে বলা হয়েছে। বৈষ্ণবাচার্যদের অভিমতে রায়-রামানন্দ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির অর্থ করেছেন নির্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যকামী জ্ঞানমার্গের সাধককে লক্ষ্য ক'রে, কেননা ভক্তি-ছাড়া জ্ঞান লাভ অসম্ভব। শ্রীধর-স্বামীও এ'সম্পর্কে বলেছেন : 'ভক্তিং বিনা জ্ঞানস্য নৈব সিদ্ধ্যেদিত্যাহ প্রেয়ঃস্মৃতিরিতি'। অবশ্য আচার্য শঙ্কর, টীকাকার আনন্দগিরি, ভাষ্যকার মধুসূদন সরস্বতী ও টীকাকার নীলকণ্ঠও পরাভক্তিকে জ্ঞানলক্ষণা-ভক্তি বলেছেন। তবে আচার্য শঙ্করাদি অদ্বৈত-বেদান্তীরা জ্ঞানলক্ষণা বা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির সাধনায় সাধ্য-সাধকের অভেদভাবই প্রতিপন্ন করেছেন এবং সেই অভেদভাবরূপ মোক্ষের নাম 'ব্রহ্মভাব'—'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ'। আর বৈষ্ণবাচার্যরা বলেন সাজুয্যমুক্তি : কেননা সাধকের তথা জীব-ব্রহ্মের অভেদভাব ভক্তিবিরোধী। কিন্তু অদ্বৈতবাদীরা তা স্বীকার করেন না, জ্ঞানমিশ্রা বা জ্ঞানলক্ষণা-ভক্তিই জীব-ব্রহ্মের

২। ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ : 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ', পৃঃ ৬৭৩-৭৪ দ্রষ্টব্য।

৩। পূর্বে ফুটনোটে সেকথা বলেছি।

অভেদপ্রতিপাদক উক্তি। আচার্য রামানুজ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শ্রীধর-স্বামী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্য শঙ্করাদি-অদ্বৈতাচার্যদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নি।[৪] শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু এই জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির বিকাশে সাধক ও সাধ্য-দেবতার মধ্যে ভেদভাব স্বীকার করেন নি বলা যায়, কেননা এই পরা বা পরম-ভক্তিরূপ জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তির বিকাশে সাধকের (জীবের) মধ্যে সকল ভেদভাবের অবসান হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছড়ানো-মনকে একসঙ্গে কুড়িয়ে ঈশ্বরে, পরমচৈতন্য-আত্মায় বা ব্রহ্মে স্থির করতে ('লাগাতে') বলেছেন। জ্ঞানসাধনার শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন বা যোগসাধনার ধারণা-ধ্যান-সমাধির সার্থকতাই তাই যে, স্বভাবত বিক্ষিপ্ত মনকে ধ্যানে স্থির ক'রে সমষ্টি-মহাচৈতন্যের সঙ্গে ব্যষ্টি-চৈতন্যকে এক করা। এই 'এক করার' অর্থ সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে পৃথকভাবে মিশিয়ে এক-করা নয়, সমষ্টিচৈতন্য বা ব্যাপকচৈতন্য ব্রহ্ম ও ব্যষ্টিচৈতন্য জীব এক ও অভিন্ন এটিই উপলব্ধি করা। অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নিকণিকা পরিমাণগত ভিন্ন ব'লে মনে হলেও দাহিকাশক্তিসম্পন্ন অগ্নির কুণ্ড (সমষ্টি বা ব্যাপকচৈতন্য) ও কণা (ব্যষ্টি-জীবচৈতন্য) এক ও অভিন্ন—এই সমরস-সম্পন্ন অভেদানুভূতির সার্থকতা ব্রহ্মজ্ঞানে বা ব্রহ্মভাবে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এরপর সাধক রামপ্রসাদ-রচিত দু'টি গান করেছেন—

১। মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে[৫]
　　যেন উন্মত্ত আঁধার-ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব-ব্যতীত
　　অভাবে কি ধরতে পারে।...

২। ষড়দর্শনে না পায় দরশন
　　আগম-নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক
　　সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥

যেকোন ভাবকে আশ্রয় ক'রে সাধনা করতে হয়,—দাস্যভাব, সখ্যভাব, সন্তানভাব, বাৎসল্যভাব, প্রভৃতি। ভাবের আকর্ষণই সাধ্যবস্তু-দেবতাকে আকর্ষণ করে, চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করে, দেবতার সঙ্গে ভাব ও মনকে এক করে এবং তখনই হয় দর্শন, সিদ্ধি বা অনুভূতি।

'সিদ্ধির জন্য সাধন দরকার' বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। অবতাররাও লোকশিক্ষার জন্য সাধনা করেন (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৮ দ্রঃ)। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: "সাধনের খুব দরকার, কস্ ক'রে কি আর ঈশ্বর দর্শন হয়?" সাধন বলতে আকুলভাবে প্রচেষ্টা। পাতঞ্জলদর্শনে ও গীতায় আছে—

(১) 'অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ'।—পাতঞ্জলদর্শন।

(২) 'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে'—গীতা।

৪। এ'সম্বন্ধে বিশদ-বিচার দ্রষ্টব্য রাধাগোবিন্দ নাথ-লিখিত 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ'-গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৩০৩-৪১৩ দ্রষ্টব্য।

৫। অথবা 'মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে.....'।

ঈশ্বর সর্বত্রই চৈতন্যরূপে, প্রাণরূপে, মহাপ্রাণরূপে শুধু নয়—সর্বরূপে আছেন, আবার নিকটে ও অতিনিকটে মানুষের এবং প্রতিটি প্রাণীর ও পদার্থের মধ্যে (অন্তরে) আছেন : 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি' (গীতা ১৮।৬১)—সর্বভূতের বা সর্ব-প্রাণী-পদার্থের হৃদয়ে সমষ্টি-রূপে (মহাচৈতন্যরূপে) আছেন। কিন্তু তাহলেও সাধন করতে হয় এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টি লোকত ভিন্ন হলেও তত্ত্বত, এক, অভিন্ন ও অখণ্ড-চৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষভাবে তাকে অনুভব বা উপলব্ধি করতে হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "মাখন খেতে ইচ্ছা। তা দুধে আছে মাখন, দুধে আছে মাখন—করলে (চিৎকার করলে) কি হবে? খাটতে হয়—তবে মাখন উঠে। 'ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন' বলে কি ঈশ্বরকে দেখা যায়? সাধন চাই"। (শ্রীশ্রীকথামৃত ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৮)। সাধনই সিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করে।

●

॥ শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

শরৎকাল। শারদীয়া দুর্গাপূজার আনন্দ-দীপ্তি আকাশে-বাতাসে, কলিকাতার মানুষের মুখে-চোখে। কিন্তু শ্যামপুকুরের ভাড়াবাড়ীতে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বাস করছেন, সেখানকার পরিমণ্ডল কিছুটা ভিন্ন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন : 'শারদীয় পূজা-মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহ্যপ্রকাশের পথে বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই এখন অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া করিয়া প্রায় মাসাবধি[১] হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধির উপশম এ পর্যন্ত কিছুমাত্র হয় নাই, উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমনপূর্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে এবং যুবক-ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অন্যসময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে; আবশ্যক বুঝিয়া কেহ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশঘণ্টা এখানেই কাটাইতেছে।'[২] গৃহীভক্তদের মধ্যেও কয়েকজন বিশেষতঃ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মাষ্টারমশায় দিনরাতের অনেকাংশ সময় ঠাকুরের সেবায় অতিবাহিত করিতেছিলেন।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাড়ীতে এসেছিলেন ২রা অক্টোবর, আজ ১৭ই অক্টোবর।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪ খণ্ড, পৃঃ ১৮৪

লীলাপ্রসঙ্গকারের বিবরণ থেকে আমরা শ্যামপুকুরবাটীর একটি অন্তরঙ্গ চিত্র পাই। তিনি লিখেছেন: 'অধিক কথা কহিলে এবং বারংবার সমাধিস্থ হইলে শরীরের রক্তপ্রবাহ ঊর্ধ্বে প্রবাহিত হইয়া ক্ষতস্থানটিকে নিরন্তর আঘাত-পূর্বক রোগের উপশম হইতে দিবে না, চিকিৎসক ঐজন্য ঠাকুরকে ঐ উভয় বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিলেও ভ্রমক্রমে তিনি বারংবার উহার বিপরীত কার্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ "হাড়মাসের খাঁচা" বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীররক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্বের ন্যায় উহাতে যোগদানপূর্বক বারংবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার দর্শন পায় নাই এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐ কার্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ-আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন, কেহ কেহ আবার নবাগত ব্যক্তিসকলকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্মভাবপ্রচারের নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ উপায় কিছুকালের জন্য অবলম্বন করিয়াছেন—এইরূপ মত প্রকাশপূর্বক সকলকে নিঃসংশয় করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।'[৩]

আজ শ্রীশ্রীদুর্গাসপ্তমী। ৩১শে আশ্বিন ১২৯১; ১৫ই অক্টোবর ১৮৮৪।

মাষ্টারমশায় ভক্ত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী খিচুড়ী প্রসাদ পান। সেখান হ'তে ছোট নরেনের বাড়ীতে যান। তাঁর বাবার সঙ্গে মাষ্টারমশাই প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে কথা বলেন। তারপর মাষ্টারমশায় উপস্থিত হন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট। তখন বেলা প্রায় চারটা।

মণি মল্লিক-প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত ঠাকুরের সামনে বসিয়া ছিলেন। মণি মল্লিক পুরাতন ব্রাহ্মভক্ত। বয়স সত্তরের মধ্যে। তিনি থাকেন সিঁদুরিয়াপট্টীতে, ৮১, চিৎপুর রোডে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছেন: জনৈক বহু উকিলবাবু গত পাঁচ বছর ধরে অসুখে ভুগছেন। তিনি উপস্থিত বলরাম বসুকে বলেন ঐ-রুগী সম্বন্ধে সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করতে।

মণি মল্লিকের এক অল্পবয়স্কা বিধবা আত্মীয়া ছিলেন, নাম নন্দিনী। ভক্তিমতী এই রমণী ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন নন্দিনী এসে ঠাকুরকে নিবেদন করেছিলেন, ধ্যান করতে বসলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ মনে পড়ে মনকে চঞ্চল করে। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, 'কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?' নন্দিনী বলেন, 'একটি ছোট ভাইপোকে।' ঠাকুর উপদেশ দেন, নন্দিনী যেন ভাইপোকে গোপাল-রূপী ভগবান ভেবে সেবাযত্ন করেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, 'শুনিতে পাই, ঐরূপ করার ফলে অল্পদিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমন কি ভাব-সমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল।'[৪]

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, পৃঃ ১২৫

৪। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩ খণ্ড, পৃঃ ২৮। সে-সঙ্গে ঐ গ্রন্থের ৪ খণ্ড, পৃঃ ৯৭ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখন মণি মল্লিককে বলেন : নলিনীকে একবার দেখতে ইচ্ছা। তিনি আবার মাষ্টারমশায়কে বলেন : বড় ভক্ত।

ডাক্তার সরকার তাঁর এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করলেন। তাঁর দিব্য স্বরলহরী শুনতে শুনতে সকলে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকটে উপবিষ্ট ডাক্তার সরকারকে গানের ভাবার্থ মাঝে মাঝে বুঝিয়ে বলতে থাকেন। আবার কখনও বা 'অল্পক্ষণের জন্য সমাধিই হয়ে পড়েন।' কোন কোন ভক্তও ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারালেন। অধ্যাত্মভাবের প্রবাহে হলঘর জমজম করতে থাকল। শেষে ডাক্তারের সময় সম্বন্ধে হুঁশ হয়। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বেজেছে। তিনি আনন্দভরে নরেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করেন। তারপর তিনি ঠাকুরের নিকট বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।[৫]

এমন সময়ে ঠাকুর মাষ্টারমশায়কে বলেন : কত বেজেছে ?

ঠাকুর আবার দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বলেন : দেখ দেখি, ঘড়ি আছে ?

মাষ্টারমশায় অবাক হয়ে যান, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সময় জানবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছেন কেন !

এদিকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিমগ্ন হন। ডাক্তার সরকার ও তাঁর ডাক্তার বন্ধু বিস্মিত হয়ে যান। ডাক্তার কখনও এমন ঘটনা দেখেন নি। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে ডাক্তার সরকার ঠাকুরের হৃদয়ের স্পন্দনাদি যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁর ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের উন্মীলিত চোখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action) হয় কিনা। 'ফলে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, বাহিরে দেখিতে সম্পূর্ণ মৃতের ন্যায় প্রতীয়মান ঠাকুরের এই সমাধি অবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোনরূপ আলোক এখনও প্রদান করিতে পারে নাই, পাশ্চাত্য দার্শনিক উহাকে জড়ত্ব বলিয়া নির্দেশ ও ঘৃণা প্রকাশপূর্বক নিজ অজ্ঞতা ও ইহসর্বস্বতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।'[৬]

ডাক্তার সরকার ও তাঁর ডাক্তার বন্ধু চলে যাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন তাঁর এক অলৌকিক দর্শনের কথা। তিনি জ্যোতির্ময় পথ ধরে ভক্ত সুরেন্দ্রের দুর্গামণ্ডপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ভক্ত সুরেন্দ্রনাথের বাড়ী সিমলায়। তিনি এবছর বাড়ীতে শারদীয়া পূজার ব্যবস্থা করেছেন। পূর্বে তাঁদের বাড়ীতে প্রতি বৎসর পূজা হত। একবার 'বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায়' পূজা অনেকদিন বন্ধ ছিল। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিঘ্নকে ভয় করেন না। তাছাড়া তিনি দুর্গাপূজা করবার ঠাকুরের অনুমতিও লাভ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ পরিবারবর্গের প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করে সকল বাধাকে নিজে বহন করে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন।

৫। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, পৃঃ ১০৭

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৫০

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দর্শনের বর্ণনা দিয়ে বলেন : 'এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ[৭] হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে। দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা' 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে।'[৮]

দশমীর দিন[৯] (১৮ই অক্টোবর) সকালবেলা সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন : 'কাল ৭টা ৭॥টার সময় ভেবে দেখলাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে ওখানে এক হয়ে আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দু'জায়গার মধ্যে রয়েছে!—এ বাড়ী আর তোমাদের সেই বাড়ী।' সুরেন্দ্রনাথ বলেন : আমি তখন ঠাকুর-দালানে মা মা বলে ডাকছি, দাদারা ত্যাগ করে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো, মা বললেন, "আমি আবার আসবো।"'[১০]

স্বামী অভেদানন্দের বর্ণনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তিনি লিখেছেন : "শারদীয়া মহাষ্টমীর সন্ধ্যার পর সন্ধিপূজার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ ভাবাবেগে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নরেন্দ্রনাথ, আমি, লাটু, নিরঞ্জন ও অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার শ্রীচরণে আনন্দে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন। পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, "একটা জ্যোতির রাস্তা দেখলাম। সেই রাস্তা এখান থেকে সুরেন্দ্রের ঠাকুরদালানে শেষ হয়েছে। সেখানে মা দুর্গার প্রতিমার একপার্শ্বে দেখলাম সুরেন্দ্র কাঁদছে।"'[১১]

বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল এই দর্শনের স্পষ্টতর এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : "ভক্তবৎসল প্রভু মহাষ্টমী দিনে শুভ-সন্ধিক্ষণে ভাবাবেশে জ্যোৎমার্গে পূজামণ্ডপে যাইয়া[১২] দেখেন

৭। এবিষয়ে পুঁথিকার লিখেছেন : কি সুন্দর প্রতিমার জ্যোতি উঠে গায়।
ফীণপ্রভা দীপমালা তাহার প্রভায়। (পৃঃ ৭৮৪)

৮। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২ খণ্ড, পৃঃ ১৯৭-৯৮

৯। প্রকাশিত কথামৃত-অনুসারে ঠাকুরের এই দর্শন ঘটেছিল নবমীর দিন, ১৭ অক্টোবর। স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের মতে এই ঘটনা ঘটেছিল মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার সময়ে। সেবার সন্ধিপূজার সময় ছিল সন্ধ্যা ৭-৪০ থেকে ৮-২১ মিঃ পর্যন্ত। সেবার মহাষ্টমী পড়েছিল ১৬ই অক্টোবর। অক্ষয়কুমার সেনের মতে এই ঘটনার সময় সপ্তমীর সন্ধ্যায়। আর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী পৃঃ ৩৩০ অনুযায়ী এই দর্শনের সময় সপ্তমী (১৫ই অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭॥০টার পরে। দশমীর দিন অর্থাৎ ১৮ই অক্টোবরের মাষ্টারমশায়ের ডায়েরি আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

১০। কথামৃত ৩।২০।১

১১। আমার জীবনকথা, পৃঃ ৭৮-৭৯

১২। পুঁথিকারও প্রায় অনুরূপ এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন : 'জ্যোতির্ময় পথ এক অতি পরিসর।
এখান হইতে গেথা সুরেন্দ্রের ঘর।
তার মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে।
আবির্ভাব অধিকার পূজার দালানে।'

যে, সুরেন্দ্রের ভক্তিযোগে প্রতিমাতে জগন্মাতার আবির্ভাব হইয়াছে, আর তিনি গদ্‌গদ্‌ভাবে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছেন।···সুরেন্দ্রনাথের ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার হৃদয়ের পূজা গ্রহণান্তে ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসিয়া নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ সন্তানগণকে সমস্ত ব্যাপার কহিয়া জগন্মাতার প্রসাদ গ্রহণ করিতে সকলকে সুরেন্দ্র-ভবনে পাঠাইয়া দেন।[১২৩]

ঠাকুরের আদেশে নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ ও অন্যান্য ভক্তগণ সুরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে যান। সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে তাঁরা জানতে পারেন যে, ঠাকুর দালানের যে-স্থান বলেছিলেন সে-স্থানে দীপমালা দেওয়া হয়েছিল এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সামনে উঠানে বসে প্রাণের আবেগে 'মা' 'মা' বলে প্রায় একঘণ্টা বালকের মত চেঁচিয়ে কেঁদেছিলেন। উপরন্তু স্বামী অভেদানন্দের লেখা থেকে জানতে পারি যে, সুরেন্দ্রনাথ যখন কাঁদছিলেন সে-সময়ে হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে "পরমহংসদেব শ্রীশ্রীদুর্গাপ্রতিমার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন।"

এই সব-কিছু দেখে শুনে ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। ভক্তিতে আপ্লুত ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমার গুণগান করতে থাকেন।

এদিকে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ঘটে আরেক বিচিত্র লীলা। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে বসেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে দেবেন্দ্রনাথের দিকে এগিয়ে যান এবং তাঁর বুকে শ্রীচরণ স্থাপন করেন। আবার ভাব প্রশমিত হ'লে ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে খাবার খাইয়ে দেন।

বলাবাহুল্য, ভাগ্যবান দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অযাচিত এই কৃপালাভ করে নিজেকে বিশেষ ধন্য মনে করেন।[১৪]

●

১৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম সং, পৃঃ ১৮৩

১৪। এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর অন্যতম আকর পূজনীয় মাষ্টারমহাশয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬০০-৬০১

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ঐ সময়ে যখন স্বামী অভেদানন্দ ইংলণ্ডে ছিলেন তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড-জুবিলী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জুন ডায়মণ্ড-জুবিলীর শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ঐ শোভাযাত্রা দেখিতে বহু দেশদেশান্তর হইতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। ঐ শোভাযাত্রা স্বামী অভেদানন্দ প্রভৃতিকে দেখাইবার জন্য মিস স্টার সেন্ট্-মার্টিন্-চার্চের সম্মুখে চারিটি আসন ভাড়া করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার প্রিন্স্-অব্-ওয়েলস্ মহারাণীর ফিটনের পশ্চাতে অশ্বারোহণ করিয়া বডিগার্ড-রূপে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র কোচবক্সে বসিয়া গাড়ী চালাইয়া যাইতেছিলেন। অপর পুত্র ও পৌত্রগণ ফিটনের পাশে পাশে অশ্বপৃষ্ঠে গিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সাদা-পোষাক পরিয়া মাথায় কোহিনুরমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গাড়ী আটটি ঘোড়া টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। স্বামী অভেদানন্দ সকল রকম বস্তু ও ঘটনা দেখিতে ভালবাসিতেন। সেইজন্য তাঁহার বন্ধুরাও যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

২২শে জুন (১৮৯৮) হইতে বেদান্তের ক্লাস আরম্ভ হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে আবার নিউ ইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতির সম্পাদিকা মিস্ ফিলিপস্ অভেদানন্দকে বেদান্ত-সমিতির ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই স্বামী অভেদানন্দকে পত্র দিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও মিঃ হ্যাডি। তাঁহারা অভেদানন্দকে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মিঃ হ্যাডির নিকট স্বামী অভেদানন্দের খরচের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ৪০০·০০ টাকা জমা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঐ টাকার কথা যখন অভেদানন্দ মিঃ হ্যাডির নিকট জানিতে পারিলেন, তখন তিনি আনন্দের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, কেননা ঐ টাকা হইতেই অভেদানন্দকে জাহাজের ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং ৩১শে জুলাই (১৮৯৮) শনিবার সাউদাম্পটন্ হইতে এস. এস. সেল্টপল-জাহাজে স্বামী অভেদানন্দ ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ ৯ই আগষ্ট (১৮৯৮) আমেরিকায় উপস্থিত হন। আমেরিকার প্রধান-বন্দর নিউ ইয়র্কে তিনি অবতরণ করেন। স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে ছিল বেদ, উপনিষদ ও ষড়দর্শনের গ্রন্থের তোরঙ্গ (box)। তিনি ঐ সকল সঙ্গে লইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দেরই পরামর্শমতো। যুক্তরাষ্ট্রে তখন একটি নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল যে, বিদেশজাত সকল দ্রব্যের উপর আমদানী-শুল্ক দিতে হইত। স্বামী অভেদানন্দ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন তাঁহাকে কেহ লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন কি-না। ঠিক সেই সময়ে শুল্ক-বিভাগের কর্মচারিরা স্বামী অভেদানন্দের বাক্স ও বিছানা সমস্তই খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকল জিনিসপত্র খুলিয়া-মেলিয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহারা হঠাৎ একটি বইয়ের

তোরঙ্গ দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ শুল্ক-বিভাগের লোকেরা ঐ বইগুলির উপর শুল্ক ধার্য করিলেন। ঐ গ্রন্থগুলি ছিল সংস্কৃতভাষায় লেখা। তাঁহারা সংস্কৃতভাষা জানিতেন না, সুতরাং নানারূপ সন্দেহ করিয়া অযথা কালক্ষেপ করিতেছিলেন। অভেদানন্দ বলিলেন যে, ঐ সকল পুস্তক বিক্রয়ের জন্য নয়, ঐগুলি তাঁহার নিজের পড়িবার জন্য রেফারেন্স-বুক, সুতরাং উহার উপর শুল্ক আদায় করা উচিত নহে। অবশেষে অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর শুল্ক-বিভাগের কর্মচারীরা তাঁহাকে বিনা শুল্কেই বইগুলি ছাড়িয়া দিলেন। অভেদানন্দ তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।[১]

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(২৪)

আগেই উল্লেখ করেছি স্বামীজী তাঁর প্রিয়তম জন্মভূমি ভারতবর্ষের সর্বাত্মক উত্থানের জন্য আবার মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী-সত্যতার সমন্বয় ঘটাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবসম্মেলন চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন আপাদমস্তক-সঞ্চারী রজোগুণের ঘটনা। কিন্তু এই দুই বিষম সত্যতার সম্মেলন ঘটাতে গিয়ে পাছে তাঁর প্রিয় স্বদেশবাসী পাশ্চাত্যের আপাতঃ মনোহর ভোগবাদের সম্মোহনে আসক্ত হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় ঘরের সম্পদ সর্বদা চোখের সামনে রাখতে ব'ললেন। মাতৃভাণ্ডারের বিবিধ বহুমূল্য রত্নসম্ভার উন্মুক্ত করে ধরতে চাইলেন আসাধারণ সমস্ত মানুষের কাছে এবং ভারতবর্ষের অতীতের এই স্বর্ণদীপ্ত ঐতিহ্যের উদ্ধার-প্রসঙ্গেই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী চরিত্রের উজ্জ্বল আলেখ্যগুলি উন্মুক্ত করে ধরলেন আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে। উজ্জ্বল অখণ্ড তার মৃত্যুহীন উত্তরাধিকারের স্থিরভূমিতে দৃঢ়-সম্বদ্ধ গভীর প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে থেকে যাতে সে যেখানে যা-কিছু ভালো তাই সংগ্রহ ক'রে নিজেকে আরো প্রসারিত ক'রে পূর্ণের প্রাঙ্গণের অভিমুখে এগিয়ে যেতে পারে, তার জন্যই স্বামীজী বারবার ভারত-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম অধ্যায়গুলি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে গেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে আমাদের মনে পড়বে "বর্তমান ভারত"-এর শেষ অংশটি : "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত অথচ নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ,

১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল ঘটনারই সমাবেশ নিবেদিতার 'আমার জীবনকথা', ২য় ভাগ মুদ্রিত হইতেছে।

তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই ! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমার মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমার মানুষ কর।" উপরোক্ত অংশটি যথার্থই 'স্বদেশ-মন্ত্র' নামে আখ্যাত হয়ে আছে। ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর জন্য প্রতি ঘরে ঘরে এই 'স্বদেশ-মন্ত্রই' তিনি রেখে গেছেন যে স্বদেশ-মন্ত্র বুকে নিয়ে ভারতবর্ষ আবার একদিন যাতে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অর্জন করতে সক্ষম হয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতার পুণ্য-চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে মধুসূদন যে ভারতীয় আদর্শের কাছে আত্মনিবেদিত—স্বামীজীও সেই একই ভারতাত্মার পবিত্র পাদপীঠতলে নিত্য নতজানু। তপস্যারিষ্ট—ত্যাগের সৌন্দর্যে মহিমময় মা জানকীর উদ্দেশে মধুসূদনের বাঙ্ময় প্রণতি নিবেদনের মধ্যে যে ধ্যানের শুদ্ধতা ও ভক্তির বিনম্র আত্মসমর্পণ তার তুলনা একমাত্র স্বামীজীর সীতার প্রতি বারবার উচ্চারিত প্রশস্তিবাক্য ও আকূতি প্রশ্রুতাঞ্জলির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব : "মঙ্গল সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে / গোধূলি ললাটে আহা তারারত্ন যথা"—কিংবা "সুবর্ণ দেউটি / তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি / দশদিক"···এইসব আশ্চর্য পংক্তিগুলি যে-যুগভীর জীবন-চেতনা—ও যে-ভাবাদর্শের আনুগত্য থেকে সঞ্জাত—স্বামীজীও সেই একই ভাবলোকের অধিবাসী। সীতা সম্পর্কে স্বামীজীর শ্রদ্ধার ভালোবাসার যেন শেষ নেই। "সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে সীতা সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শস্বরূপ।" "পরমশুদ্ধস্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার মত হওয়াই ভারতীয় নারীর সর্বাপেক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা।" "প্রতীচ্য বলে কাজ কর, কর্মের দ্বারা তোমার শক্তি প্রতিপন্ন কর। ভারতবর্ষ বলে, সব দুঃখ-বেদনা সহ্য কর—এই মননশীলতার মধ্য দিয়ে তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত বেশী বিষয়ের অধিকারী হতে পারে পাশ্চাত্য সে সমস্যা পূরণ করেছে ; আর মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে ভারতবর্ষ এই সমস্যা পূরণ করেছে। এ দুটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধি। যেন মূর্তিমতী ভারতবর্ষ। ··· ··· সীতা নামটি ভারতে যা-কিছু শুভ, যা-কিছু শুদ্ধ, যা-কিছু পুণ্য তারই পরিচায়ক।"—এই দুই আদর্শের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ? পাশ্চাত্য চিন্তাধারা অনুযায়ী ওই আপাতপ্রতীয়মান শক্তি ও তেজ অথবা প্রাচ্যদেশীয় তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা বৃত্তি ? না কি দুইয়ের সমন্বয় ! বস্তুতঃ স্বামীজী তাঁর সমগ্র সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের এই সমন্বয়ের বাণীই ঘোষণা করে গেছেন—সব

মানুষের সার্বিক কল্যাণের ও প্রগতির জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও সীতা-চরিত্রের মহোত্তম আদর্শ স্বামীজীর বুকের মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় নারী এই জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনেও যথাযোগ্যভাবে আধুনিক জীবনের পরিপ্রেক্ষায় অনুবাদ করুক—স্বামীজী তাই চাইতেন।—তাই তিনি বলছেন, "সীতা-চরিত্র যদি কাল্পনিকও হয়, তবু যে জাতি ঐ চরিত্র সৃষ্টি করেছে, নারী-জাতির প্রতি সে-জাতির কতটা শ্রদ্ধা, জগতে তার তুলনা নেই—" প্রজ্ঞা বা সমালোচক লিখছেন, "নবযুগের ভারতবর্ষকে স্বামীজী মনে করিয়ে দিয়েছেন, "ভুলিও না, তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"—এই পুণ্য নামাবলীর আদ্য নামটি সীতা।"

জনকনন্দিনী সীতার কথা বলতে গিয়ে অপরিসীম শ্রদ্ধার আবেগে স্বামীজীর মন্দ্র কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ সজল এবং কোমল হয়ে উঠত, উদ্দীপনার জলে উঠত বিশাল নয়ন। "সীতা মহাতপা, অপাপবিদ্ধা, জ্যোতির্ময়ী। পূর্ণস্বরূপা, তিতিক্ষার প্রতিমূর্তি, মহত্ত্বের প্রতিমা, সাধ্বী সহধর্মিণী, অতুলনীয়া, নারীকুলের চিরন্তন আদর্শ,—সীতা আমাদের সকলের মাতৃস্বরূপা, বিশ্বজননী।"—কিংবা "সীতার কথা আর কি বলব। অতীতের যত সাহিত্য আছে সব পড়ে নিঃশেষ কর, আর পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যত সাহিত্য রচিত হবে তাও যদি সঞ্চিত কর, তবু নিঃসংশয়ে বলছি, দ্বিতীয় সীতাকে পাবে না। সীতা অনন্যা, এ শুধু একবারই আঁকা হয়েছে। রাম হয়তো আরো হবে, সীতা কদাপি না। ঐ একটি জীবনের উৎস থেকে ভারতীয় নারীর যত কিছু আদর্শের ধারা নেমে এসেছে; ভারতীয় নারীর পূর্ণ প্রতীক তিনি। এই হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত আর্যাবর্তের প্রতিটি নর-নারীর পূজাবেদীতে তিনি প্রতিষ্ঠিতা হয়ে আছেন, থাকবেন চিরকাল—অনন্ত ধৈর্য, অনন্ত ক্ষমা, পবিত্রতার মূলাধার-মহিমান্বিতা সীতা। জীবনব্যাপী যন্ত্রণাকে বিনা বাক্যে পরম প্রশান্তিতে যিনি বরণ করেছিলেন, সেই নিত্যসাধ্বী, নিত্যশ্রদ্ধা সীতা কেবল নরলোকের নন, দেবালোকেরও আদর্শ প্রতিমা। ··· আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় তিনি প্রবেশ করেছেন, তিনি হিন্দু-নারীর হৃদয়-শোণিতের তুল্য। সীতা আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমরা সকলে তাঁর সন্তান।"

স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে পোষাকে-আষাকে, আদবকায়দায়—বিজাতীয় জীবনপদ্ধতিতে আবণ্ড আসক্ত থেকেও হৃদয়ের মর্মমূলে এই শুদ্ধ ভারতীয় নারীর আদর্শের আজীবন আনুগত্য পোষণ করে গেছেন কবি মধুসূদন। তাই সীতার মত এমন পবিত্র বাঙ্ময় প্রতিমা-নির্মাণে সক্ষম হয়েছিলেন। আন্তরিকতাবে এই ভারতাত্মার পুণ্য পথের দিশারী মধুসূদনের সঙ্গেই স্বামীজীর চেতনার এত সাযুজ্য ও স্বারূপ্য অনুভব করা যায়। তাছাড়া প্রায় একই সুরে দুজনেই জাতির আত্ম-উদ্বোধনের মহাসঙ্গীত রচনা করে গেছেন। একজন শব্দে আর ছন্দে। আর একজন শুধু বাক্যের বেদনায় নয়, সমগ্র জীবন দিয়ে—বিশাল ব্যাপ্তি এক প্রদীপ্ত কর্মযোজনায়। বস্তুতঃ সমগ্র বিবেক-সাহিত্য একদিকে ভারতের সর্বাত্মক বন্ধন-মুক্তি ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যদিকে বিশ্বমানবের চেতনার ঊর্ধ্বায়নে ও সমগ্র মানবজাতির অধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধনের মহৎ প্রয়োজনেই নিবেদিত।

শিল্প-সঙ্গীতের বন্ধনমুক্তি : স্বামীজীর সমগ্র জীবনকে যদি মানবমুক্তির সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির মহাকাব্য বলা যায়—তাহলে শিল্প-সঙ্গীতের বন্ধনমুক্তির প্রসঙ্গ তার একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। এখানেও জাতির পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ও ক্ষমাহীন প্রতিবাদ। শিল্প ও সঙ্গীতেও প্রাণের অধিবাসনার জন্য তৎপরতা। শিল্পসাধনায় ভারতের অতীত গৌরবকে তিনি আবার ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। "ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ললিত কলার ক্ষেত্রেও ভারত সমস্ত পৃথিবীতে আদিগুরু।"—"অথচ আজ তার কী অধঃপতন।" সানফ্রানসিসকোর এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, "এলিজাবেথের স্বর্ণযুগও সমকালীন ভারতের তুলনায় অন্ধকার যুগ, এবং ভারত একদিন সঙ্গীত নাটক ও ভাস্কর্যে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করেছিল। বর্তমানে কিন্তু গ্রাসাচ্ছাদনে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয় ভারতবাসীকে, তার জন্য তাদের শিল্প ও সাহিত্য নিছক অনুকরণের বেশী কিছু নয়।" অথচ ইউরোপের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শিল্পের দেশ গ্রেট-ব্রিটেনের অন্ধ-অনুকরণে আমরা প্রমত্ত। তাই ক্ষোভে স্বামীজী বলেছিলেন, 'দেশের দশাই এমনি হয়েছে। দেশশুদ্ধ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটাকে সোনা দেখছে।" আরো বললেন, "বিশেষ দুর্দশা হয়েছে (বাংলা দেশের) শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্র-বিচিত্র করত, বাহার ক'রে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্প-চাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র। নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরোনোগুলোকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নাকি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাজি চচ্চড়ি।'

শিল্প-সঙ্গীত-ললিতকলার অধঃপতনের ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ ক'রে স্বামীজী বললেন, "...তারপর যখন জাতীয় প্রাণশক্তি অবলুপ্ত হল—মুসলমানদের ভারত-বিজয়ের দু'-এক শতাব্দী আগেই সম্ভবতঃ তা হয়েছিল—তখন ভারতের ঐ জাতিগত প্রবণতার (বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী) এমন বাড়াবাড়ি প্রকাশ হতে লাগল যে, অবনতির সর্বশেষ-লক্ষণ দেখা গেল। ভারতের শিল্প-সঙ্গীত-বিজ্ঞান সব কিছুতেই তার চিহ্ন দেখতে পাই। শিল্পের মধ্যে আর সেই ভাবের বিশালতা, কল্পনার উদারতা রইল না, রচনাশৈলীর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছন্দও হারিয়ে গেল। তার বদলে নিদারুণ আলঙ্কারিক বর্ণবহুল এক রীতির উদ্ভব হল। জাতির মৌলিকতা যেন অন্তর্ধান করল। গানের ক্ষেত্রে অবলুপ্ত হয়ে গেল প্রাচীন সংস্কৃত-সঙ্গীতের হৃদয়োচ্ছ্বাস। তার আগে একটি সুর স্বতন্ত্রভাবে নিজের বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হত অথচ একই সঙ্গে অপূর্ব ঐকতানের সৃষ্টি করত। এখন কিন্তু সুরগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আর বজায় রইল না। আমাদের সমগ্র আধুনিক সঙ্গীত নানাবিধ সুরের জড়াজড়ির মত মিশ্রসুরের বিশৃঙ্খল সমষ্টিমাত্র। সঙ্গীতের এই হল অধঃপতন। অন্যান্য ভাবধারার ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সর্বত্র একই প্রকার আলঙ্কারিকতা এবং মৌলিকতার হানি। ভারতের নিজস্ব ক্ষেত্র ধর্ম—সেখানেও দেখা গেল অধঃপতনের চিহ্ন।"—"এ যেন হীরে মোতির সাজ পরানো ঘোড়ার উপরে বাঁদর বসানোর মত কাণ্ড। দেশ উৎসন্ন গেলেই সমাস-শ্লেষ ও বিশেষণের বাড়াবাড়ি হয়।"—"যত মরণ

নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দুই-একটা পচা ভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।" "ওটি শুধু ভাষার নয়, সকল শিল্পতেই এল। বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গি; থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা করে দিলে। গম্বুজটা নাক ফুঁড়ে ঘাড় ফুঁড়ে ব্রহ্মরাক্ষসী সাজিয়ে দিলে, কিন্তু সে গম্বুজের লতাপাতা চিত্র-বিচিত্রের কী ধুম। গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব—কি উদ্দেশ্য,—তা তস্তত কবিও বুঝতে পারেন না, আর সে-গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম! সে কি আঁকাবাঁকা তানাতোল—ছত্রিশ নাড়ির টান হাম্বরে বাপ! তার উপর মুসলমান ওস্তাদের নকলে দাঁতে দাঁত চেপে, নাকের মধ্য দিয়ে আওয়াজে সে-গানের আবির্ভাব।"

মনে রাখতে হবে শিল্প-সঙ্গীত সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি নিছক ভাবপ্রাবল্য বা উচ্ছ্বাসের উৎস থেকে সঞ্জাত নয়—পরন্তু প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞের নিপুণ উক্তির চেয়েও তাৎপর্যমণ্ডিত। শিল্প-সঙ্গীত সম্পর্কে স্বামীজীর সমস্ত তাত্ত্বিক উক্তি এবং সাধারণীকৃত (generalisation) একান্তভাবেই অভ্রান্ত। সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ গুরুশিষ্য দুজনেই শিল্প-সঙ্গীতে পারদর্শী। স্বামীজীর আশৈশব সঙ্গীত-প্রিয়তা, কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয়বিধ সঙ্গীতে পারদর্শিতা, ওস্তাদের কাছে হিন্দী, উর্দু ও ফারসী গানের শিক্ষা, তরুণ বয়সেই সঙ্গীততত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রবন্ধ রচনার কথা—আমরা প্রমথনাথ বসুর "স্বামী বিবেকানন্দ"-গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। কবিতারও ভক্ত ছিলেন স্বামীজী। খেতড়ির রাজসভায় তাঁর দরবারী কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও রাগেশ্রী রাগে গান ও মৃদঙ্গ বাদ্যের সংবাদ, এমন কি তাঁর নৃত্যকুশলতার কথা, সঙ্ঘের থিয়েটারে যোগদানের কথা, আলোয়ারে রাজস্থানী ভক্তদের কাছে কীর্তন গানের কথা, মহীশূরের রাজবাড়ীতে অস্ট্রিয়ান সঙ্গীত-বিশারদের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক আলোচনার সংবাদ—সবই আমরা প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি উক্ত জীবনী-গ্রন্থ থেকে। আর পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাস এবং শিল্পশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। ভারতের এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম প্রায় সমস্ত শিল্প নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সব চাইতে শিল্পের প্রতি, সঙ্গীতের প্রতি একটি আন্তরিক আকর্ষণ তাঁকে যথার্থই বিশেষজ্ঞের আসনে উত্তীর্ণ করেছে। মহেন্দ্রনাথ দত্তের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়— কৈশোর থেকেই পারিবারিক অভিনয়ের জন্য রঙিন দৃশ্যপট এঁকে দিতেন স্বামীজী। পরবর্তীকালে আমেরিকায় নানান কাজের ভিড়ের মধ্যেও পোরট্রেট আঁকার উৎসাহের কথা জানা যায় ভগিনী নিবেদিতার চিঠি থেকে। চিত্রশিল্পী মন্টামের কাছে শিল্পশিক্ষার কথাও আমরা জানি। "প্রবুদ্ধ ভারতের প্রথম প্রচ্ছদপট প্রসঙ্গে স্বামীজীর নির্মম সমালোচনা এবং কিছুকাল পরে "ব্রহ্মবাদিন" ও "প্রবুদ্ধ ভারতের" নক্সা করে ভারতে পাঠানোর কথাও এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে। ভারতীয় শিল্পকলার প্রতীকী ভাষা সম্পর্কেও স্বামীজীর অসাধারণ জ্ঞানের কথা বার বার প্রমাণিত হয়েছে জীবনে নানা কথা ও কর্মের মাধ্যমে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যরীতির মিশ্রণে বেলুড়-মন্দিরের পরিকল্পনা ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সাহায্যে নক্সা-প্রস্তুতকরণ শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে স্বামীজীর অসাধারণ

প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে। যদিও অনেকেই বলেন যে স্বামীজীর সমগ্র ভাবকল্পনার সামান্যই মাত্র রূপায়িত হয়েছে বেলুড়মঠের নির্মাণে। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর ডায়েরী, প্রিয়নাথ সিংহ, সিষ্টার ক্রিষ্টিন ও ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিকথা, স্বামীজীর নিজের বহু চিঠিপত্র, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর শিল্প-মনীষা ও মেধার বহু পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। শিল্প সম্পর্কে স্বামীজীর উৎসাহ ও জিজ্ঞাসা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। আর্ট-কলেজের একদা অধ্যক্ষ শিল্পী রদাপ্রসাদ দাশগুপ্তের সঙ্গে শিল্প-বিষয়ে তাঁর কথোপকথনের মধ্যেও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে তাঁর নিপুণ শিল্প-বিশ্লেষকের ভূমিকা।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শশধর তর্কচূড়ামণি ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(ছয়)

ঠাকুর কর্তৃক বিজ্ঞানী ও জ্ঞানীর প্রভেদ বিষয়ে কথন :

তত্ত্বকথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শশধর তর্কচূড়ামণিকে 'বিজ্ঞানী' ও 'জ্ঞানী'র প্রভেদ সম্বন্ধে বলেন,—"আমি যো সো ক'রে যাচ্ছি, আবার কে আসে? খাদি কাঠ আপনি যো সো ক'রে ভেসে যায়; কিন্তু তার উপর একটি পাখী বসলে [ঐ কাঠ] ডুবে যায়। নারদাদি যাদাদুরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায় আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। স্টীমবোট্ (কেলের জাহাজ)—আপনিও পার হয়ে যায় এবং অপরকেও পার করে নিয়ে যায়।

"নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা খেলোয়াড় ছক-বাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? কিবারেই ঠিক পড়ছে।—এমনি খেলোয়াড়! সে আবার মাঝে মাঝে গোপে তা দেয়।

"শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়ডরাসে। যেমন শতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে—যো সো ক'রে একবার ঘুটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে।—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে।—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ ক'রেছে!

"তাঁকে [ঈশ্বরকে] চিন্তা করে অখণ্ডে মন লয় হলেও আনন্দ,—আবার মন লয় না হলেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ। শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে,—কেবল বিচার করে,—'এ নয় এ নয়,—এ-সব স্বপ্নবৎ'। আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি[১] তাই সব লই।···আমি বগলে

১। শ্রীশ্রীঠাকুর এ-প্রসঙ্গে দুই বেয়ানের "হাত তুলে নাচা"র গল্পটি বলেন। যে-বেয়ানের বগলে একতাড়া রেশমী সুতা লুকানো ছিল, সে ঐ হাতটি বগলে চেপে রেখে অন্য হাতটি তুলে, ভয়ে ভয়ে নাচছিল। কিন্তু অন্য বেয়ান—যার ভয়-লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুই ছিল না, সে দু'হাত তুলে স্বচ্ছন্দে নেচেছিল।

হাত দিয়ে টিপি না,—আমি দুহাত ছেড়ে দিয়েছি,—আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্য-লীলা দুই[২] নই।"

ঠাকুর কর্তৃক নিজ অবস্থা সম্বন্ধে কথন :

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন,—'মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ [গোপীদের] ব্রহ্মজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলেছিলেন,—'আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি একটি রূপ কেবল দেখছ? গোপীরা বলে উঠলো,—'কৃষ্ণ, তবে কি [তুমি] আমাদের ত্যাগ করে যাবে, তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছ'? গোপীদের ভাব কি জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।'

জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করেন,—"এই 'ভক্তের আমি' কি একেবারে যায় না?"

উত্তরে পরমহংসদেব বলেন,—"ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে সমাধিস্থ হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি; কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না; আবার নীচের গ্রামে নামতে হয়। আমি বলি,—'মা, আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না'। আগে সাকারবাদীরা খুব আসতো। তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা[৩] আসতে আরম্ভ করলে! তখন প্রায় ঐরূপ বেহুঁশ হয়ে সমাধিস্থ হতাম—আর হুঁশ হলেই বলতাম, 'মা, আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না'।"

শশধর পণ্ডিত—"আমরা বল্‌লে তিনি শুনবেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চাইবে তাই পাবে।...তবে একটি কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধন করে, তার সেই রূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ।...আমি কাঁদতাম আর ব'লতাম,—'মা [আমার] বিচার-বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক!"

শশধর পণ্ডিত—"তবে আপনারও [বিচার-বুদ্ধি] ছিল!"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হাঁ, একবার ছিল।"

শশধর পণ্ডিত—"তবে ব'লে দিন, তাহ'লে আমাদেরও যাবে। আপনার কেমন করে গেল?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"অমনি একরকম করে গেল।"

পরমহংসদেব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর তিনি আবার বলেন,—"ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছ থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায়, তাই পায়।"

২। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শশধরকে বোঝান যে, 'বিদ্যামী'রা নিত্যমুক্ত পুরুষ। তাঁরা অনন্ত ঈশ্বরের নিত্য ও লীলা উভয় রাজ্যেই সম-আনন্দ সম্ভোগ করেন। বৈচিত্র্যময় জগৎ-সংসারে কোন কিছুতেই তাঁরা ভয় পান না। অন্যদের শিক্ষাদানের জন্য তাঁরা একান্ত নির্ভয়ে সংসারে থাকেন এবং কখনই কিছুতে আবদ্ধ হন না। কিন্তু 'জ্ঞানী'রা কেবল নিজের মুক্তির জন্যই ব্যস্ত। ঐ অতীত সাধনে কোন বাধা আসে অথবা সেই লক্ষ্যপথে কিছুতে বদ্ধ হ'য়ে পড়েন—এই ভয়ে তাঁরা সর্বদা বিচলিত থাকেন।

৩। ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা—ইদানীং কালের ব্রহ্মজ্ঞানীরা, অর্থাৎ ব্রাহ্মভক্তগণ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্রাহ্মসমাজ-ভক্তদের 'ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী' ব'লতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য কথন :

পরমহংসদেব কথাপ্রসঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলেন,—"ঈশ্বর কত কি ক'রেছেন ! তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ! তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ! তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের জ্ঞান আমার দরকার কি ! আর যদি [কেউ] জানতে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে লাভ করতে হয়। তারপর তিনি [সব] ব'লে দেবেন।

"কেউ কেউ ঐশ্বর্যের জ্ঞান চায় না। শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, আমার [জানার] কি দরকার। আমার এক বোতলেই হ'য়ে যায়। ঐশ্বর্য-জ্ঞান চাইবে কি, যেটুকু মদ খেয়েছে, তাতেই মত্ত।

"ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ পথ। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ। কোন্ পথটি ভালো অতো বিচার করার কি দরকার। বিজয়ের[৪] সঙ্গে অনেকদিন কথা হ'য়েছিল। বিজয়কে বল্‌লাম,—একজন প্রার্থনা করতো—'হে ঈশ্বর। তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও'।

"জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন। পার্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রূপে দেখা দিয়ে ব'ল্‌লেন,—'পিতা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধুসঙ্গ কর'।"

ঠাকুর কর্তৃক ব্রহ্মতত্ত্ব ও সাধন রহস্য কথন :

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শশধর পণ্ডিতকে বলেন,—"ব্রহ্ম কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বলা যায়। যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর আছে, এই ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

"নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে না কেন ? তবে বড় কঠিন। বিষয়বুদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ—সমস্ত ত্যাগ হ'লে, মনের লয় হ'লে তবে অনুভবে বোধে বোধ হয়, আর **অস্তিমাত্র** জানা যায়।"

শশধর পণ্ডিত—"অস্তিত্যোপলব্ধব্য···ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বলেন,—"তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় ক'রতে হয়। বীরভাব, বা দাসীভাব আর সন্তানভাব।"

'ভাব'-সাধনের কথা শুনে ভক্ত মণিলাল মল্লিক তাতে নিজ ধ্যানধারণা সংযোগ করেন,—"তবে আঁট হবে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সাধনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ বলেন,—"আমি সখীভাবে অনেকদিন ছিলাম। বলতাম, আমি আনন্দময়ী ব্রহ্মময়ীর দাসী—ওগো দাসীরা, আমায় তোমরা দাসী কর। আমি গরব করে চলে যাব ব'লতে যে, আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী'।"

ঠাকুর কর্তৃক বিবিধ সিদ্ধাবস্থা বিষয়ে কথন :

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন,—"কারু কারু সাধন না করেও ঈশ্বর লাভ হয়। তাদের নিত্যসিদ্ধ বলে। যারা জপ-তপাদি দ্বারা সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ ক'রেছে, তাদের বলে সাধনসিদ্ধ।

৪। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

আবার কেউ কেউ কৃপাসিদ্ধ,—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

"আবার আছে, হঠাৎ সিদ্ধ—যেমন গরীবের ছেলে বড়মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,—সেই সঙ্গে বাড়ি ঘর গাড়ি দাস দাসী সব হ'য়ে গেল। আর আছে, স্বপ্নসিদ্ধ—স্বপ্নে দর্শন হল।"

স্বপ্নসিদ্ধের কথা শুনে ভক্ত সুরেন্দ্র মিত্র সহাস্যে বলেন,—"আমরা এখন ঘুঘুই,—পরে বাবু হ'য়ে যাব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে সুরেন্দ্রকে বলেন,—"তুমি তো বাবু আছই। 'ক'য়ে আকার দিলে 'কা' হয়;—আবার আকার দেওয়া বৃথা;—দিলে সেই 'কা'ই হবে।" (সকলের হাস্য)।

"নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক—যেমন অগ্নি কাঠ একটু ঘসলেই আগুন,—আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না ক'রলেও পারে। তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ-কুমড়ো গাছে আগে ফল হয়, তারপর ফুল।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উপমাটির চমৎকারিত্ব ও সার্থকতা তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বিশেষ মুগ্ধ করে। নিগূঢ় তত্ত্বপ্রসঙ্গে এই সুন্দর ও মনোহর উপমাটি শুনে ইনি পরম উল্লাস প্রকাশ করেন। যা হোক, 'নিত্যসিদ্ধ' প্রসঙ্গে পরমহংসদেব আরো বলেন,—

"নিত্যসিদ্ধ হোমাপাখীর ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডানা উঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মার দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা! কোথায় মা! দেখ না প্রহ্লাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা।"

ঠাকুর কর্তৃক শশধরের স্বভাবের প্রশংসা :

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিনয়-নম্র স্বভাব পরমহংসদেবকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। তিনি আহ্লাদিত হ'য়ে এঁর মধুর স্বভাব বিষয়ে উপস্থিত ভক্তদের বলেন,—"এঁর স্বভাবটি বেশ। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতলে কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙে যায়, তবু পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে, হাজার ঈশ্বর-কথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না,—যেমন কুমীরের গায়ে তরবারির চোপ লাগে না।"

শশধর পণ্ডিত পরামর্শ দেন,—"কুমীরের পেটে বর্শা মারলে হয়।" (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব (সহাস্যে)—"শুষ্কির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ক্যালাজক্কী (Philosophy)।" (সকলের হাস্য)।

পণ্ডিত মহাশয় সহাস্যে সমর্থন ক'রে বলেন,—"ক্যালাজক্কী বটে।"*

●

* । এই বিবরণের যাবতীয় উদ্ধৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—তৃতীয় ভাগ (১ম খণ্ড) থেকে পরিগৃহীত।

॥ বৌদ্ধ-সম্মেলন ও বৌদ্ধচিন্তা—স্বামী অভেদানন্দ ॥

অনুবাদ—শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(এক)

খ্রীস্টপূর্ব ৪৪৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করেন। এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের শিষ্যবর্গের মধ্যে সর্বাধিক পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ মহাকাশ্যপের অনুরোধে পাঁচশ' অর্হৎ রাজগৃহে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা অভিধম্ম-পিটকে লিপিবদ্ধ দার্শনিক স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করেন, বুদ্ধের সর্বাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্য উপালি বিনয়-পিটকের নিয়মশৃঙ্খলার আইন-কানুনগুলি পুনরুল্লেখ করেন এবং বুদ্ধের সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য আনন্দ সুত্ত-পিটকের কাহিনী ও নীতি-গল্পগুলি পুনরালোচনা করেন। এইটি ছিল প্রথম বৌদ্ধ-সম্মেলন। এই প্রথম সম্মেলনে থেরাগণ যে সকল উপদেশ সংগ্রহ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা' 'থেরাবাদ' নামে পরিচিত হয়েছিল।

গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশ' বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভিক্ষুদের মধ্যে উদ্ভূত কতকগুলি গুরুতর বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছিল। মঠ সম্পর্কে কোন কোন নিয়ম নিয়ে এ বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যারা এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি, তারা বৈশালীতেই ভিন্ন একটা মহাসভা আহ্বান করে এবং ঐ বিবাদের বিষয়গুলি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তাদেরকে বলা হ'ত মহাসাঙ্ঘিক। পরবর্তী একশ' বৎসরের মধ্যে এই মহাসাঙ্ঘিকদের ভিতর চারটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। সেগুলি হচ্ছে একব্যবহারিক, লোকোত্তরবাদী, কুক্কুলিক ও বহুশ্রুতীয়। এগুলি আবার পরবর্তী এক শতাব্দীর মধ্যে আরও বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে,—যেমন, প্রজ্ঞাপ্তিবাদী, চিত্তিক, অপরশৈল ও উত্তরশৈল।

বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে (অধুনা পাটনায়) খ্রীস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পিটক তিনটিকে যথাযথ বিন্যাস করা। পিটক তিনটি হচ্ছে, সুত্ত-পিটক : এতে আছে বুদ্ধের নিজের উক্তি ও কর্ম ; বিনয়-পিটক : এতে আছে মঠে যোগদানকারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের আচরণবিধি এবং শেষ-পিটক, অভিধম্ম-পিটক : এতে আছে বিভিন্ন জগতে জীবনের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা, তাদের অস্তিত্বের উপাদান ও কারণগুলি। এর প্রায় দেড়-শ' বৎসর পরে, পিটক তিনটিকে যথাবিধি সংক্ষিপ্তাকারে পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়। পালি ভাষা ছিল বুদ্ধের আমলে মগধাঞ্চলে জনসাধারণের কথ্য ভাষা।

চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে। তিনি বুদ্ধের নির্বাণের পাঁচ শতাব্দীরও বেশী সময় পরে, ১০ খ্রীস্টাব্দ হ'তে ১৫০ খ্রীস্টাব্দ মধ্যে বর্তমান ছিলেন। এ সম্মেলন হয়েছিল কাশ্মীরের কোন এক অঞ্চলে কুণ্ডলবন-বিহারে।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে চারটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের নাম : (১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক এবং (৪) বৈভাষিক।

(১) মাধ্যমিক শাখা শূন্যবাদ শিক্ষা দেয়। বহির্জগৎ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির বস্তুর অস্তিত্বকে এ মতবাদ স্বীকার করে না।

(২) যোগাচার শাখা শুন্যতা শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল এবং যোগ-সহায়তায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অস্তিত্ব ও ধারণাকে সত্যিকারের মানসিক প্রপঞ্চ হিসাবে আবিষ্কার করতে অভ্যাস করেছিল। তাদেরকে আদর্শবাদী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে। তারা বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। মাধ্যমিক শাখা কিন্তু আচার গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা যোগাভ্যাস দ্বারা তাদের আচার্যের প্রাধিকারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। সুতরাং তাদের প্রথা ছিল মধ্যপন্থী,—সর্বোৎকৃষ্টও নয়, আবার সর্ব-নিকৃষ্টও নয়।

(৩) সৌত্রান্তিক শাখা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মেনে নিয়েছিল। তাদের মতে, যদিও বহির্জগৎকে উপলব্ধি করা যায় না, তথাপি অন্যান্য লোকের সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে বহির্জগতের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়।

সৌত্রান্তিকদের এ নামে অভিহিত করা হয়, কারণ বুদ্ধের কোন কোন শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সার্বিক শূন্যতার সূত্রের অর্থ কী? বুদ্ধ তাঁদেরকে বলেছিলেন সৌত্রান্তিক; কারণ তারা সূত্রের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন।

(৪) বৈভাষিক শাখা বহির্জগৎ ও মানসিক প্রপঞ্চ,—দু'টিকেই বাস্তব বলে স্বীকার করে। বৈভাষিক হচ্ছে তারাই, যারা শূন্যতার মতবাদকে "বিভাষা" বা "বিরুদ্ধভাষা" হিসাবে মনে করে। তাদেরকে বলা যেতে পারে প্রত্যক্ষবাদী কিংবা বস্তুতান্ত্রিক।

এখন, চিন্তারের পালি অভিধানের বর্ণনা অনুসারে নির্বাণের অব্যবহিত পূর্বের অবস্থাগুলি হচ্ছে: (১) সমাপত্তি, অর্থাৎ এক জলস্রোতের মধ্যে পড়ে গিয়ে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ না থাকা। এ অবস্থায় মানুষ অতি শীঘ্র নির্বাণ লাভ করতে বাধ্য। সে হয়তো সাতবার জন্মগ্রহণ করতে পারে, কিন্তু তার বেশী নয়, আর তা'-ও নিকৃষ্ট প্রাণী হিসাবে নয়। (২) সাকৃদাগামী: সাকৃদাগামী অবস্থায় শিষ্য দু'বার প্রত্যাবর্তনে বাধ্য;—একবার মর্ত্যে, একবার স্বর্গে। (৩) অনাগামী: এ অবস্থায় শিষ্য একবার মাত্র স্বর্গে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য; এবং (৪) নির্বাণ: এ অবস্থায় একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে: কিন্তু তা' সত্ত্বেও সে উচ্চতম জ্ঞান অর্জন করতে পারে; তা'কে তখন বলা হয় নির্বাণ মার্গে অবস্থিত। পরে যখন সে দেহত্যাগ করে, তাকে তখন রূপক অলঙ্কারের সাহায্যে বলা হয় "নির্বাপিত।" নির্বাণের পরে কী থাকে, সে সম্পর্কে হীনযানদের কোন ধারণা-কল্পনা নেই।

মহাযান মতবাদ এক্ষেত্রে অতিক্রম করে। তারা 'নির্বাণ' শব্দটি বেশী ব্যবহার করে না। "নির্বাণ" কথার পরিবর্তে "বোধি বা জ্ঞান লাভ", "সর্বজ্ঞতা অর্জন" প্রভৃতি পদ ব্যবহার করা হয়। যখন কেউ সর্বজ্ঞতা অর্জন করে, তখন সে জগতের দুঃখকষ্টও জানতে পারে সুতরাং, তার চারদিকে লক্ষ লক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত না করে কেউ নির্বাণ লাভ করতে পারে না। অতএব, তাকে বলা হয় "সবচেয়ে মজবুত বর্মে কোমরবন্ধ।" সে দুঃখকষ্ট দূর করার সঙ্কল্প গ্রহণ করে।

মহাযান মতবাদ হীনযানদের স্বার্থপর ধর্মমতকে একেবারে অবহেলা করে না, কিন্তু তাকে হীন স্তরের বলে মনে করে। মহাযান ধারার সর্বজ্ঞ, তথাগত ও লোকনাথ তাঁর চারদিকে অসংখ্য জীবকে প্রত্যেকবোধি দান করেন। যখন তাঁর নিজের বন্ধনমোচনের প্রত্যাশা তিনি লাভ করেন, তাঁরা প্রত্যেকে অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের মুক্তিও স্থগিত রাখেন। অসংখ্য কল্পে অনেক লোকনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন; অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনেক সর্বজ্ঞ রয়েছেন এবং অনন্ত ভবিষ্যতে অনেক তথাগত আবির্ভূত হবেন। তাঁরা তাঁদের ধর্মোপদেশ দ্বারা বিশ্বের অসংখ্য সংবেদনশীল ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবকে উদ্ধার করেছিলেন, উদ্ধার করে থাকেন এবং উদ্ধার করবেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ-ই আর্য-অব-লোকিতেশ্বরের মতো উন্নত ন'ন। আর্য-অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন একটিমাত্র সংবেদনশীল জীবও অ-মুক্ত অবস্থায় থাকবে, ততদিন তিনি শান্তিরাজ্যে প্রবেশ করবেন না।

বৌদ্ধদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিভিন্ন গোষ্ঠির সৃষ্টি হয়েছে, নিম্নের ছকটি সে সম্পর্কে একটা ধারণা প্রদান করবে :

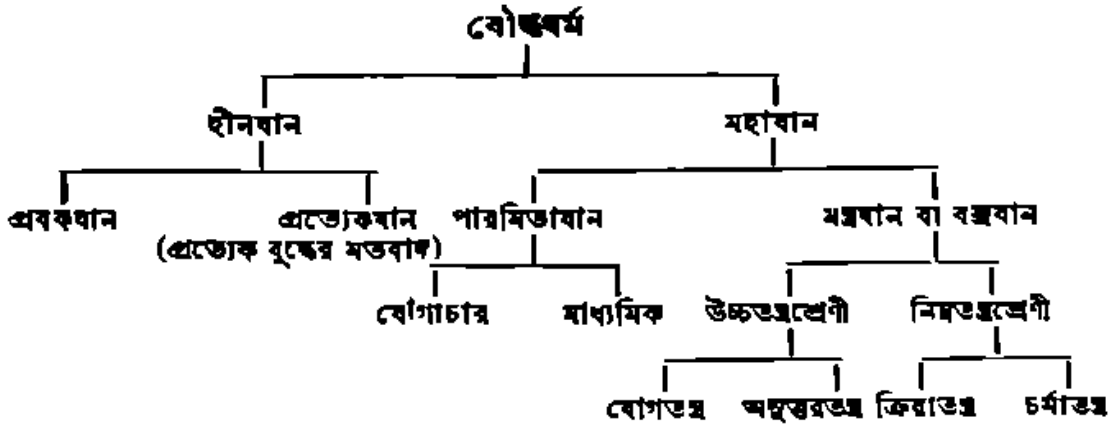

এক্ষণা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধ দার্শনিক, অসঙ্গ তাঁর মহাযানসূত্রালঙ্কারের প্রথম খণ্ডে লেখচিত্র সাহায্যে হীনযান ও মহাযান মতের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। খ্রীস্টোত্তর দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে আমরা দেখি, বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটি 'যান' বিদ্যমান ছিল,—শ্রবকযান, প্রত্যেকযান এবং মহাযান। এই তিনটি 'যান' থেকে পরবর্তীকালে আরও চারটি দার্শনিক বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলি হচ্ছে সর্বাস্তিবাদ বা সৌত্রান্তিক, বাহ্যার্থভঙ্গ বা বৈভাষিক, বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচার এবং শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক। অমরবজ্র (খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক) তাঁর তন্ত্রবজ্রাবলীতে এই চারটি বিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। বৈভাষিক গোষ্ঠি তাদের গ্রন্থগুলিতে প্রত্যেকযান ও শ্রবকযান সম্পর্কে আলোচনা করেছে। এখন, মহাযান আবার দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল,—পারমিতাযান ও মন্ত্রযান। এ দু'টি 'যান'-এর মধ্যে প্রথমটিকে সৌত্রান্তিক ও যোগাচার মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ মন্ত্রযানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যোগাচার ও মাধ্যমিক মতবাদ দ্বারা।

আবার দু'টি পারমিতার মধ্যে মন্ত্রযান বা মন্ত্রনয় আরম্ভ হয়েছে শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ দ্বারা,—যদিও এ'দুটি গোষ্ঠি বা মতবাদের মধ্যে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে। পরে বিশদভাবে আলোচনা করা হবে যে, শূন্যবাদ শূন্যের মতবাদ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে এবং বঙ্গদেশের বৌদ্ধ দার্শনিক অদ্বয়বজ্র তাঁর মহাসুখপ্রকাশে বলেছেন যে, যথার্থ জ্ঞান থেকে শূন্যতা বীজরূপ ধারণ করে, বীজ থেকে বিশ্বমের ধারণা সৃষ্টি হয় এবং বিশ্বমে গ্রাস-বিন্যাস পদ্ধতিতে সকল কিছুর অনুভূতি ও উদ্‌ঘাটন হয়ে থাকে। [ক্রমশঃ]

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(তিন)

পূর্বে উল্লেখ করেছি 'সাধারণীকরণ'-পদ্ধতি বা প্রণালীর কথা রস ও রসানুভূতির সম্পর্কে। প্রকৃতপক্ষে 'সাধারণীকরণ' কি সেই সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে জানা উচিত। 'সাধারণীকরণ' বলতে বুঝায় সহৃদয়ের আত্মবিস্মৃতি ও সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয়ের ব্যষ্টি-ব্যক্তিত্বেরও বিস্মরণ ; অর্থাৎ সহৃদয়-ব্যক্তি যে সমগ্র মানুষের ব্যক্তিত্ব ও হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন নন, বরং অভিন্ন—এই বোধ বা প্রতীতি থাকে না, ফলে আত্মার বা নিজের স্বতন্ত্র একটি দিব্য ও অপার্থিব সত্তা থাকলেও পরমচৈতন্য বা বিশ্বের আত্মারূপ পরমাত্মা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন নন—এই সামগ্রিক বোধও সহৃদয়-ব্যক্তির থাকে না। এই সাধারণীকরণপ্রণালী আলঙ্কারিক মহিমভট্টের সমর্থিত, কিন্তু আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন এই প্রণালীর সমর্থক নন, অথচ 'লোচন'-টীকাকার ও 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যকার ভট্ট-অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়ক-সমর্থিত 'সাধারণীকরণ'-প্রণালী স্বীকার করেছেন।

'সাধারণীকরণ'-এর প্রকৃত অর্থ রসবোধের জন্য সহৃদয়-ব্যক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থায় উপনীত বা প্রতিষ্ঠিত করা। 'নৈর্ব্যক্তিক'-শব্দের অর্থ impersonal অবস্থা—যে অবস্থায় স্বার্থকেন্দ্রিক বা ব্যষ্টিকেন্দ্রিক ধারণা ও প্রতীতি রসানুভবোত্তার কাছে বিলুপ্ত হয় এবং এই impersonal অবস্থাকে universal-অবস্থায় প্রতিষ্ঠালাভও বলা যায়। কাশ্মীরীয়-প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ও অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্তের কলশ্রুতির সঙ্গে রসাভিব্যক্তির ক্ষেত্রে সাধারণীকরণভাবের মিল বা ঐক্য আছে। অবশ্য ভট্টনায়ক বিশেষভাবে কাব্য বা সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে এবং ভট্ট-অভিনবগুপ্ত রসানুভূতির ক্ষেত্রেই ঐ সাধারণীকরণপ্রণালী গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তাহলেও ভট্টনায়কত্ব রসানুভূতির ক্ষেত্রে ঐ প্রণালীকে একেবারে বর্জন বা ত্যাগ করেন নি। আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন কিন্তু ঐ মতের পরিপোষক না হলেও ধ্বনিসার্থকতার

ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ঐ সাধারণীকরণপ্রণালী গ্রহণ করেছেন। ডক্টর তারাপদ চক্রবর্তী তাঁর *Indian Aesthetics and Science of Language* (1971)-গ্রন্থে 'Signal for Universalisation'-আলোচনায় সাধারণীকরণসম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: "Both Bhattanayaka and Abhinavagupta regard the process of generalisation as an essential step to attainment of aesthetic delight, which consits in blissful savouring of the self by the self. The process of generalisation, to signify which the term *sa'dha'ranavikarana* is used by the Science of Criticism, refers to the presentation of the character, the situation, and the mood in their universal aspects, as distinct from their particularised selves" (p. 93). এখানে তিনি আলঙ্কারিক পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ-প্রণীত 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থ থেকে কাব্যদৃষ্টির আলোকে আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলার ও দুষ্মন্তের উদাহরণ দিয়েছেন: 'এবং সাধারণীকৃতেষু দুষ্মন্তশকুন্তলাদেশকাল-বয়োবস্থাদিষু···সাধারণাত্মা রত্যাদিঃ স্থায়ী-রসঃ'। এই 'সাধারণীকরণ'-প্রণালীতে বিষয় ও বিষয়ীর প্রতীতি বা বোধ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় অখণ্ড ও সার্বিক একটি পরমসত্তার প্রতিষ্ঠিত হয়ে এবং সমসত্তার এই সার্বিক-চেতনার ক্ষেত্রেই আনন্দের অভিব্যক্তি নিয়ে রসের বিকাশও সম্ভব হয়। সেজন্য ডক্টর চক্রবর্তী এখানে লিখেছেন: 'and as this confrontation actually takes place, poetic relish is experienced'. এখানে কাব্যে বা সাহিত্যে রসানুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের অনুভূতির মতো আমরা বলি সঙ্গীতে রাগের অনুশীলনে আত্মসমাহিত সঙ্গীতশিল্পীর ও সেই সঙ্গে সঙ্গীতের শ্রোতাদের অন্তরেও রসানুভূতির এবং অপার্থিব আনন্দানুভূতির সৃষ্টি ও প্রকাশ সার্থক হয়, নচেৎ সঙ্গীতানুশীলনের কোন সার্থকতাই থাকে না।

আলঙ্কারিক ভট্টনায়কের সঙ্গে রসতত্ত্ববাদী অভিনবগুপ্তের বিভিন্ন মতের অনেক পার্থক্য থাকলেও সাধারণীকরণের ব্যাপারে ভট্ট-অভিনবগুপ্ত আচার্য ভট্টনায়কেরই মতের কিছু পরিবর্তন ও পরিশোধন ক'রেই ব্যঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে রসোৎপত্তির কথা স্বীকার করেছেন। 'ব্যঞ্জনা'-শব্দের অর্থ গূঢ়ার্থপ্রকাশক বৃত্তি, অর্থাৎ শব্দের বা বাক্যের অভিধেয়-অর্থের অন্য অর্থের ভোতক বা প্রকাশক হলেও ব্যঞ্জনার পক্ষপাতী, কেননা তিনি স্বীকার করেন যে, রসবোধসৃষ্টির কারণ ব্যঞ্জনা-ব্যাপার বা ব্যঞ্জনাকর্ম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ভট্টনায়কের মতের প্রধান পার্থক্য এই যে, অভিনবগুপ্ত শব্দের ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব এই উভয় ব্যাপার স্বীকার করেন, আর ভট্টনায়ক তা করেন না। তার কারণ এই যে, অভিনবগুপ্ত মনে করেন ভোজকত্ব-ব্যাপার অভিব্যক্তিরই নামান্তর। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও এই কথা স্বীকার করেন। সুতরাং প্রশ্ন হ'তে পারে যে, তাহলে সাধারণীকরণ কিভাবে সার্থক হতে পারে?

এ'সম্বন্ধে অভিনবগুপ্তের অভিমত যে, সাধারণীকরণপ্রণালী ব্যঞ্জনাত্মক বৃত্তির অবান্তর ব্যাপারের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এ'সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ধ্বনিতত্ত্বসমীক্ষা'-

গ্রন্থে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন, সেজন্য তাঁরই আলোচনার ধারা এখানে তাঁর 'ধ্বনিতত্ত্ব-সমীক্ষা' থেকে উল্লেখ ক'রে বলি—

"রসাভিব্যক্তির প্রক্রিয়া এইরূপ—সহৃদয়ের ইহা মনে হয় না যে, এই রত্যাদিবিভাব এবং তাহার অভিনয়াদি কার্যরূপ অনুভাব—ইহা আমারই বা শত্রুরই বা তটস্থ ব্যক্তিরই।··· সাধারণ্যের প্রতীতির অর্থ ইহা নয় যে, সকল ব্যক্তির সহিত সহৃদয়ের সম্বন্ধবোধ থাকিবে, ইহার অর্থ হইতেছে যে, এই প্রতীতি ঘটিলে বিভাবানুভাবাদিকে কোন সম্বন্ধীবিশেষের অর্থাৎ নট-নায়কাদির ধর্ম বলিয়া বোধ হয় না। এই স্বীকারের এবং পরিহারের নিয়মের অজ্ঞানবশতঃ ঈদৃশ সাধারণীকরণ সম্ভব হয়"।

অবশ্য এসবও সহজে গ্রহণ করা অনেক সময়ে অসম্ভব ব'লে তিনি পুনরায় তাঁর উপরি-উক্ত কথাটিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: "সাধারণীকরণের মূলভিত্তি হইতেছে সহৃদয়ের আত্মবিস্মরণ ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিস্মৃতি; সে যে অন্য সমস্ত ব্যক্তি হইতে ভিন্ন, বা তাহার সহিত কাহারও কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে—এইরূপ বোধ তখন বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) সত্তায় অবস্থিত হইলেই রসবোধের অধিকার আসে। কাহারও সহিত তাহার ভেদবুদ্ধি না থাকায় কাব্য-নাটকের বিভাবের সহিত তাহার ভেদবুদ্ধিও থাকে না। ইহাকেই সাধারণীকরণ বা impersonal or super-personal state of existence বলে।

"পরিমিত ব্যক্তিত্ববোধই ভেদবুদ্ধির কারণ। তাহা অবিদ্যাকল্পিত। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ও বেদান্ত-মতে পরমতত্ত্ব এক অদ্বিতীয় চৈতন্য। অবিদ্যার আবরণবশতঃ ও নানা ভেদবুদ্ধির উপস্থিতির জন্য জীব তাহার বাস্তবিক-সত্তা বিস্মৃত হয়। এই বাস্তবিক-সত্তায় মানুষ তখনই আরূঢ় হয়—যখন তাহার ভেদবুদ্ধির উৎস ক্ষুদ্র-অহংবুদ্ধি লুপ্ত হয়। শৈবসিদ্ধান্তসম্মত সেই পরম-অহংতার এবং বেদান্তসম্মত সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ অনন্ত-ব্রহ্মের অনুভবে তখন তাহার ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয়। ইহাই সাধারণীকরণের মূলকথা এবং ইহাই অভিনবগুপ্তের সম্বন্ধীবিশেষের স্বীকার ও পরিহারের ফল"।

এজন্য আচার্য অভিনবগুপ্ত মনে করেন যে, সাধারণীকরণ ব্যঞ্জনারই অবান্তর-ব্যাপার বা কর্ম। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও একথা স্বীকার করেন, সেজন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত অলঙ্কারগ্রন্থ রসগঙ্গাধরে পরিষ্কার ক'রেই বলেছেন: 'বস্তুতস্তু বক্ষ্যমানপ্রতিবন্ধারহিতেন রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ।···ইয়ং চ পরব্রহ্মাস্বাদাৎ সমাধের্বিলক্ষণা, বিভাবাদি বিষয়সংবলিত-চিদানন্দালম্বনত্বাৎ"। অন্ধকাররূপ আবরণের জন্য যেমন কোন বস্তুর প্রতীতি হয় না, কিন্তু অন্ধকাররূপ আবরণ বা প্রতিবন্ধকের অপসারণে বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি অজ্ঞান-অন্ধকার জ্ঞানালোকে বিদূরিত হ'লে নিরাবরণ-চৈতন্যের প্রকাশ প্রত্যক্ষ বা অনুভবের বিষয় হয়। এজন্য 'রসো বৈ সঃ' উপনিষদ্বাক্যে রসকেই চৈতন্য বলা হয়েছে এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলেছেন যে, স্থায়ীভাবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ভগ্নাবরণ-চৈতন্যই[১] রস। চৈতন্যাংশকে অবলম্বন করেই রস নিত্য। 'সাহিত্যদর্পণ'-

১। অজ্ঞান-আবরণহীন পরিশুদ্ধ-চৈতন্য।

গ্রন্থে বিশ্বনাথ কবিরাজের ও আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর অভিমতও তাই। তাঁরাও বলেছেন : 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'। সেজন্য বলি যে, রসানুভূতির সঙ্গে আনন্দানুভূতির ক্ষেত্রে ভট্টনায়ক-উদ্ভাবিত সাধারণীকরণকর্ম যে অপরিহার্য সেকথা আচার্য অভিনবগুপ্তও নাট্যশাস্ত্রের তাঁর অভিনবভারতীতে স্বীকার ক'রে বলেছেন : 'সাধারণ্য-গ্রহং বিনা ন কদাচিদপি বিভাবত্বং স্বপ্নেঽপি ন রসত্বমিতি চ ন বিস্মর্তব্যম্' (—ডঃ বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় : 'ধ্বনিতত্ত্বসমীক্ষা', পৃঃ ২০২ দ্রষ্টব্য)।

'সাধারণীকরণ' কি কাব্য, সাহিত্য, নাটক ও সঙ্গীত—সকল বিষয়েই একান্ত প্রয়োজন, কেননা সাধারণীকরণে কবি ও সহৃদয়—vision এবং manifestation উভয়ই একত্র মিলিত হয়। ডক্টর বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় এজন্য জি. হুসুমন্নরাও-এর মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন : "Bhattanayaka is viewing *Kávya* from the point of view of the poet as well as the reader, while *ánanda* is laying bare the heart of the reader and has called his work *Sahridaya'loka*. Bhattanāyaka is holding the mirror to the heart of the poet as well as the reader,...".

সঙ্গীতের পক্ষে ঐ একথা। সঙ্গীতে রসসৃষ্টির ও আনন্দানুভবের কারণ সাধারণীকরণব্যাপার, কেননা সঙ্গীতের কথার ও স্বরের তথা সুরের ব্যঞ্জনায় রস সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকারের এবং শিল্পী ও শ্রোতা উভয়েই ঐ সঙ্গীতের কথা বা সাহিত্য এবং স্বরের বা সুরের তরঙ্গের সঙ্গে একীভূত বা একাত্মা হয়ে আনন্দরসস্বরূপ অপার্থিব চৈতন্যের স্পর্শ বা সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এই সাক্ষাৎলাভ করাই সঙ্গীতশিল্পের পরমসার্থকতা, অন্যথা সুরারোপ ও কথার বিলাস বিফলতায় পর্যবসিত হয়।

●

॥ অভিনবগুপ্ত-কর্তৃক রসসূত্রের ব্যাখ্যা ॥

অনুবাদক : শ্রীপরিমল চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

॥ ভট্টনায়কের অভিমত ॥

ভট্টনায়ক বলেন যে, রসের প্রতীতি হয় না, রস উৎপন্ন হয় না, সুতরাং রসের অভিব্যক্তিও হয় না। সামাজিক-ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করিতেন যে, রস তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছে, তাহা হইলে করুণরসে তিনি দুঃখিত হইতেন। কিন্তু এই প্রতীতি যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ (সামাজিকগণের বেলায়) সীতা ইত্যাদি বিভাবের কাজ করে না ; (সীতাকে দেখিয়া) নিজের কান্তার স্মৃতি সামাজিকের মনে উদিত হয় না। দেবতাদির উপস্থাপনের পক্ষে (রসনিষ্পত্তির পক্ষে

অত্যাবশ্যক) সাধারণীকরণের (সার্বজনীনতার) অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং সমুদ্র-লঙ্ঘনাদি অসাধারণ-ঘটনা। এখানে যে কেবল রামের বিশেষ বিশেষ স্মৃতি রহিয়াছে, সামাজিকের দিক দিয়া সেকথা বলা যায় না, কারণ সামাজিক ব্যক্তি তো তাহা পূর্বে উপলব্ধি করেন নাই। শব্দ (শব্দের সাহায্যে প্রদত্ত বিবরণ), অনুমান ইত্যাদি (পরোক্ষজ্ঞানের) সাহায্যে রাম-সম্পর্কে প্রতীতির কথা আনিয়া লইলেও, প্রত্যক্ষজ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ সরসতা সামাজিকগণের মধ্যে বিদ্যমান না থাকার জন্য রসোপলব্ধি হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নায়ক-যুগলের (প্রেমাসক্ত নায়ক-নায়িকার) অবভাসে (প্রবেশে, প্রকাশে) সামাজিকগণের মনে নিজের স্বভাব-অনুযায়ী লজ্জা, জুগুপ্সা, স্পৃহাদির উদয় হয়। রসের উপলব্ধির অভাবই এই অ-ব্যগ্রতার (ব্যগ্রতা বা ওৎসুক্যের) অভাবের কারণ। এজন্য অনুভব, স্মৃতি প্রভৃতিকে রসের প্রতীতিরূপে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। 'রস উৎপন্ন হয়' এই মতের মধ্যেও একই দোষ দেখা যায়। যদি মনে করা হয় যে, রস পূর্ব হইতেই শক্তিরূপে বর্তমান থাকে এবং তাহা হইলে বিষয়ের বৃদ্ধির ফলে রসানুভূতিতে তারতম্যের, ন্যূনতা ও আধিক্যের উৎপত্তি হইলে তারতম্যের উদ্ভব হইবে (বিভাগগুলি রসকে তারতম্য-সহকারে স্ফুরিত করিবে), তাহা হইলে রসের অভিব্যক্তি আমাদের মধ্যে স্বগত (আত্মগত)-রূপে, না পরগতরূপে হয়, অর্থাৎ রস তৃতীয় কোন্ পক্ষে বিদ্যমান থাকে—ইহাই পূর্বের ন্যায় বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সেজন্য আমাদের বক্তব্য হইল, রস ভাবকত্বের (ভাবনার) দ্বারা ভাব্যমান (প্রকাশিত) হয়। কাব্য ও নাটকে শব্দ-বিশেষ শক্তি পরিগ্রহ করিলে ভাবনার সৃষ্টি হয়। ইহা অভিধা হইতে স্বতন্ত্র এবং ইহার দ্বারা বিভাবাদির সাধারণীকরণ (সর্বজনীনতাসাধন) সংঘটিত হয়। এই শক্তি আমাদের মনে অবস্থিত নিবিড় মোহের সঙ্কট নিবারণ করে। কাব্যে দোষের অভাব এবং গুণ ও অলঙ্কারের ব্যাপ্তি এবং নাট্যে চতুর্বিধ অভিনয় ইহার লক্ষণ। এই শক্তির দ্বারা ভাব্যমান (অভিব্যক্ত) রস এমন একভাবে ভোগ করা যায়, যাহার অনুভব স্মৃতি প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ-গুণের মধ্যে অনুযোধের (মিশ্রণের, সংযোগের) বৈচিত্র্যবশতঃ ইহাতে দ্রুতি (দ্রবভাব), বিস্তার এবং বিকাশের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। নিজের সংবিদ্-সমান্বিত বিশ্রান্তির লক্ষণও ইহার একটি বৈশিষ্ট্য। সত্ত্বের প্রাধান্য হেতু এই লক্ষণটি আনন্দ এবং প্রকাশের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহার আস্বাদ পরব্রহ্মের আস্বাদের অনুরূপ।

ভট্টলোল্লটের পক্ষে যুক্তি-খণ্ডনের দ্বারাই ভট্টনায়কের এই পূর্বপক্ষ (পূর্বপক্ষের মত) খণ্ডিত হইতেছে। সেই হেতু ভট্টনায়কের দোষগুলিও উপহৃত (বিনষ্ট) হইয়াছে। (উহাদের খণ্ডন করার প্রয়োজন নাই।) প্রতীতি ইত্যাদি হইতে ভিন্ন (অন্য কোন প্রকার) ভোগ সংসারে আছে ইহা আমাদের জানা নাই। যদি ভোগ বলিতে রসনা (আস্বাদন) বুঝায়, তাহা হইলে উত্তরে বলা যায় যে, রসনাও তো প্রতীতি। যেমন দর্শন (প্রত্যক্ষ-প্রতীতি), অনুমান, শ্রুতি, উপমিতি, প্রতিভান ইত্যাদির বেলায় প্রত্যেকটির অন্য অন্য নাম দেওয়া হইয়াছে, তেমনি কেবল উপায়ের বৈলক্ষণ্যের (প্রভেদের) জন্য রসনা, আস্বাদন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে।

রসের যে নিষ্পাদন (উৎপত্তি) ও অভিব্যক্তি হয়, এই দুইটি কথা স্বীকার না করিলে রস হয় নিত্য (চিরন্তন) হইবে, অথবা উহার অস্তিত্ব নাই (উহা অসৎ) বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত তৃতীয়-পন্থা (উপায়) নাই। তাহা ছাড়া অপ্রতীত বস্তু ব্যবহারের যোগ্য নয়। (ভট্টনায়কের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিরা হয়তো বলিবেন) রসের ভোগীকরণই প্রতীতি এবং রতি প্রভৃতি তাহার স্বরূপ। বেশ, না হয় তাহাই হইল, কিন্তু ইহাই তো একমাত্র দোষ নয়। যতগুলি রস আছে, প্রতীতির ঠিক ততগুলি রসনাত্মক (আস্বাদনাত্মক) রূপ আছে এবং (আপনাদের মতে) ইহাদের প্রকৃতিই হইল ভোগীকরণ। ইহা ব্যতীত (সত্ত্বাদি) গুণগুলির অঙ্গ এবং উপাদানস্বরূপ যে অনন্ত বৈচিত্র্য রহিয়াছে, তাহাও কল্পনা (বিবেচনা) করিতে হইবে। সেইজন্য আস্বাদনকে (ভট্টনায়ক-কর্তৃক ব্যাখ্যাত অভিধা, ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব এই) তিনটি রূপের মধ্যে সাম্য রক্ষা করা কি করিয়া চলিতে পারে ?

●

॥ গ্রীসের দ্বীপে দ্বীপান্তরে ॥

শ্রীতপন কবিরাজ

(এগার)

চূড়ায় ছোট্ট একখানি গ্রাম, তার সাথে আরও ছোট্ট বাজার, বাজারে গ্রীসের কুটীর শিল্পের চেয়ে বিদেশী জিনিষের আধিক্য দৃষ্টিকটু। কোডাক ফিল্ম, জাপানী ক্যামেরা, চাইনিস্ পটারি, জার্মান ঘীয়র, ইতালীর সোনার গয়নার বাজার টইটম্বুর, একটু ঘিরিয়ে নিয়েই সব খুঁজে খুঁজে আসে গীর্জার কাছে। আমাদের দেশে যেমন যে সব তীর্থস্থান যত বেশী অগম্য, বিপদ সঙ্কুল, সেইসব তীর্থের তত বেশী নাম ডাক। এদের বিশ্বাসও অনেকটা ঐ রকমেরই। গীর্জা থেকে বেরিয়েই জনৈকা সহযাত্রিনী মন্তব্য করলেন—"পৃথিবীর এত বড় আক্রোশেও যার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি, সেই গীর্জায় প্রার্থনা করব না ত ক'রব কোথায় ?" নিচে যেদিকে তাকান যায় জল শুধু জল, সেই জলের মাঝখান থেকে খাড়া উঠে এসেছে এই পাহাড়টা। গভীর সমুদ্রে ভেসে রয়েছে বিরাট বিরাট জাহাজগুলো, পালতোলা নৌকাগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে আপন মনে, কেউ কেউ আবার মাছ ধরছে ডিঙ্গি নিয়ে, অতি মনোরম দৃশ্য, দেখে দেখে আশ মেটে না।

বাঁধা ট্যুরের এক মুসকিল পায়ে সরষের শেকল পরানো। সময় শেষ হতেই পা চলে আপনা আপনি। ফেরীতে পৌঁছালে জাহাজ যাত্রীকে না নিয়েই চলে যাবে, সেই ভয়ে সবাই আগেভাগেই রওনা দেয়। নামার সময়ও খচ্চরের পিঠে নামার ব্যবস্থা আছে কিন্তু পড়ে যাবার ভয়ে সবাই পায়ে হেঁটেই নামে। মাঝ পথে পাহাড়ের খাঁজ কেটে তৈরী

গোলাকার মসৃণ জমি। গোটাকয়েক গাছের তলায় সিমেন্টের থান কতক বেঞ্চি, বিশ্রামের জন্য, দুই তৃতীয়াংশ নামা হয়ে গেছে, হাতে সময়ও আছে একটু বিশ্রামের লোভে এই রকম একটা জায়গায় ঢুকতেই কানে আসে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ। এক বৃদ্ধা পড়লেন, লোল চর্ম, চোখে হাইপাওয়ারের চশমা, ঈষৎ স্থূল দেহ, পায়ে অস্বাভাবিক হাইপয়েন্টেড্ হিল জুতো, একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছেন। হাতের ছোট্ট রুমাল চোখের কাজলে, ঠোঁটের রঙে, নাকের জলে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করেছে। কাঁদছেন, আর সমানে বকে চলেছেন "আমাকে মারবার যদি ইচ্ছেই ছিল তা হলে এমন করে হপ্তে হপ্তে মারার কি প্রয়োজন।"

কি মনে হল কাছে গিয়ে বলি—"আমি আপনার কোন সাহায্য করতে পারি ?"

ভদ্রমহিলা তাকালেন, এ রকম অসহায় চাউনি মানুষের জীবনে খুব নজরে আসে না, দুবার ধন্যবাদ জানিয়েই পরমুহূর্তে ধপ করে জলে উঠে চেঁচিয়ে বললেন—"ঐ মিনসেকে বল না, তখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।"

পিছন ফিরতেই দেখি মিনসে অর্থাৎ আরও এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্যুট টাই পরে মাথায় হ্যাট চাপিয়ে অপর একটা গাছের ছায়ায় হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলাকে আবার বলি—"আপনার কষ্টটা কোথায় বলুন না।" মহিলা ফোঁপানি কিঞ্চিৎ কমিয়ে বলেন—"কষ্টটা এইখানে অর্থাৎ পায়ে। হাইহিল জুতো পরে এতদূর উঠে এসেছি এখন এক পা ফেলতে গেলেই পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। পাথুরে রাস্তা খালি পায়েও চলতে পারছি না, এতটা পথ কি করে নামব চিন্তা করতেই আমার রক্তের চাপ মিনিটে মিনিটে ওপরের দিকে উঠছে। আর আমার ঐ সোয়ামীকে দেখ, কেমন নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আহাজ যদি আমাদের ছেড়ে চলে যায়……ওহ্…ভগবান…।" অপ্রিয় সত্যিকথা বলা অপরাধ তবুও বলি—দেখুন দিদিমা দোষটা কিন্তু আপনারই, পাহাড়ে চড়ার আগে বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যাদের কেডস্ বা নরম জুতো নেই তারা হেঁটে ওঠার অথবা নামার চেষ্টা করবেন না, যাদের ভয় করে তারা খচ্চরের পিঠে চড়বেন না," "সেই কথাটা বোঝার কে ?" খিঁচিয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক তাঁর গলায় অর্থাৎ উনিও কাঁদছেন। এতক্ষণে ওঁর মুখ দেখা গেল, ওঁরও বয়স হয়েছে যথেষ্ট, অবাক হই এই ভেবে এই বয়সেও এঁরা এত ধকল সহ্য করে দেশ দেখতে বেরিয়েছেন, পরিশেষে পাহাড়ে ওঠার মত মনের জোর রাখেন। ভদ্রলোক অর্থাৎ স্বামীর রাগ তখনও কমেনি। এতক্ষণ বাদে সুযোগ পেয়ে গলা ছেড়েছেন—"তখন বার বার বললাম, পাহাড়ে উঠে কাজ নেই, কষ্ট হবে, তা আমার কথা শুনলে তো। এখন বোঝো ঠ্যালা ? আজ চল্লিশ বছর ধরে সমানে আমাকে জ্বালিয়ে যাচ্ছে।"

দিদিমাকে বলি, সময় নেই, পথও একটু, আমার কাঁধে ভর দিয়ে নামতে শুরু করুন আর তাও যদি না পারেন আপনার আপত্তি না থাকলে আমি আপনাকে কোলে করে নামিয়ে দেবো।"

দিদিমাকে আর রাখা গেল না কৃতজ্ঞতায় হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

কাঁধে ভর দিয়ে, পায়ের পাতার চাপ দিয়ে, গোড়ালি তুলে দিদিমা নামছেন সিঁড়ি গুণে গুণে, দাদু রেলিং ধরে ধরে নামছেন পাছে পাছে সাবধানে অতি মন্থর গতিতে। খচ্চরের দল যাত্রী নিয়ে ওড়বড়িয়ে একেবারে গা ঘেঁষে প্রাণে আতঙ্ক ধরিয়ে উঠে যাচ্ছে উপরপানে, সহযাত্রীরা লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে পাহাড় থেকে, একে একে সবাই ছেড়ে গেল আমাদের। বেশ কিছুক্ষণ পরে শেষ বাঁক নিতেই দেখা গেল সমুদ্রের তীর আর সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার মুখে নির্মল প্রসন্ন হাসি। খুশীতে সলজ্জ হেসে এবার স্বীকার করেই ফেললেন, বুকলে ইণ্ডিয়ান, দোষটা আমারই, উনি বার বার মানা করেছিলেন, আমিই শুনিনি, ভাবলাম সবাই উঠছে আমিও পারব, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার বয়সের কথাটা ভুলেই গেছিলাম। চল ঐ কফির দোকানটায় একটু জিরোই। কফি খেতে খেতে দাদু দিদার আবার ভাব হয়ে গেছে, দুজনের মুখে হাসি ফুটছে। উঠি উঠি করছি এমন সময় দিদা টুকুস্ করে নিজের ছোট্ট ব্যাগটা খুলে একটা পাঁচ ডলারের নোট বের করে অতি সাবধানে দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন ঠিক আছে ?

দাদু বললেন—"না আরও পাঁচটা দাও।" দিদার হাতে দশটা ডলার কাঁপতে কাঁপতে আমার পানে এগিয়ে আসছে। দিদা নিষাদ ভালবাসায় বলে উঠলেন—"তুমি বাবা আমাদের যত উপকার করেছো, যৎসামান্য এই দশটা ডলার যদি গ্রহণ কর তবে আমরা খুব খুশী হব। দাদুও ঘাড় কাৎ করে সায় দিলেন। দশটা ডলার এই বিদেশ বিভূঁয়ে কাজে দেবে। তবুও কি মনে করে একটু আদর্শবান হবার লোভ হল। দিদার হাতটা চেপে ভাবালুতার আশ্রয় নিয়ে বলেই ফেললাম—সামান্য এই কাজের জন্য আর টাকা দেবেন না। বাপ মা আত্মীয় স্বজনদের কথা না হয় বাদই দিলাম এইটুকু কাজের জন্য আমরা অর্থাৎ ইণ্ডিয়ানরা স্বল্প পরিচিতের কাছেও টাকা নিই না। এই অক্ষমতার জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন।"

দিদা আবেগে দু হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা চেপে ধরেছেন। আমার শক্ত হাতটার চারপাশে ওঁর বুড়ো হাত দুটো কাঁপছে থরো থরো, ওঁর ঘোলা নীল চোখে অশ্রুজল টলমল।

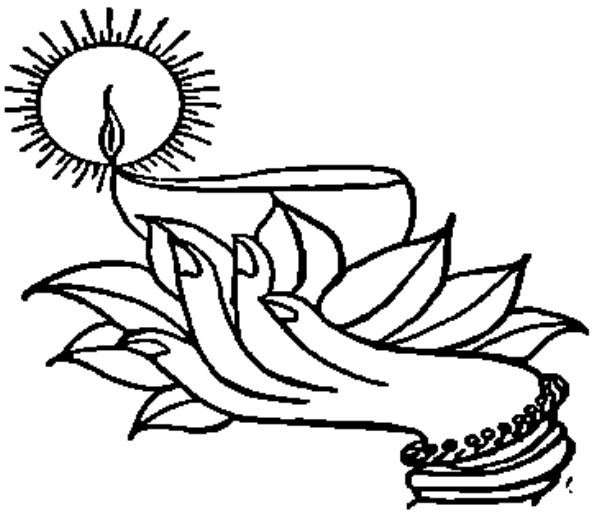

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

॥ শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে ॥

(আঠারো)

আলোচ্য নিবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে ইংরেজী kiln শব্দটি বাংলায় বোঝাতে 'চুল্লী' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সিরিজের 'পোর্সিলেন' বইতে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ বসু kiln এর বাংলা নামকরণ করেছেন 'ভাটি'। অধ্যাপক বসু-র অনুসরণে এখন থেকে kiln বোঝাতে 'ভাটি' শব্দটিই ব্যবহৃত হবে।

সিরামিক সেঁকবার যেসব প্রাচীন ভাটির ধ্বংসাবশেষ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলো দেখতে অনেকটা গোলাকৃতি চৌবাচ্চার মতো। এই ভাটিগুলোর পাঁচ/ছয় ফুট উঁচু দেয়াল ইঁট গেঁথে তৈরী করা হতো। ইরাক, উত্তর আফ্রিকার কোনো কোনো জায়গায় এবং ক্রীট দ্বীপে সিরামিক্‌স্ সেঁকবার কাজে এখনও এধরণের ভাটির ব্যবহার চোখে পড়ে। এই ভাটিগুলোর প্রকোষ্ঠের মেঝে (platform) তৈরী করা হতো মাটির তৈরী চ্যাপ্টা টুকরো (slab) পরপর সাজিয়ে। এই টুকরোগুলোতে কয়েকটি করে ফুটোও থাকতো। প্রকোষ্ঠের মেঝের তলার অংশে গর্ত করে ওই গর্তের মুখে শুকনো কাঠ রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হতো। মেঝের ওপর সাজানো থাকতো কাঁচা (green) মৃৎপাত্রগুলো। আগুনের উত্তাপ মেঝের ফুটো দিয়ে ওপরদিকে বাহিত হতো এবং ওই উত্তাপে মৃৎপাত্র সেঁকা হতো। আগুনের ধোঁয়া ও গ্যাস প্রকোষ্ঠের ওপর দিকের খোলা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতো। এই ধরণের ভাটিগুলোই আধুনিক updraught kiln-এর প্রাচীনতম সংস্করণ।

যে-ধরণের ভাটির প্রকোষ্ঠের ভেতরকার ধোঁয়া ও গ্যাস ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ওপরের খোলা মুখ অথবা চিমনি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়—সে-ধরণের ভাটিকেই updraught kiln বলা

চলে। আধুনিক আপ্‌ড্রাফ্‌ট কিল্‌ন-এর প্রকোষ্ঠটি তৈরী করা হয় উচ্চতাপসহ ইটে (refractory brick) গেঁথে। উত্তাপে সেঁকবার জন্য নির্দিষ্ট মৃৎপাত্রগুলো এই প্রকোষ্ঠে সাজানো থাকে। লাল পোড়ামাটির—অর্থাৎ সাধারণ মাটিতে তৈরী মিনিষপত্রই খোলা অবস্থায় ভাটির প্রকোষ্ঠের মধ্যে সাজিয়ে সেঁকা যেতে পারে। কিন্তু সাদা পোড়ামাটির মিনিষ-পত্র—অর্থাৎ, পোর্সিলেন, ফাইন আর্থেনওয়্যার, বোন চায়না ইত্যাদি খোলা অবস্থায় ভাটির প্রকোষ্ঠে সাজিয়ে সেঁকতে গেলে আগুনের ধোঁয়া এবং গ্যাস লেগে ওগুলোর গায়ে অবাঞ্ছনীয় দাগ ধরে যেতে পারে। সেজন্য এধরণের মিনিষ উচ্চতাপসহ মিশ্রিত মাটিতে তৈরী চতুষ্কোণ অথবা গোলাকৃতি বাক্সে পুরে ভাটিতে সেঁকতে হয়। এই বাক্সগুলোকে বলা হয় স্যাগার (sagger)। ভাটির প্রকোষ্ঠ স্যাগারএ ভর্তি হয়ে গেলে প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথটি উচ্চতাপসহ ইট (refractory brick) এবং উচ্চতাপসহ মাটি (refractory clay)-র সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভাটির প্রকোষ্ঠের বাইরের দিকের দেয়াল সংলগ্ন কয়েকটি অগ্নিকুণ্ডে (fire box) কাঠ অথবা কয়লা রেখে তাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিকুণ্ডের ভেতর দিকে প্রকোষ্ঠের দেয়ালের ফুটো দিয়ে অগ্নিশিখা ভেতরে প্রবেশ করে। অগ্নিকুণ্ডের তলার দিকে যে-গর্ত থাকে—সেগুলোতে জলন্ত কয়লা অথবা কাঠের ছাই জমা হয়। ভাটিতে উচ্চ অথবা নিম্ন তাপের প্রয়োজনে প্রকোষ্ঠের চারদিকে অগ্নিকুণ্ডের সংখ্যা বাড়ানো কিংবা কমানো যেতে পারে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে য়ুরোপে সিরামিক্‌স্ সেঁকবার জন্য যেসব ভাটি নির্মিত হতো—তার অধিকাংশই ছিলো updraught kiln। এই ভাটিগুলো দেখতে অনেকটা বৃহদাকার বোতলের মতো হতো বলে এগুলোকে bottle kiln বলা হতো।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে ইতালীতে যেধরণের updraught kiln ব্যবহৃত হতো—তার নমুনা দেখা যায় ইতালীয় ভাষায় রচিত একটি বইএর রেখাচিত্রে। এই বইটির রচয়িতা বিখ্যাত ইতালীয় সিরামিকশিল্পী সিগ্রিয়ানো পিকোলপাসো। বইএর রেখাচিত্রগুলোও পিকোলপাসোই এঁকেছেন। উল্লিখিত রেখাচিত্রে ভাটির প্রকোষ্ঠটিকে দেখে মনে হয় যেন একটি বিরাটাকার চতুষ্কোণ সিন্দুক। প্রকোষ্ঠের প্রবেশপথ ইট সাজিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রবেশপথের তলায় রয়েছে অগ্নিকুণ্ড এবং অগ্নিকুণ্ডে কাঠ সাজিয়ে তাকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং য়ুরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সিরামিক্‌স্ উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলো। কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি জ্বালানী আবিষ্কারের ফলে সিরামিক্‌স্ সেঁকবার ভাটির গঠনপদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটলো। উচ্চতাপসহ সিরামিক্‌স্ সেঁকবার কাজে ভাটির প্রকোষ্ঠের ভেতরে উত্তাপ সংরক্ষণের বিষয়টি সিরামিকনির্মাতাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। ভাটিতে কাঠের বদলে কয়লার ব্যবহার চলিত হওয়ায় উচ্চতাপে সিরামিক্‌স্ সেঁকা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হলো। updraught

kiln উদ্ভাবিত হওয়ার উচ্চতাপ সংরক্ষণের ব্যাপারে সাফল্যলাভ করা গেলো। updraught kiln অথবা বোতলাকৃতি ভাটিতে আগুনের উত্তাপ সরাসরি ওপর দিকে উঠে বোতলের খোলা মুখ কিংবা চিমনি দিয়ে বেরিয়ে যায় বলে এই ধরণের ভাটিতে উচ্চতাপমাত্রা বজায় রাখতে হলে অগ্নিকুণ্ডে বেশি পরিমাণে করলা অথবা কাঠের প্রয়োজন হতো। Down-draught kiln-এর প্রকোষ্ঠের ওপর দিকের মুখটি খোলা না রেখে বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকোষ্ঠের মেঝেতে থাকে বেশকিছুসংখ্যক ফুটো এবং মেঝের তলায় থাকে কয়েকটি নালি (channel)। নালিগুলো একটি চিমনির সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভাটির অগ্নিকুণ্ডে জ্বালানীতে অগ্নিসংযোগ করলে অগ্নিকুণ্ড সংলগ্ন প্রকোষ্ঠের দেয়ালের ফুটো দিয়ে অগ্নিশিখা ভেতরে প্রবেশ করে তাপাধারে রাখা মৃৎপাত্রগুলোকে একবার সেঁকে ওপর দিকে উঠে যায় এবং প্রকোষ্ঠের ছাদে ধাক্কা খেয়ে নিম্নাভিমুখী হয় ও আবার তাপাধারগুলোকে উত্তপ্ত করে মেঝের ফুটোর ভেতর দিয়ে তলার নালিগুলোতে নেমে নালিবাহিত হয়ে চিমনিতে পৌঁছে বাইরে বেরিয়ে যায়। updraught kiln-এর সঙ্গে তুলনা করলে বলা চলে, একই পরিমানের জ্বালানীতে down-draught kiln এ সেঁকবার কাজটি দ্বিগুণ হয়।

মাফ্‌ল্ কিল্ন (muffle kiln) অথবা বদ্ধ ভাটি সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম আঁচে (৮০০°—১০০° সেন্টিগ্রেড্) চিত্রিত সিরামিক্স্ সেঁকবার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামনের দিক খোলা একটি বাক্সের আকারে মাফ্‌ল্‌টি তৈরী করা হয় উচ্চতাপসহ মাটিতে। মাফ্‌ল্‌টির বাইরের তিন দিকেই উচ্চতাপসহ ইটে দেয়াল গেঁথে একটি তাপসংরক্ষণ (insulation) আবরণ নির্মিত হয়। updraught এবং downdraught—দু-ধরণের বদ্ধ ভাটিই ব্যবহৃত হয়। সিরামিক্স্ চিত্রণে যে-রঙ ব্যবহার করা হয়—সে-রঙ আগুনের ধোঁয়া কিংবা গ্যাসের সংস্পর্শে এলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্য অগ্নিকুণ্ডে আগুন ধরাবার আগে মাফ্‌ল্ অথবা বাক্সের সামনের খোলা দিকটিও উচ্চতাপসহ ইট ও উচ্চতাপসহ মাটির কাদার সাহায্যে বন্ধ করে দিতে হয়, যাতে কোনো রকমেই আগুনের গ্যাস অথবা ধোঁয়া চিত্রিত সিরামিক্স্‌এর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসতে না পারে।

—দিবাকর সেনরায়

●

॥ সংঘবার্তা ॥

আগামী ১২ই ও ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ রবিবার ও সোমবার দুই দিন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ১১৭তম শুভজন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে ১২ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষপূজা ও সন্ধ্যায় 'গীতি-আলেখ্য' এবং ১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় সাধারণসভার অধিবেশন হইবে।

●

উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি বৃক্ষরোপন করেন....

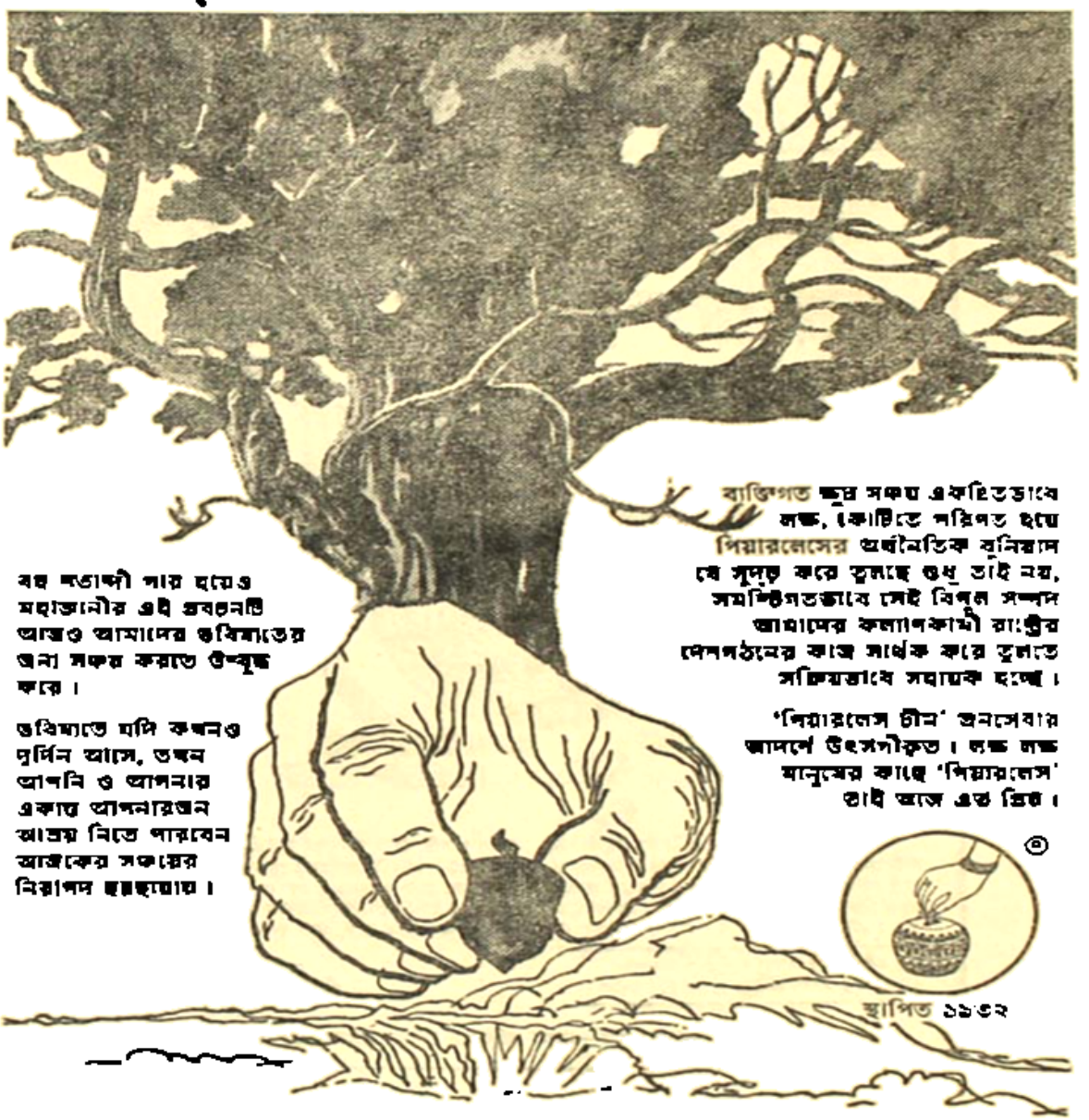

বহু শতাব্দী পার হয়েও মহাত্মাজীর এই প্রবচনটি আজও আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভবিষ্যতে যদি কখনও দুর্দিন আসে, তখন আপনি ও আপনার একান্ত আপনারজন আশ্রয় নিতে পারবেন আজকের সঞ্চয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ায়।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিতভাবে লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদৃঢ় করে তুলছে শুধু তাই নয়, সমষ্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দেশগঠনের কাজে সার্থক করে তুলতে সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে।

'পিয়ারলেস টাইম' জনসেবার আদর্শে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস' তাই আজ এত প্রিয়।

স্থাপিত ১৯৩২

দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

★ ভারতের বৃহত্তম নন্-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান ★

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

"আমাদের অনুরোধে এই যে কার্যসূচী সেটা দেশের আর্থিক উন্নয়নের দৌড়ে পরিকল্পনার সঙ্গে অভিন্নভাবে যুক্ত। কেমন ছিল আমাদের দেশ ছিল উন্নয়ন কোন পর্যায়ে এবং সঠিক ভাবে উন্নয়ন এই কার্যসূচী তাহাই সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণে প্রয়োজন সর্বাত্মক সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই মাসে আমরা সবাই যোগ দি

"এই কার্যসূচী আমাদের অন্তরাত্মাকে খুশি, আমাদের দেশের মানুষ, যে কোন আমাদের নিয়োজনের এবং যে কোনও সময়ে প্রয়োজন করতে হবে, সেবা করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—সবার এগিয়ে চলার অঙ্গীকারের বর্ষ।

dasp 84/108

With Best Compliments from :—

HALDIA TOBACCO HOUSE

DURGACHAK

HALDIA

Dist. MIDNAPORE

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৪১-৬৩৫৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

(মিত্রা সিনেমার পাশে)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত

একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

হেড অফিস : "NEELAMBER", ২৮বি, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ৪৪-৪০২৫, ৪৩-৪২৪৮/১ টেলেক্স : ২১-২৫১৯ TNGIN

ফ্যাক্টরী : ১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৫-১৬১৩

With Best Compliments from :—

A WELL WISHER

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science		Reincarnation	
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi		Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion		Religion, Revelation and God	
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6.00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	
Ideal of Education		The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna		Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10.00
Path of Relization	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music	120.00	Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour		The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South-Asian Peoples, Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its From' Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.

Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
44th Year, August 1982
VOL. VI

Regn. No. WB/NC-14
PHONE 55-1800

23 AUG 1982

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২, ৩৩১২৩২

Cable:'Cookmepure','Queenspice'
Telex:021 2591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70

iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6,Duff Street, Calcutta-700006
PRICE Rs. 1.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১·৫০ টাঃ

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥২॥
পাদবদ্ধো২ক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥২৯॥

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
স্মৃতিসংখ্যা

বিশ্ববাণী

কুমারিল্লিশ বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
সহঃ সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

- 'বিশ্ববাণী'র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি কার্ত্তিক মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৪·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৮·০০ টাকা। গ্রাহক গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১২·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের নির্দেশানুযায়ী প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে 'বিশ্ববাণী' না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী' অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে 'বিশ্ববাণী' অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বর্ষশেষের পূর্বে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসকে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরের নিয়মিত 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য করা হইবে। বর্ষশেষে 'বিশ্ববাণী' বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্ব পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ইচ্ছামত যে কোন সময় অফিস হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ২০ টাকা (২০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Viswavani, Ramakrishna Vedanta Math' এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges বাবদ অতিরিক্ত ১ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

অফিস সময় :—

রবিবার ও বন্ধের দিন সকাল ১০-৩০ মি: থেকে ১১-৩০ মি: এবং বিকাল ৩-৩০ মি: থেকে ৫-৩০ মি:।

॥ অনুরোধসূচক বিজ্ঞপ্তি ॥

বিশ্ববাণীর সহৃদয় পাঠকপাঠিকাবর্গের অবগতির জন্য জানাই যে, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি, ছাপার খরচ বৃদ্ধি এবং ডাকমাশুল তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 'বিশ্ববাণী' প্রকাশের ব্যয় আয় অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরদিকে বিশ্ববাণীর বর্ধিত গ্রাহকমূল্য বার্ষিক সডাক ১৪·০০ টাকা ধার্য হওয়ায় বেশকিছুসংখ্যক গ্রাহকগ্রাহিকা এপর্যন্ত মূল্য পাঠাইতে সমর্থ হন নাই। ফলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং বর্ধিত ব্যয় সংকুলানের জন্য পুনরায় গ্রাহকমূল্য বৃদ্ধি করাও সম্ভব নহে। এই জটিল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহকসংখ্যার উন্নতি। এই গুরু-দায়িত্ব বিশ্ববাণীর কর্তৃপক্ষ এবং অনুরাগী পাঠকপাঠিকাবর্গকে সমানভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস যে, দীর্ঘকালব্যাপী সমাজসেবায় ব্রতী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের শিক্ষা ও ভাবাদর্শের প্রচারক এবং একই সাথে উচ্চতম মানের ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, দর্শন, সাহিত্য ও চিন্তাধারার ধারক ও বাহক 'বিশ্ববাণী'র অগ্রগতি অব্যাহত রাখা দায়িত্বশীল ব্যক্তিমাত্রই নিজ কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন।

'বিশ্ববাণী'র এই সঙ্কটাবস্থায় সকল গ্রাহকগ্রাহিকার নিকট তাই বিনীত আবেদন যে, তাঁরা নিজ নিজ আত্মীয়পরিজন অথবা বন্ধুমহলে যথাসাধ্য নূতন গ্রাহকগ্রাহিকা করুন। ভাদ্র মাস হইতে 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যাইবে। ষাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য মাত্র ৮·০০ টাকার বিনিময়ে পূজার বিশেষসংখ্যাসমেত পরপর ৬টি সংখ্যা পাইবেন। M.O. মারফৎ গ্রাহকমূল্য ৮·০০ টাকা এবং M.O. কুপনে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইলে নূতন গ্রাহক/গ্রাহিকাদের নাম 'বিশ্ববাণী'র গ্রাহকতালিকাভুক্ত করা হইবে এবং ভাদ্র '৮৯ সংখ্যা হইতে মাঘ '৮৯ সংখ্যা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হইবে। ডাকের গোলযোগে কোন সংখ্যা না পাইলে সেই সংখ্যাটি পুনরায় পাঠানো হইবে। পত্রিকা এই অফিস হইতে সংগ্রহ করিলে ষাণ্মাসিক গ্রাহকমূল্য ৮·০০ টাকার পরিবর্তে ৭·০০ টাকা মাত্র জমা দিতে হইবে। বার্ষিক গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক হইলে M. O.-যোগে ১৪·০০ টাকা পাঠাইতে হইবে। বার্ষিক গ্রাহক/গ্রাহিকাদের বর্তমান বর্ষের শুরু, গত ফাল্গুনের বিশেষ সংখ্যাসমেত এযাবৎ প্রকাশিত সকল সংখ্যাই ডাকযোগে পাঠানো হইবে। ফাল্গুন '৮৯ হইতে বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ১৪·০০ টাকা পাঠাইয়া সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাই 'বিশ্ববাণী'র বার্ষিক গ্রাহকতালিকাভুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই অফিস হইতে সংগ্রহকারী গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ১৪·০০ টাকার পরিবর্তে ১৩·০০ টাকা জমা দিতে হইবে।

'বিশ্ববাণী'র পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আগ্রহী পাঠকপাঠিকাদের এই অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করি।

—কার্যাধ্যক্ষ

প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ চতুর্থ ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

- এই চতুর্থ ভাগে ২৩টি পরিচ্ছেদ, একটি পরিশিষ্ট ও শ্রীশ্রীকথামৃত যে সাহিত্য ও দর্শন-মুখর একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ তাহা লিখিত হইয়াছে।
- এই চতুর্থ ভাগের প্রধান আলোচ্য বিষয় : হটযোগ ও রাজযোগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, প্রতিমাপূজার প্রতিপাদ্য বিষয়, ঈশ্বরের অবতরণ ও অবতারবাদ, ষটচক্রের বিশদ বর্ণনা ও সপ্তভূমির সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি, পঞ্চকোষসাধন ও তার ক্রম, বেদান্তে আনন্দময়-অধিকরণ ও পঞ্চকোষরহস্য, মন্ত্রসাধনা ও জপমালা, অনাহত বা অব্যক্ত-নাদ, ষ্টার-থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ, বিজয় গোস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণযাত্রায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে-চারিশত পৃষ্ঠা, ডিমাইসাইজ। ছবি : শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীমা সারদাদেবীর একটি নূতন চিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাতের লেখা এবং রামায়ণের পুঁথি-নকলের ২ পৃষ্ঠা, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের বেঞ্চিতে বসা একটি গ্রুপ-ফটো এবং শ্যামপুকুর-বাটির ৪টি ছবি।

মূল্য—পঁচিশ টাকা

প্রকাশোন্মুখ—

মন ও মানুষ—দ্বিতীয় ভাগ

অভেদানন্দ দর্শন—প্রথম ভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

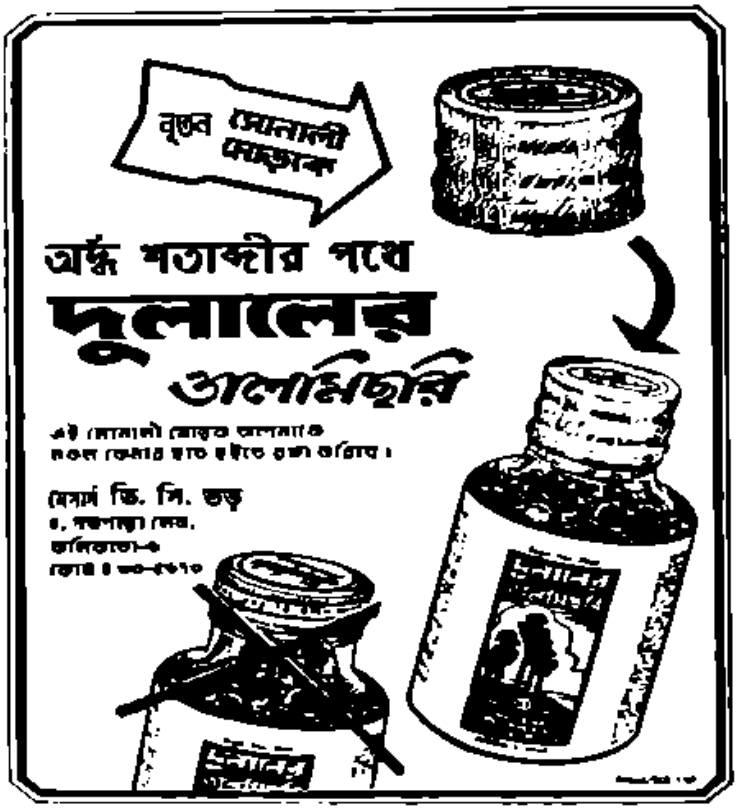

বেনারসী
জিল্কি
সাড়ী
পোষাক

শৈলালাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট · কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী
শাল
বিছানো
হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড
শান্তিরস সালসা
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে
বাত বেদনায় অব্যর্থ
সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য
৭০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পীড়াহর

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৫-৩৮৬০
ল্যাবরেটরি—৪৬-২৪৭৪

ফোন : ৪৫-৮৪২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

ন্যাশনাল ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৪৫-১৮০০

ভাদ্র, ১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীকুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন। ● স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়। ● প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ। ● ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন। ● প্রতি রবিবার বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Phone : 55-2526
64-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004
(Front of Shyambazar Tram Dept)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timostar, Shroeshyla, Sandoz, Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hes, Anglo-Swiss & Favre-Leuba Timo Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কেয়োড়

মহাভৃঙ্গরাজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

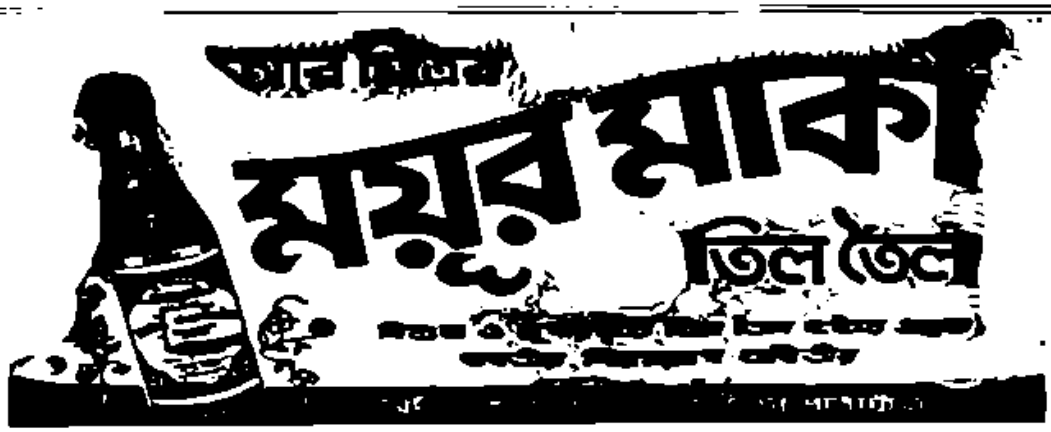

ফোন নং ২৩-১৮০৫-৯ (৫টি লাইন)

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

ভাদ্র, ১৩৮৯

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	২৫৫	
২।	ভাষপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ	২৬৩	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	২৬৫	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৪।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	২৬৬	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৫।	বৌদ্ধ সম্মেলন ও বৌদ্ধচিন্তা— স্বামী অভেদানন্দ	২৬৯	অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : পণধর তর্কচূড়ামণি	২৭১	শ্রীরবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৭।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা	২৭৬	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৮।	দেশাত্মবোধক গান : রজনীকান্ত সেন	২৭৯	অধ্যাপক : ডক্টর রামজীবন আচার্য
৯।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২৮২	
১০।	গ্রন্থ-সমালোচনা	২৮৫	
১১।	সংঘ-বার্তা	২৯১	

With Best Compliments from :—

HALDIA TOBACCO HOUSE

DURGACHAK

HALDIA

Dist. MIDNAPORE

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

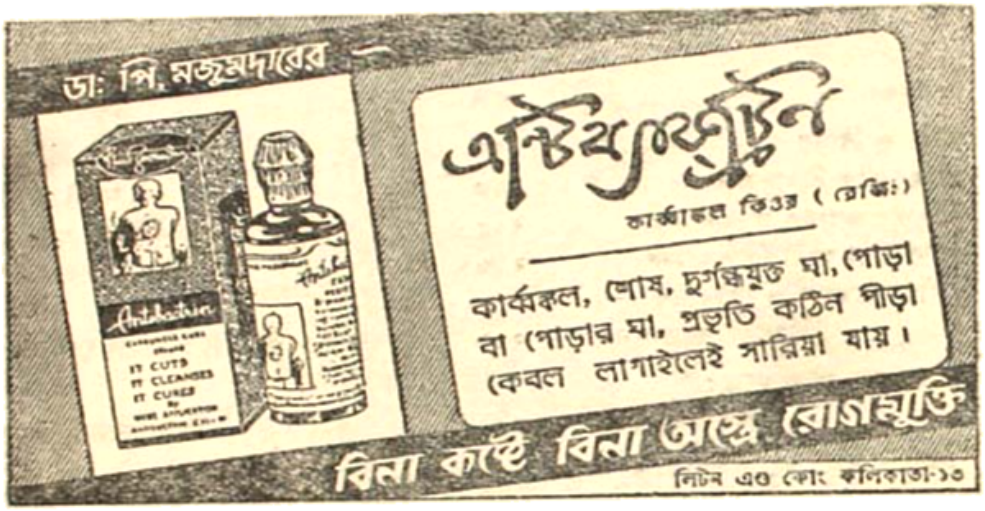

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMA

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

Calcutta-4

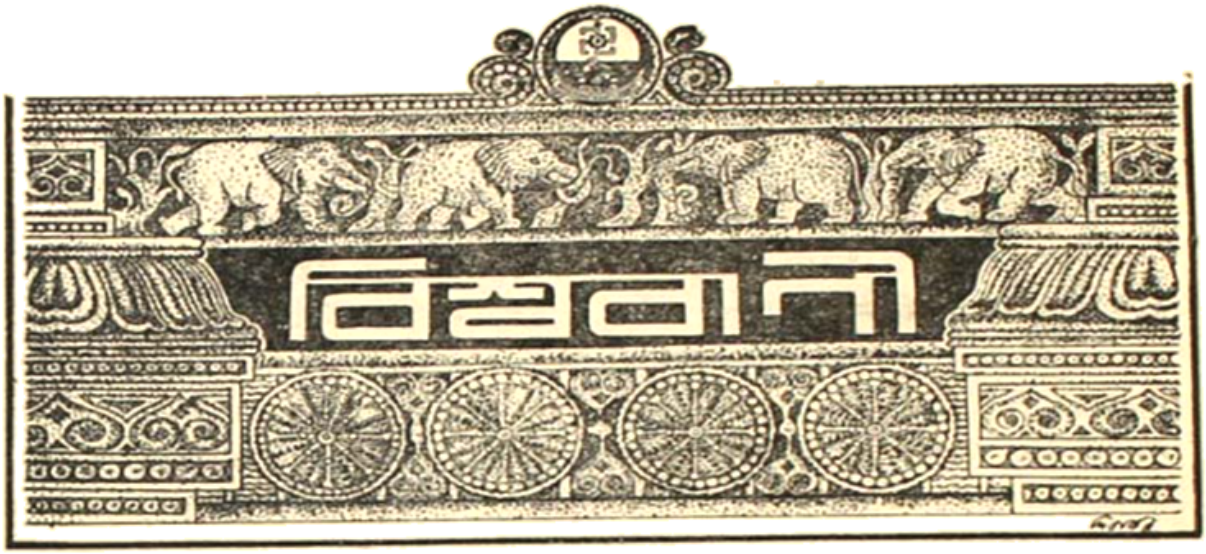

চুয়াল্লিশ বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা | ভাদ্র ১৩৮৯

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ রাধা আদ্যাশক্তি ও প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ ॥

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীকৃষ্ণকে 'সাক্ষাৎ-পূর্ণব্রহ্ম' বলেছেন। তিনি বলেছেন: "তিনিও (শ্রীকৃষ্ণও) রাধাময় কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ: ২৩৮)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন: "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি; চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি—ত্রিগুণময়ী। এঁর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লাল-কালোর আমেজ, তারপর লাল, তারপর সাদা বেরুতে থাকে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে—কামরাধা, প্রেমরাধা, নিত্যরাধা। কামরাধা চন্দ্রাবলী, প্রেমরাধা শ্রীমতী। নিত্যরাধা নন্দ দেখেছিলেন—গোপাল কোলে।

"এই চিচ্ছক্তি (বৈষ্ণবদর্শনের), আর বেদান্তের (সগুণ-)ব্রহ্ম (পুরুষ) অভেদ। যেমন জল আর তার হিমশক্তি। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তির ভাবনা এসে পড়ে। সাপ আর সাপের তীব্রগতি। তীব্রগতি ভাবলেই সাপকে ভাবতে হবে। ব্রহ্ম যদি কখন?—যখন নিষ্ক্রিয় বা কার্যে নির্লিপ্ত। পুরুষ যখন কাপড় পরে, তখন পুরুষই থাকে। ছিলে দিগম্বর, হলে সাম্বর, আবার হবে দিগম্বর। সাপের ভিতর বিষ আছে, সাপের কিন্তু হয় না; যাকে কামড়াবে, তার পক্ষে বিষ। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ: ২৩৯)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদান্ত ও বৈষ্ণবশাস্ত্র উভয়ের তত্ত্বের কথা বলেছেন। সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি যে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণবিশিষ্ট। সাম্যে প্রকৃতি ও বৈষম্যে তিনগুণ—এই তত্ত্বেরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন। তবে সেই সঙ্গে বৈচিত্র্যের মাঝে একত্বের যে তত্ত্বমাধুর্য—সে'কথারও তিনি পরিচয় দিয়েছেন পেঁয়াজের খোসার নিদর্শন দিয়ে। তারপর ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এই দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে চিচ্ছক্তি শ্রীরাধা বা প্রকৃতি যে পরমপুরুষ ও পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন—সেই তত্ত্বেরও পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া পরিচয় দিয়েছেন অঘটনঘটনপটিয়সী-মায়ার দৈবী-শক্তির কথা। এই দৈবী বা পরমেশ্বরী-শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকে বিমুগ্ধ করে, পথভ্রান্ত করে, লক্ষ্যচ্যুতি ঘটায়, কিন্তু ঈশ্বরে যখন থাকে, তখন ঈশ্বরের মধ্যে বিকৃতি বা বিরূপ সৃষ্টি করতে পারে না, বরং ঈশ্বর মায়াধীশ হয়ে সগুণ-ব্রহ্মরূপে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করেন। ঋষি বাদরায়ণ ব্রহ্ম-সূত্রের ১।১।২ ('যন্মাত্তস্য যতঃ')-সূত্রে এর (সগুণ-ব্রহ্মের) পরিচয় দিয়েছেন, আবার সর্বগুণবর্জিত নির্গুণ-ব্রহ্মেরও পরিচয় দিয়েছেন। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণ থাকায় ও না-থাকায়ই ব্রহ্ম-রূপ ব্যাপকচৈতন্যকে আমরা সগুণ ও নির্গুণ-রূপে কল্পনা করি। কল্পনার জগতে কল্পনা করাই স্বাভাবিক। আচার্য শঙ্করও বলেছেন : 'চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্',—অর্থাৎ মনের বিলাস বা কল্পনাই সৃষ্টি ও বিশ্বচরাচর। এজন্য গৌড়পাদকারিকার আচার্য গৌড়পাদ অজাতিবাদ স্বীকার ক'রে চিত্তের 'অমনী'-স্বভাবের কথা বলেছেন। লীলার বিলাস ও সকল-কিছুকে আপাতত-সত্য ব'লে স্বীকার করতে হয়, যথার্থ-বিচার ও জ্ঞানের ক্ষেত্রের কথা স্বতন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ছিলে দিগম্বর, হলে সাম্বর, আবার হবে দিগম্বর"।[১] সৃষ্টিবিলাসের বিলয়ে দিগম্বর, আবার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য নিয়ে সাম্বর, পুনরায় স্বরূপে স্থিতি হ'লে দিগম্বর। মা-কালী দিগম্বরী অর্থে দশদিকে বা সর্বদিকে প্রকাশিতা। মহাচৈতন্যরূপিণী কালী স্বরূপে প্রথমে বিবসনা—দিগম্বরী,—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'। পরে অদ্বিতীয়-ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি। এখানেই 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'-কথার সার্থকতা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : **"ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত"**। নিজে বলতে স্বরূপে (নির্গুণ-ব্রহ্ম) এবং বিরূপে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর। ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতির অর্থ ব্রহ্মচৈতন্য (তুরীয়) সগুণ-নির্গুণেরও অতীত পরমোত্তীর্ণ-সত্তা—দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত-সত্তা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩১)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উক্তি ও সিদ্ধান্ত বৈষ্ণবতত্ত্বদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখি যে, বৈষ্ণবদর্শন এবং বিশেষ ক'রে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন ও বৈষ্ণবাচার্যরা শ্রীকৃষ্ণকে 'পরব্রহ্ম'-রূপে স্বীকার করেন এবং 'চিচ্ছক্তি' মহাপ্রকৃতিময়ী

১। 'অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা'।
—গীতায় এ'কথাই যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই কথা।

শ্রীরাধা।[২] শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ—আনন্দরসসাগর। নৈর্ব্যক্তিক (অনাস্বাদিত) অথচ আস্বাদনীয় সেই আনন্দ—ভক্ত-সাধকদের পক্ষে। সেই নৈর্ব্যক্তিক-আনন্দ সৎ ও চিতের সঙ্গে অবিনাভাবে সমন্বিত, সুতরাং সৎ-চিৎ-আনন্দ পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৮)। তিনি বলেছেন : "শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি—আদ্যাশক্তি"। বৈষ্ণবদর্শনের মতে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। "তাঁহার অনন্ত শক্তি ; তন্মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান। ...এই তিনটি প্রধান শক্তি হইতেছে—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। "চিচ্ছক্তি হইতেছে জ্ঞানরূপা, চেতন : চেতন-ব্যতীত অপর-কিছু ইহাতে নাই, অপর-কিছুর প্রভাবও এই শক্তিতে নাই। এই চিচ্ছক্তি অবিচ্ছিন্ন-ভাবে পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে নিত্য-বিরাজিত,—অগ্নিতে অগ্নির দাহিকাশক্তির মতো।...ইহা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূতা বলিয়া এই চিচ্ছক্তিকে 'স্বরূপ-শক্তি'-ও বলা হয়। উল্লিখিত তিনটি প্রধানা শক্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাকে 'পরাশক্তি'-ও বলা হয়। স্বরূপভূতা বলিয়া 'অন্তরঙ্গা-শক্তি'-ও বলা হয়।

"এই স্বরূপ-শক্তির তিনটি বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ এবং হ্লাদিনী। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সৎ, চিৎ এবং আনন্দ-স্বরূপ। স্বরূপ-শক্তি—যখন তাঁহার সৎ-অংশের সহযোগে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলে 'সন্ধিনী-শক্তি'। সন্ধিনী-শক্তি হইতেছে সৎ-সম্বন্ধিনী বা সত্তা-সম্বন্ধিনী-শক্তি। এই সন্ধিনী-শক্তি-দ্বারাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-সত্তা রক্ষা করেন, অপরেরও সত্তা রক্ষা করেন। সত্তাসম্বন্ধিনী-শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সত্তাও ইহাতেই অবস্থিত ; সন্ধিনী-শক্তিই আধার-শক্তি।

"আর স্বরূপ-শক্তি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-অংশের সংযোগে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলে সম্বিৎ-শক্তি। সম্বিৎ-শক্তি হইতেছে জ্ঞানশক্তি—চিৎ-সম্বন্ধিনী-শক্তি। এই সম্বিৎ-শক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নিজেও জানেন এবং অপরকেও জানান।

"স্বরূপ-শক্তি—যখন তাঁহার আনন্দাংশের সহযোগে ক্রিয়া করে, তখন তাহাকে বলে হ্লাদিনী-শক্তি বা আনন্দ-সম্বন্ধিনী-শক্তি। এই হ্লাদিনী-শক্তিদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ (পরব্রহ্ম) নিজেও আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন।

২। ব্রহ্মসংহিতায় আছে : 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সঙ্গে রাসলীলা অপ্রাকৃত-আনন্দক্রীড়া বা আনন্দলীলা : 'শ্রীকৃষ্ণস্য গোপীভিঃ সহ আনন্দক্রীড়াবিশেষঃ'। 'রাসরহস্য'-গ্রন্থে আছে : 'অত আত্মশক্তিসমূহেভ্যঃ আত্মনঃ আনন্দক্রীড়া এব রাসঃ। সচ্চিদানন্দস্য সন্ধিনী-সম্বিদ-হ্লাদিনী-শক্তিনাং যো বিশেষবিকাশঃ সংহৃষ্যং তদেব রাসলীলা'।

বৈষ্ণবদর্শনাচার্যগণ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা অখণ্ডক একতত্ত্ব। অভিন্ন প্রেমঘনমূর্তি। লীলার পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীভগবানের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা ও কোটি-কোটি ব্রজগোপীরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসলীলার অনুষ্ঠান করেছিলেন। প্রেম থেকে ভাব, তারপর মহাভাব। মহাভাবের প্রকট-মূর্তি শ্রীরাধা। ভাবে আত্মহারা হ'লে দেহজ্ঞান থাকে না, এজন্য রাসতত্ত্বের সঙ্গে রক্ত-মাংসের দেহের কোন সম্বন্ধ থাকে না। ব্রজগোপীরা সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান হারিয়ে অখণ্ড-রাসক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভাবের ঘনঘনমূর্তি শ্রীচৈতন্য ভাবাভাবে ওতপ্রোত হ'য়েই রাসতত্ত্বসাগরে অবগাহন করেছিলেন। শ্রীরাধা [illegible] মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হতেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাতত্ত্বের ছিলেন পরম-মর্মগ্রাহী।

"স্বরূপ-শক্তির এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে 'হ্লাদিনী'-ই সর্বশ্রেষ্ঠা"[৩] (ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক : 'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ', পৃঃ ২-৫)। তাঁর রচিত 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন'-ও (১-৪র্থ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন 'প্রেম'-কে সাধারণভাবে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলে। প্রেম স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি নিত্যসিদ্ধ। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে গ্রন্থের কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মহাশয় বলেছেন—

'সচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশসন্ধিনী।
বিদংশে সংবিৎ যারে 'জ্ঞান' করি মানি॥

—চৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।৫৪-৫৫

পূর্বেও এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

শ্রীরাধা হ্লাদিনীশক্তি প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত পুরুষ (পরমপুরুষ)। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবসাধকদের মতে 'পুরুষ' একজনই এবং তিনি বৃন্দাবনবিহারী পরমব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ শারদ-রাসের অনুষ্ঠানটি এক অবিস্মরণীয় অপার্থিব লীলার অনুষ্ঠান। 'রাস'-অনুষ্ঠানে সকলেই পুরুষ ও প্রকৃতি, অর্থাৎ রাসমণ্ডলে চক্রাকারে সমবেত গোপীদের একজন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হলেও গোপীরা অনুভব করেন তাঁদের পাশে শ্রীকৃষ্ণ অনেক (কোটি-কোটি)—এক একজন গোপীর পাশে এক একজন শ্রীকৃষ্ণ। রাসলীলাবর্ণনার প্রথমে শ্রীধর-স্বামী বলেছেন: 'ব্রহ্মাদিজয়সংরুঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা, জয়তি শ্রীপতিগোপীরাসমণ্ডলমণ্ডনঃ',—অর্থাৎ রাসমণ্ডলমণ্ডন শ্রীপতির শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হোন। শ্রীধর-স্বামী শারদ-রাসলীলা-বর্ণনার সময়ে বলেছেন যে, রাসলীলা আগাগোড়াই 'ত্যাগের' নিদর্শন। গীতার এই ত্যাগের কথা ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের কথা উল্লিখিত আছে : 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। রাসলীলায় এই ত্যাগ ও শরণাগতির মন্ত্র মূর্ত হয়ে উঠেছিল। গোপীরা কুল-মান-লজ্জা সকল-কিছু ত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেছিল। শ্রীমদ্ভাগবতকার সেজন্য বলেছেন—

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

৩। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর Hindu Mysticism-গ্রন্থে (১৯৪০) 'হ্লাদিনী'-শব্দটির গূঢ়ার্থ-সম্পর্কে বলেছেন : "The expression of divine life in nature is limited by the sense of 'the other'. But here there is no restriction, for there is no 'other'. It is all spirit. The Vaishnavas characterise this as the order of bliss (*Hladini* that which is pure Bliss and which gives pure Bliss). The earth is the vale of soul-making. *Vaikuntha* is the vale of self-fulfilment. Even in mystic ascent the opposites meet. At this height all opposition melts away" (p. 168). অধ্যাপক অটোও তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে বৈতসত্তা বুঝাতে 'the other'-শব্দ ব্যবহার করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কেড়ে নেওয়া ব্রজগোপীদের (অপহৃত) মন সেই প্রকৃতিমুগ্ধ কামোদ্দীপক গীত শ্রবণ ক'রে ও একে অপরের (পরস্পরের) প্রতি গমনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য না ক'রেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলের যেখানে অবস্থান করছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। যাওয়ার সময়ে (গমনবেগে) তাঁদের কর্ণের কুণ্ডলসমূহ দোলায়মান হচ্ছিল।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় 'কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ'। তাছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ, ২৯শ অধ্যায়ে) যেখানে উল্লিখিত হয়েছে : 'গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ···কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা···' (৮-৯), সেখানে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ-কর্তৃক অপহৃতচিত্তা ও মোহিতা সেই সকল গোপীগণকে পতি, পিতা, ভ্রাতা, ও বন্ধুগণ নিষেধ করলেও তাঁরা সে'কথা শোনেন-নি। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণচিন্তামগ্নাগৃহমধ্যস্থিতা কোন কোন গোপী বাইরে যেতে অসমর্থ হলে তাঁরা মুদ্রিত-নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করতে থাকেন।

একথা বলার উদ্দেশ্য যে, রাসমণ্ডলের অনুষ্ঠান-সম্পর্কে চিন্তার ও তার যথার্থ ভাব গ্রহণ করার অধিকারী একমাত্র কামজয়ী জিতেন্দ্রিয়-সাধকরা, অন্যেরা নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে এজন্য রাসলীলাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'মুদ্রারূপসাক্ষাচ্চেতসো বহির্মুখানপি স্বপরান্ কর্তুমিতি ভাবঃ'—বলেছেন শ্রীধর-স্বামী টীকামুখে। পদকর্তা গোবিন্দ-দাস ধ্যাননেত্রে রাসলীলা দর্শন ক'রে বলেছেন—

শারদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল-মল্লিকা মালতি যূথী
মত্ত মধুকর ভোরণী।

শ্রীমদ্ভাগবতে রাসপঞ্চাধ্যায় এজন্য নিবৃত্তিকামী সাধকদের জন্য নির্বাচিত—'নিবৃত্তিপরেরুঃ পঞ্চাধ্যায়ী'। শ্রীকৃষ্ণ পরম-রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'। প্রকটিত ও প্রকাশিত রসের নামই 'রাস'। রস প্রকটিত হয় আস্বাদনে—'আস্বাদ্যত্বাৎ—' বলেছেন ভরত। সেজন্য আস্বাদ্যমান রসই রাস। শারদ-রাসলীলার অনুষ্ঠান ভোগমুখী গোপীদের মনকে কৃষ্ণমুখী হওয়ার জন্য সাহায্য করেছিল, সেজন্য গোপীরা নিজেদের শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকৃতিরূপ গোপীভাবে বিভোর হয়েছিলেন। বৈষ্ণবপদকর্তারা বলেন যে, পরম-আস্বাদ্য-'রস' রাসলীলায় প্রকটিত হয় গোপী-গোবিন্দের মহামিলনে। প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস-কবিরাজ 'শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত'-গ্রন্থের ১২শ সর্গে রাসলীলাপ্রসঙ্গে নৃত্য-গীতের বর্ণনা ক'রে বলেছেন—

বিলসেত্থং হরিস্তাভিশ্চক্রভ্রমণ-নর্তনৈঃ।
রাসলীলা-বিশেষাঢ্যং চক্রাদ্যবকরোহ সঃ ॥৬৮

রাসলীলার অনুষ্ঠানে শ্রীরাধাসহ গোপীদের ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত-সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ব্যবহৃত হয়েছিল : 'মল্লার-কর্ণাটক-নট্ট-সাম-কেদার-কামোদ-ভৈরবাদীন-গান্ধার-দেশাখ-বসন্ত-কাংশ···'।[৪] 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'-বৈষ্ণবগ্রন্থেও রাসলীলার বর্ণনা আছে অপরূপভাবে।

৪। 'গোবিন্দলীলামৃত'-গ্রন্থে বর্ণিত রাগ-রাগিণীর এবং নৃত্য-বাদ্যাদির বর্ণনা করেছেন কৃষ্ণদাস-কবিরাজ ভরতের নাট্যশাস্ত্রোক্ত ধারাকেই অনুসরণ ক'রে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব রাসলীলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব-স্বরূপের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: রাধাভাবস্বরূপিণী হ্লাদিনীশক্তি প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণবাচার্যদের মতে পুরুষ একজনই এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু 'রাস'-অনুষ্ঠানে সকলেই প্রকৃতি। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "(ভক্তদের প্রতি)—শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ূর-পাখা। ময়ূর-পাখাতে যোনি-চিহ্ন আছে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেখেছেন।

"কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন। কিন্তু সেখানে নিজে প্রকৃতি হ'লেন। তাই দেখ—রাসমণ্ডলে তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) মেয়ের (প্রকৃতির) বেশ। নিজে 'প্রকৃতি-ভাব' না হ'লে প্রকৃতির সঙ্গের অধিকারী হয় না। **প্রকৃতিভাব হলে তবে রাস, তবে সম্ভোগ**" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩০)।

পূর্বেই বলেছি যে, শ্রীমদ্ভাগবতের একোনত্রিংশ-অধ্যায়ে শারদ-রাসের বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে এবং প্রথম শ্লোক: 'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ···'। ত্রিংশোঽধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে যেখানে বলা হয়েছে: 'গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ, অসাবহম্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ'। এর টীকায় শ্রেষ্ঠের শ্রীধর-স্বামী বলেছেন: 'প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্তয়ো যাসাং তাঃ অতঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাং কৃষ্ণস্যেব বিহারবিভ্রমাঃ ক্রীড়াবিলাসা যাসাং তাঃ। **অহমেব কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিতবত্যঃ**'। ভাবার্থ হলো: এই রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রাধাভাবে (ও গোপীভাবে) বিমোহিত হ'য়ে পুরুষভাব বিস্মৃত, তেমনি গোপীরাও নিজেদের গোপীভাবসত্তা বিস্মৃত হ'য়ে 'আমিই কৃষ্ণ'—সকলেই কৃষ্ণভাবে বিমোহিতা। রাসমণ্ডলের মধ্যে এজন্য পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব-বিবর্জিত-মন। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাসহ সমস্ত গোপীরাও সেইরকম। মোটকথা পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব (দ্বৈতভাব) সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত (বা বিস্মৃত) না হ'লে শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের মর্মকথা যথার্থভাবে বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "প্রকৃতিভাব হ'লে তবে রাস, তবে সম্ভোগ"। শ্রীমদ্ভাগবতের একোনত্রিংশোঽধ্যায়ে শ্রীধর-স্বামী-টীকায় তাই স্পষ্টই বলেছেন: "কিন্তু শৃঙ্গার-কথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ"। নিবৃত্তিপর এই শারদরাসপঞ্চাধ্যায়। এজন্যই কামভাববিজয়ী জিতেন্দ্রিয়-চিত্ত না হ'লে রাসপঞ্চাধ্যায় পড়ার ও অনুভব করার অধিকারী হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণের অপার্থিব-প্রেমের মাধুর্য ও মহিমাকে সার্থক-রূপ নিতে প্রকাশ করার জন্যই 'রাসলীলা'-র অনুষ্ঠান। একথা সত্য যে, শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতরূপের ধারণা মানবিকরূপে সাধারণের সমাজে প্রকাশ পেলেও তা অপার্থিব অসাধারণ ও স্বর্গীয়: 'The *Bhágavata* conception of Krishna is thus intensely human yet perfectly divine'. ভক্টর সিল্ভের ভট্টাচার্য তাঁর *The Philosophy of the Srimad-Bhagavata*-গ্রন্থে রাসলীলার মর্মকথার পরিচয় দিতে তাই লিখেছেন: '...such union of Krishna with the cowherd women (in *rásalilá*) represented the perfect revelation of the sentiment of love (*prema-rasa*), in which the nucleus (*álambana*) was Krishna, the exciting conditions *uddipana* were the fall moon, the fragrance of flowers etc., the

expressive conditions (*anubhāva*) were the different gestures of cowherd girls and the fluctuating conditions (*sanchārī-bhāva*) were pigue, sorrow, etc. on the part of the *gopis*.

'In this revelation of Krishna's nature as all-bliss, popularly described as *rasa-līlā*: 'রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ' (১০।৩৩।৩)" (vide pp. 127-128). আসলে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র রচনা ক'রে গোপীরা রাসমণ্ডলে চক্রাকারে নৃত্য করেছিলেন। সেই বৃত্ত বা চক্রাকার-নৃত্য অনন্ত-অফুরন্ত-আনন্দ-শক্তিরই প্রতীক।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থের শ্রীমদ্ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা গোপী-গণের অপ্রাকৃত ভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন ও বলেছেন যে, রাসমণ্ডলে বৃত্তাকারে নৃত্যের সময়ে প্রতিটি গোপী ও শ্রীরাধিকা তাঁদের প্রত্যেকের পাশেই গোবিন্দ-শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করতে অনুভব করেছেন। অধ্যাত্মসাধকদের পক্ষেও তাই। শ্রীমদ্ভাগবততত্ত্বের সারামৃত আত্মতত্ত্বোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধিতে যে অবিমিশ্র-আনন্দ—সেই আনন্দের রসসাগরে 'আমি'-'তুমি'-দ্বৈতভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ক'রে অদ্বয়-আনন্দ-সত্তায় একীভূত বা একাকার না হ'তে পারলে রাসপঞ্চাধ্যায় অনুশীলন করার কোন সার্থকতা নাই। সেজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেছেন: 'নিবৃত্তিতরৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোভিরামাৎ' এবং পরমশৃঙ্গাররসসেবিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।[৫] শৃঙ্গাররস স্বর্গীয়-প্রেমস্বরূপ—সাধকের পরমসহায়ক। নাট্যশাস্ত্রে (৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) মুনি ভরত শৃঙ্গাররসের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ···।···হৃদ্যোজ্জ্বলবেষাত্মকঃ শৃঙ্গারো রসঃ"। শৃঙ্গাররসের অন্যতম বিকাশ নির্বেদ, ত্যাগ, বা বৈরাগ্য। সমগ্র শারদ-রাসলীলানুষ্ঠানটি ছিল শৃঙ্গাররসাভিষিক্ত অনুষ্ঠান। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলার সম্ভোগে লীলারসগ্রাহী সাধককে সম্পূর্ণভাবে কামজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় হ'তে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক'রে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলাম। মেয়ে-মানুষের কাপড়, গহনা পরতুম, ওড়না গায়ে দিতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম। তা না হ'লে পরিবারকে (শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে) আটমাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন ক'রে? দু'জনেই মা-র সখী"।

"আমি আপনাকে পুং (পুরুষ) বলতে পারি না। একদিন ভাবে রয়েছি, (পরিবার—শ্রীশ্রীসারদাদেবী) জিজ্ঞাসা করলে: 'আমি তোমার কে?' আমি বললুম: 'আনন্দময়ী' (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৯-২৩০)।

৫। তবে মাধ্ব-সম্প্রদায় ও এমনকি রামানুজসম্প্রদায় রাসলীলার অনুষ্ঠানকে বিশেষ-দৃষ্টি দিয়ে গ্রহণ করেন না,—যদিও ভাগবতপুরাণকে তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। "Madhvaism is more speculative than emotional. It may be noted that though the Madhvas have great reverence for the *Bhagavata-purana*, yet they reject the erotic *Rasa-panchadhyaya*, which is regarded by the Bengal Vaishnavas as the very soul of the *Bhagavata*, each of the fine chapters representing one of the fine vital functions, as it were, of the sacred work".—Vide Dr. S. C. Chakravarti: *Philosophical Foundation of Bengal Vaishnavism* (1969), pp. 335-336.

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এটি পুরুষ-প্রকৃতি-বর্জিত ব্রহ্মস্বভাবের অবস্থা। গীতায় এই অবস্থাকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়েছে। এই অবস্থায় নাম-রূপ, প্রকৃতির ঐশ্বর্য, আমি-তুমি-দ্বৈতভাবের কোন স্পর্শ বা লেশ থাকে না। তবে ব্যবহার থাকে ব্যবহারিক-জগতে মানুষের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার আচরণ প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "নাম-রূপ যেখানে, সেইখানেই প্রকৃতির ঐশ্বর্য (সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, বৎস, আমিই একরূপে রাম, একরূপে সীতা হ'য়ে আছি। একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী; একরূপে ব্রহ্ম, একরূপে ব্রহ্মাণী; একরূপে রুদ্র, একরূপে রুদ্রাণী হয়ে আছি। নাম-রূপ যা আছে,—সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য সমস্তই। এমনকি ধ্যান-ধ্যাতা-পর্যন্ত। আমি ধ্যান কচ্চি যতক্ষণ বোধ—ততক্ষণ তাঁরই (চিচ্ছক্তির, বা প্রকৃতির, বা মায়ার) এলাকায় আছি। (মাষ্টারের প্রতি) এইগুলো ধারণা করো। বেদ, পুরাণ শুনতে হয়, তিনি যা বলেছেন করতে হয়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৯)।

ঐশ্বর্য নাম-রূপের বিলাস। নাম-রূপ প্রকৃতি, অবিদ্যা বা মায়ার এলাকার সামগ্রী। মহাপ্রাণরূপ চিন্ময়-ব্রহ্মসত্তাকে যাঁরা জানতে চান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে চান, তাঁদের উপনিষদের ঐ 'আত্মানং বিদ্ধি'-মন্ত্র বারবার স্মরণ করতে বলি। ডেলফির মন্দির-দ্বারের উপর লেখা ছিল—'Know thyself,—নিজেকে জানো"। Know thyself ঐ উপনিষদের 'আত্মানং বিদ্ধি'—'আপনার আত্মস্বরূপের মহিমাকেই জানো'-মন্ত্রের প্রতিধ্বনি বা প্রতিশব্দ। তাই জ্ঞানকামী সাধককে 'আমি-আমার' এই দ্বৈতরাজ্যের বাইরে অর্থাৎ ঊর্ধ্বে যেতে হয়। অর্থাৎ ধ্যাতা-ধ্যান-ধ্যেয়—এই ত্রিপুটির ধারণাকে অতিক্রম করতে হয়। ধ্যানকারী ধ্যাতা যখনই ধ্যেয়বস্তুর সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যায় (একাকার হয়), তখনই অদ্বৈত। এই মিশে যাওয়া কিন্তু দুইকে রেখে একের সঙ্গে একের মিশে যাওয়া নয়। এটা নুনের পুতুলের সমুদ্রের জল-মাপার মতো। নুনের পুতুল জলে নাম্‌লো—আর গলে জলের সঙ্গে এক হ'য়ে গেল, অর্থাৎ জলের সঙ্গে নিজের পৃথক সত্তার লোপ ক'রে এক অর্থাৎ একাকার হয়ে গেল। ব্রহ্ম ও শক্তি, কিংবা চৈতন্য ও নাম-রূপ বিকাশে পৃথক-পৃথক, কিন্তু স্বরূপে এক ও অভিন্ন। তাই চিচ্ছক্তি বা চিতিশক্তি প্রকৃতি (মহাপ্রকৃতি) অখণ্ড-ব্রহ্মসত্তা থেকে সৃষ্টি-স্রষ্টার মহিমায় পৃথক, কিন্তু মহাচৈতন্যসত্তা অখণ্ড-ব্রহ্মসত্তায় এক ও অভিন্ন। এই এক, অভিন্ন, অদ্বিতীয় একাকারও অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যসত্তাকেই প্রাণে-প্রাণে বা বোধে বোধ-রূপে উপলব্ধি করতে হয় প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষকে, তবেই জীবনে মহাপ্রশান্তি—একথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। এ' সঙ্গে মনে করতে বলি গীতার (৬।২৯) সেই অভয়-মন্ত্র—

'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥'

'সমদর্শী' বলতে সর্বত্রই—সর্বদিকে ও সর্বভাবে সর্বানুস্যূত ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ এবং এই বিকাশকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা। এই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তির অবস্থা।

●

॥ শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাক-অন্ত্যলীলা জমে উঠেছে। তিনি উত্তর কলিকাতার শ্যামপুকুরে বাস করছেন। শারদীয় দুর্গোৎসবে চারিদিকে আনন্দের ছড়াছড়ি। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে গুরুতর রোগ, ক্যান্সার। সেই কারণে তাঁর শিষ্য-সেবকদের মন বিষাদের মেঘে ভারাক্রান্ত। কিন্তু সেই মেঘের বুকে মাঝে মাঝেই বিলিক দিয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণের চারিত্রিক দ্যুতি, আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য। শিষ্য-সেবকেরা মুগ্ধ হয়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেন।

আজ শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টমী। শুক্রবার, ১লা কার্তিক ১২৯২ ; ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৫।

সকাল সাড়ে সাতটা। মাষ্টারমশাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে এসেছেন দ্বিজ। দ্বিজের বয়স পনেরো ষোল। তাঁর বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ। ঠাকুর তাঁকে খুবই স্নেহ করেন।

জগন্মাতার মহাপূজার ভাবসত্য ক্ষণে ক্ষণেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহমনে আছড়ে পড়ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর কঠিন রোগের কথা ভুলে গেছেন। তিনি মাঝে মাঝেই ভাবে মাতোয়ারা হয়ে উঠছেন। মাষ্টারমশায় লক্ষ্য করে দেখেন তাঁর দেহে বিস্ফুরিত হয়েছে গভীর ভাবের পূর্ব-লক্ষণ—রোমাঞ্চ, কম্পন ইত্যাদি।

ক্রমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রশমিত হয়। তাঁর আচরণে প্রকটিত হয় ভক্তের চিরকালের আকুতি। তিনি ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে লক্ষ্য করে বলেন : **জগৎ ব্রহ্মে মজে আনন্দ করছে—আর আমি রইলুম পড়ে।**

এবার ঠাকুর তাঁর নিজের মাথায় ও পেটে হাত বুলাতে থাকেন। ভাবের রেশ সম্পূর্ণভাবে কেটে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : **বাব্বা! ভয়, পাছে বায়ু (অসুখ) ঘা দিয়ে যায়।**

ঠাকুরের ঘর সাজাবার জন্য কয়েকটি দেব-দেবীর পট আনা হয়েছিল। খুবই সম্ভবতঃ পটগুলি শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর[১] আঁকা এবং এনেছিলেন ভক্ত কালীপদ ঘোষ। ঠাকুর আনন্দের সঙ্গে পটগুলি দেখেন। তিনি তিনখানি পট পছন্দ করেন। সেই তিনখানি পট হচ্ছে 'গৌর-নিতাই', 'শিবগৌরী' ও 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ'।[২]

* * *

১৬ই অক্টোবর ১৮৮৫, বিজয়াদশমীর দিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসেছিলেন। শ্যামপুকুর-বাড়ীতে ডাঃ সরকারের উপস্থিতি সম্বন্ধে কথামৃতকারের

১। ২৭শে অক্টোবর ১৮৮৫ তারিখে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী নিজে ঠাকুরের সঙ্গে শ্যামপুকুর বাড়ীতে সাক্ষাৎ করে তাঁর আঁকা কয়েকখানি পট ঠাকুরকে উপহার দিয়েছিলেন। 'বস্ত্রহরণ' চিত্রটি দেখে ঠাকুর তাঁর শিল্পনৈপুণ্যের প্রশংসা করেছিলেন। (কথামৃত ৪।২৯।১)

২। এই প্রবন্ধের মূল আকর পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৩০১

এই প্রথম প্রতিবেদন। এই বিবরণীতে জানতে পারি যে, ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গ-মধুতে মজে গেছেন। ডাক্তারের ছেলে অমৃতও এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃতের সম্বন্ধে ডাক্তারকে বলেন: তোমার ছেলেটি বেশ। তা হবে না? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে মন সেই ত মানুষ। মানুষ—আর মানহুঁশ। যার হুঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মানহুঁশ। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি?

ডাক্তারের ঈশ্বর-ভাবনাকে গভীরতর করবার জন্য ঠাকুর তাঁকে পূর্ণ জ্ঞানের কথা বলেন। পূর্ণজ্ঞানে বিচার বন্ধ হয়ে যায়। বিচারশীল ডাক্তার প্রশ্ন করেন: পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসগিরি কচ্ছ কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা কচ্ছে কেন? চুপ করে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বলেন: জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল। ঠাকুর মাহুত-নারায়ণের কাহিনী বলে মন্তব্য করেন: তিনিই শুদ্ধ-মন শুদ্ধ-বুদ্ধি হয়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত-নারায়ণ। ডাক্তার তখন জিজ্ঞাসা করেন: তবে কেন বল, এটা (গলার রোগটা) সারিয়ে দাও? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন: যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে কর মহাসমুদ্র—অধঃ ঊর্ধ্ব পরিপূর্ণ। তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাঙলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই আমি-ঘট রেখে দিয়েছেন।

আলোকমাত্তে ডাক্তার সরকার চলে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার সম্বন্ধে বলেন: ডাক্তারকে আর বেশী কিছু বলতে হবে না। গাছটা কাটা শেষ হয়ে এলে, যে ব্যক্তি কাটে, সে একটু সরে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে যায়।[৩]

●

৩। কথামৃত ৩য় ভাগ, ২০ খণ্ড।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশের উন্নতি-কামনায় মগ্ন থাকিতেন, এবং তাঁহাদিগের সকল কর্ম ও আচরণের ব্যবহারেই তাহা প্রকাশ পাইত। তাঁহারা যে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদ তাহা মনে-প্রাণে অনুভব করিয়াই তাঁহাদিগের সকল কার্য সম্পাদন করিতেন।

স্বামী অভেদানন্দের জীবনে নির্ভীকতার ও শক্তির পরিচয় আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই। বিদেশে লণ্ডনে ও আমেরিকায় থাকিতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বহু ঘটনার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের অধিবাসীরাও মাঝে মাঝে বিস্মিত হইয়া স্বামী অভেদানন্দকে বলিয়াছেন : 'আপনি দেখছি পুরোদস্তুর 'ইয়াঙ্কি'[১]।

প্রথমেই বিদেশে—পাশ্চাত্যদেশে পদার্পণ করিয়া স্বামী অভেদানন্দ একাই ঠিকানা বাহির করিয়া ফিলিপ্‌সের ১৯, ওয়েস্ট স্ট্রীটের ৩১, বাড়ীতে উপস্থিত হন। মিস ফিলিপ্‌স স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতির ও সাহসের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন 'ইয়াঙ্কি'।

মিস মেরী ফিলিপ্‌স ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ছাত্রী। মিস্ ফিলিপ্‌স অবিবাহিতা ও বর্ষীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন সদ্গ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ যখন নিউ ইয়র্কে উপস্থিত হন, তখন মিস্ ফিলিপ্‌স বর্ষীয়সী মহিলা। মিস্ মেরী ফিলিপ্‌সের নিউ ইয়র্কে সেবার মনভাব লইয়া একটি ছোট হোটেল স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভদ্রলোকেদের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ অনুরোধে মিস্ ফিলিপ্‌স নিউ ইয়র্ক-বেদান্ত-সমিতির সম্পাদিকা হইয়াছিলেন এবং ভান্‌হাগান্ মিস্ ওয়াল্‌ডো (বর্তমাতা) এবং গুড্‌ইয়ার-দম্পতীকে সভ্য করিয়া বেদান্ত-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। ভান্‌হাগান্ জাতিতে ডাচ্ (Duch) ছিলেন। তিনি হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী ছিলেন। ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের একান্ত সংস্পর্শে আসেন ও স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগ ও বেদান্তের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ অনুগত হইয়া তিনি নিজেকে তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল প্রায় পঁচিশ। সেইসময়ে স্বামী অভেদানন্দের প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়স। সেজন্য ভান্‌হাগান্ স্বামী অভেদানন্দের নিত্যসঙ্গী হইয়াছিলেন।

১। উত্তর-আমেরিকার আদিম-অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানগণ 'ইংলিশম্যান'-শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিত না, তৎপরিবর্তে তাহাদিগকে 'ইয়াঙ্কি' বলিত। কালক্রমে এই অপভ্রংশ শব্দই বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জাতীয়তাবাচক কথা-শব্দে পরিণত হইয়াছে।

নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর ছিল। ম্যানহাট্টান-দ্বীপে তাহা অবস্থিত ছিল। তাহার চারিদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, হাডসন নদী প্রভৃতি অবস্থিত থাকায় তাহার দৃশ্য অতি-মনোরম ছিল। তাহার পার্শ্ব দিয়া প্রশস্ত রাজপথ ছিল, সেজন্য তাহাকে রিভারসাইড্-ড্রাইভ বলা হইত। বৈকালে ঐখানকার বহু নরনারী বায়ু-সেবনের জন্য প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতেন। নিউ ইয়র্ক-সহরটি আকাশচুম্বী অট্টালিকা-দ্বারা সজ্জিত ছিল। তখন উলওয়ার্থ প্রাসাদ ছিল আমেরিকার সর্বউচ্চ [৫৬ তলা বাড়ী। ঐ নগরের পরিকল্পনা সকল স্থান-অপেক্ষা ভিন্ন ধরণের ছিল—এমন কি লণ্ডননগরী অপেক্ষাও।

(ক্রমশঃ)

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(২৫)

ঠাকুরের কণ্ঠে যাঁরা গান শুনেছেন—তাঁরাই জানেন কেবল অধ্যাত্ম বিজ্ঞানেই নয়, সঙ্গীত বিজ্ঞানেও তাঁর তুলনাহীন পারদর্শিতার কথা। সে-সঙ্গীতের দিব্য আকর্ষণের কথা বিদিত ছিল তাঁর পার্ষদ-ভক্তদের কাছে। সঙ্গীত যে উপাসনার একটি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি এবং সঙ্গীতের চেয়ে আর বড় বিদ্যা কিছু নেই (ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা)—তা পরমহংসদেবের গান যাঁরা শুনেছেন—তাঁরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। দিব্য ভাবতন্ময়তায় তিনি যখন নৃত্যের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করে দিতেন তখন মনে হত নৃত্য-শিল্পেও তিনি অতুলন। তৎকালীন বড় বড় নৃত্যবিদ্যাবিশারদদের সাক্ষ্য থেকেও এ-সিদ্ধান্তের অভ্রান্ত প্রমাণ মেলে। নটগুরু গিরীশচন্দ্র একদা বালগোপালের ভাবে তন্ময় ঠাকুরের ছোট শিশুর মত হামাগুড়ি দিতে দেখে বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে যান। এমন কি বহিরঙ্গ-দৃষ্টিতে একেবারে হুবহু শিশুর মত হয়ে যেতেন। তাল-মান-ছন্দে—তাঁর নৃত্য ও মুদ্রাগুলি নিখুঁত ছিল তাই নয়, গোপালের মত—হামাগুড়ি দেয়াও অভিনয়-শিল্পের চূলচেরা মানদণ্ডে সমুত্তীর্ণ মনে হয়েছিল আচার্য গিরীশঘোষের। এ সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন সঙ্ঘের স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ তাঁর সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থ—"আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ"-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। উৎসাহী পাঠক অবশ্যই গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে পারেন। আর শিল্পী পরমহংস সম্পর্কে আর এক ভুবনবিখ্যাত আচার্যের ভাষায়ই শুনুন: "ঠাকুর নিজেই একজন শিল্পী ছিলেন। ছবি ও মূর্তি তৈয়ারী করতেন আশ্চর্য নৈপুণ্যে। শুধু idealist নয়, রসিক, শিল্পী ও কারিগরও ছিলেন। তিনি আঙ্গিকের (technique) বিষয়ও বেশ জানতেন। আর ছবি বা মূর্তি দেখে ভাব গড়ন ভুল হলে ঠিক করে দিতে পারতেন। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু একবার ঠাকুরের হাতে গড়া শিবমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কালীমন্দিরে

পরে মাকে সাজাবার ভার নিয়েছিলেন ঠাকুর। দক্ষিণেশ্বরের পাথরের গোবিন্দজীর পা ভেঙে গেলে তাহা তিনি অতি নিপুণতার সহিত জুড়ে দিয়েছিলেন।" "দক্ষিণেশ্বরে যে-ঘরে তিনি থাকতেন তার বার-দিকের উত্তর দেয়ালে দরজার দুপাশে কাঠকয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল (৫´×৫´)। একটি জাহাজ, আর একদিকে একটি আতা গাছ, আর তাতে টিয়াপাখী সব বসে।" "দুর্গা প্রতিমা গড়ার সময় পোটুয়াদের সব সময় guide করতেন। তিনি প্রতিমার উপর চালচিত্র আঁকার ভারও কখনো কখনো নিতেন। প্রতিমার চক্ষুদানের সময় তাঁর ডাক পড়ত, চোখের তারা ঠিক জায়গায় দেওয়া বড় কঠিন বলে। চোখের ঠিক দেবভাব না হলে সংশোধন করে দিতেন। তিনি একজন সহজ শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার ছিলেন। ছবি দেখতেও বড় ভালোবাসতেন। কাহারো ভালো ছবির সংগ্রহ থাকলে দেখবার জন্য ব্যগ্র হতেন।" "তাঁহার প্রথম সমাধি হয়েছিল বর্ষার কাজলকালো মেঘের কোলে সাদা বকের পাঁতি দেখে। তিনি ভালো অভিনেতাও ছিলেন। অপরের ভাবভঙ্গী হুবহু নকল করতে পারতেন। একজন শিল্পীর শিল্প বিষয়ে যা জানা ও থাকা দরকার—তিনি সবই জানবেন। আমার মনে হয়, স্বামীজী তাঁহার নিকটে প্রথম শিল্পের গূঢ় রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, যদিও তাঁহার প্রতিভার অন্ত ছিল না।" "তিনি রূপপতি ছিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহার হৃদয়ের সব ভাবই রূপে পরিণত হত।"—বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর "শিল্প জিজ্ঞাসায় শিল্পী-দীপঙ্কর নন্দলাল" গ্রন্থ থেকে এসব কথা উদ্ধৃত।

বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র জীবনই মহত্তম শিল্পানুভূতিতে স্পন্দিত; শিল্পচেতনার পূর্ণতায় অখণ্ড প্রদীপ্ত হয়েছিল তাঁর সমগ্র জীবন। তাই তো স্বামীজীকে ধর্মের সঙ্গে ভারতশিল্পের অচ্ছেদ্য যোগ বুঝতে বা প্রমাণ করতে ইতিহাসের দ্বারস্থ হতে হয়নি। নিজের গুরুর মধ্যে যথার্থ ভারতশিল্পদর্শনের সাক্ষাৎ মিলেছে। শুধু বৌদ্ধ মঠ ও সঙ্ঘারামের শিল্পনিদর্শন নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনেই তো নতুন করে দেখা গেল আবার সেই গৌরবোজ্জ্বল ভারত-শিল্পের মহান পুনরুত্থান। এই শিল্পীশ্রেষ্ঠ গুরুকে সম্মুখে দেখেই তাই স্বামীজী বলতে পেরে-ছিলেন: "আমার মনে হয় ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিদ্যা ও ভাবের ভিতরই প্রাণ সঞ্চার করতে।" বস্তুতঃ নবজাগরণের পূর্ণ পরিণামে জাতির জীবনে সর্বাত্মক বিকাশ সংঘটিত হয়ে থাকে। দেশে দেশে বার বার তাই ঘটেছে। "মৃত্যোর্মাং অমৃতং গময়"—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে নিয়ে চলো। মৃতকল্প সমগ্র জাতিকে প্রাণের বিজয়ী সিংহতোরণে উপনীত করার জন্য ভারত-ইতিহাসে ঠাকুর-স্বামীজী-মায়ের পুণ্য আবির্ভাব। এই আবির্ভাবেরই ফলশ্রুতি জাতীয় জীবনের সর্বাত্মক পুনরুত্থান। ঠাকুরের জন্ম থেকেই, স্বামীজীর ভাষায়, সত্যযুগের শুরু। স্বামীজী তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তাই বললেন, "যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের নয়। এখন বুঝবে যে জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।"……"তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ী-ঘর-দোর সব প্রাণ স্পন্দনে ভগমগ

করবে।"—বা ও র/৬/৩৭ পৃঃ। সর্বাত্মক বেঁচে থাকার,—মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার সমাচারই নবজাগরণের মর্মবাণী। ঠাকুর-স্বামীজী সর্বাত্মকভাবে এই বাঁচার শিক্ষাই দিয়ে গেছেন জাতিকে। এই পৃথিবীর মাটিতেই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্ত স্বাধিকার অর্জন করে মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার সাধনাই—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের উজ্জ্বলতম উত্তরাধিকার। মৃত্যুর নয় জীবনের কথা শোনাতেই তাঁরা এসেছিলেন। তাঁরা জীবনেরই সন্ধান দিয়ে গেছেন। কণ্ঠে তাঁদের জীবনের জয়গান।

তাই জীবনের সহজ সাত্ত্বিক বলিষ্ঠ প্রকাশকেই সমস্ত শিল্পের একক অদ্বিষ্ট এবং পরম কৃত্য বলে স্বামীজী মনে করতেন। কিন্তু তাই বলে কল্পনার স্বাধীনতার নামে তথ্য-বিচ্যুতি নয়। ভাব অবশ্যই তথ্যকে ছাপিয়ে উঠবে, কিন্তু তথ্যের সত্যকে অস্বীকার বা বিকৃত করে কখনোই নয়। বিশেষ করে পৌরাণিক ছবি বা জাতীয় আদর্শ-উদ্দীপক ছবির ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক হতে হবে শিল্পীকে। জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে "কৃষ্ণার্জুন সংবাদ" ছবিতে এই তথ্য-বিকৃতি দেখেই স্বামীজী শিল্পীকে তীব্র সমালোচনায় জর্জরিত করেন। বিরাট ভাবপ্রকাশের জন্য বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রকাশে—প্রতীকের ব্যবহারই একমাত্র পথ—একথা স্বামীজী বার বার বলে গেছেন। এই প্রতীকের মধ্য দিয়েই যথার্থ গণসংযোগ ঘটে শিল্পের সঙ্গে। বস্তুতঃ স্বামীজী শিল্প ও জীবনকে অঙ্গাঙ্গীযুক্ত করেই দেখতে চেয়েছিলেন। একটি বিন্দুতে দুই বৃত্তকে মিলিয়ে দেয়া। জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিল্পের যথার্থ সম্ভ্রোগ স্বামীজী চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞের আত্মপ্রকাশ এবং চর্চার মধ্যেই শিল্পকে সীমাবদ্ধ রাখা স্বামীজীর পছন্দ নয়। শিল্পের সঙ্গে গণসংযোগ ছাড়া শিল্পের ও শিল্পীর মুক্তি নেই। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে—এই জিনিষটি বরাবর ঘটে এসেছে। "আমাদের দেখছিস না, সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াবাসীদের জীবন আর্টে মাখা; প্রত্যেক বস্তুতে art না থাকলে এশিয়াবাসী তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটি অঙ্গ। যে মেয়ে ভালো আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর। ঠাকুর নিজে একজন কত বড় artist ছিলেন। প্রাচীন ভারতে art-এর সার্বিক ও সার্বভৌম ব্যবহারের প্রয়োজনেই রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীতেও "শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহদানকে" একটি অবশ্য কর্তব্য বলে বিঘোষিত।

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের সঙ্গে শিল্প-সঙ্গীতের কোনো বিরোধ নেই—বরং তারা পরস্পরের সম্পূরক। কারণ, "Art, Science and religion are but three ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita"—"চারুকলা বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়।"—শিস্তা নিবেদিতার এই উক্তি তাঁর গুরু বিবেকানন্দের শিল্প-দর্শনের বা বিবেক-নন্দনতত্ত্বের সার্থক ভাষ্য। কারণ আমাদের দেশে চিন্তা-কর্ম, ধ্যান-ধারণা আচার-আচরণ—এবং প্রাণধর্মের বাইরে যা কিছু কৃত্য সবই "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়।" "যাও সেই বুদ্ধকে অনুসরণ করো—বুদ্ধত্বলাভের আগে যিনি পাঁচশো বার অন্যের জন্যে জন্মগ্রহণ

করেছিলেন এবং প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন। এই আমাদের জীবনাদর্শ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ আদর্শের মানদণ্ডে। আমাদের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান সব কিছুরই পরম সাধ্য ঐ মহৎ জীবনাদর্শ।" "Religions are only languages and must speak to a man in his own language". "হ্যাঁ ভাই, আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই শুধু সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। একমাত্র তাঁরই একথা বলার সাহস ছিল এবং শক্তিও ছিল যে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলতে হবে।" শিল্প এবং সঙ্গীতও মানুষের সঙ্গে তার নিজস্ব ভাষায় কথা বলার আশ্চর্য দুটি আঙ্গিক।

বিশেষ কোনো 'ইজম্' বা মতবাদের দ্বারা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নয়, ব্যক্তি-মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিবেক ও শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করাই ভারতের সাধনা। এই কারণেই ভারতবর্ষ শুধু একটি বিশিষ্ট মানবগোষ্ঠীর স্বদেশ বা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ কোনো ভূখণ্ড নয়, পরন্তু নিখিল বিশ্বের অধ্যাত্ম-সংস্কৃতির তীর্থভূমি—যে সমগ্র মানবজাতির কাছে তার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির মহা সনদ বার বার তুলে দিয়েছে। তাই আমাদের কাছে দেশপ্রেম—ভগবৎ-প্রেমেরই অন্য রূপ—রূপান্তর মাত্র। তাই আমাদের কাছে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা একটিমাত্র কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে গেছে এবং সে বিন্দুটির নাম মানবকল্যাণ। ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক অনাসক্তির মহত্তম আদর্শ এবং মানবচরিত্রের মর্মস্থলে প্রবেশের এক সূক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীই আমাদের পরম দেবতা কৃষ্ণচরিত্রের মৌল শক্তি। সেই সর্বকল্যাণদীপ্ত মহাশক্তিরই অন্য নাম কালী বা দুর্গা এবং সেই একই মহাশক্তির কাছে আমরা নতজানু।

●

॥ বৌদ্ধ-সম্মেলন ও বৌদ্ধচিন্তা—স্বামী অভেদানন্দ ॥

অনুবাদ—শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(দুই)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অশোকের রাজত্বকালে সপ্তদশ বৎসরে, খ্রীস্টপূর্ব ২৪২ অব্দে। এ সম্মেলন হয় তদানীন্তন মগধের রাজধানী, পাটলিপুত্রে। এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল পিটক তিনটিকে যথাযথ বিন্যাস করা। মোগ্গলির পুত্র তিস্সের সভাপতিত্বে এ সম্মেলন চলেছিল ন' মাস কাল। এ সম্মেলনে এক হাজার থেরা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপিটকের নিয়ম-নীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ অর্থাৎ বিনয়-পিটক (পাঁচ খণ্ড), সুত্ত-পিটক (পাঁচ সংগ্রহ), এবং অভিধম্ম-পিটক (সাত খণ্ড) তখন সমাপ্ত হয়েছে। সুত্ত-পিটক (উপদেশ সম্পর্কিত) পাঁচটি সংগ্রহ সম্বলিত। এ সংগ্রহগুলিকে বলা হয় নিকয় —দিঘ-নিকয়, মজ্ঝিম-নিকয়, সংযুত্ত-নিকয়, অঙ্গুত্তর-নিকয় এবং খুদ্দক-নিকয়। পরবর্তীগুলিতে রয়েছে খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্ত-নিপাত, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদমগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক।

সঙ্ঘে যোগদানকারী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের আচরণবিধি ও নিয়মাবলী ছিল বিনিয়-পিটকে। এর তিনটি প্রধান খণ্ড হচ্ছে: (১) সূত্রবিভঙ্গ,—এখানি আবার পরস্পর ও পাচিত্তিয়—দু' ভাগে বিভক্ত; (২) খণ্ডক দু' ভাগে বিভক্ত হয়েছে—মহাভাগ্‌গ ও কুল্লভাগ্‌গ; (৩) পরিবার। অভিধম্ম-পিটকে আছে সাঙ্গনা, ধম্মসঙ্গনি, ধাতুকথা, পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি, বিভঙ্গ, যমক, কথাবত্থু। এর প্রায় দেড়শ' বৎসর পরে, পিটক তিনটিকে যথাবিধি সংশিপ্তাকারে পালিভাষায় লেখা হয়েছিল। বুদ্ধের সময়ে পালিভাষা ছিল মগধাঞ্চলের জনগণের কথ্য-ভাষা।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চতুর্থ বৌদ্ধ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে। তিনি প্রায় ১২০ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে, নৃপতি কর্তৃক পাঁচশ' সন্ন্যাসী এই সম্মেলনে আহূত হয়েছিলেন। প্রবীণ সন্ন্যাসী পার্শ্বিকের পরামর্শেই কাশ্মীরের কুণ্ডলবন-বিহারে বসুমিত্রের সভাপতিত্বে এ সম্মেলন হয়েছিল বুদ্ধের পরিনির্বাণের দু'শতাব্দী পরে, ১২০ থেকে ১৫০ খ্রীস্টাব্দ মধ্যে। এ সম্মেলনে বুদ্ধের মুখের কথাগুলির চূড়ান্ত সঙ্কলন এবং নকল ও প্রক্ষিপ্ত উপদেশ, শাস্ত্রাংশ প্রভৃতি বর্জন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনেই তিনটি পিটক-গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা ও টীকাটিপ্পনীগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছিল।

এই সম্মেলনে উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা যথাযথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কণিষ্ক দেখতে পেয়েছিলেন, বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা আঠেরটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই আঠেরটি শাখা আবার চারটি প্রধান বিভাগের উপবিভাগ। ঐ চারটি প্রধান বিভাগের নাম ছিল: (ক) আর্য-সর্বাস্তিবাদ; (খ) আর্য-সম্মতীয়; (গ) মহাসাঙ্ঘিক; (ঘ) আর্য-স্থবির। আঠেরটি শাখা হচ্ছে:

(ক) আর্য-সর্বাস্তিবাদ—(১) মূল-সর্বাস্তিবাদ, (২) কাশ্যপীয়, (৩) মহীশাসক, (৪) ধর্মগুপ্ত, (৫) বহুশ্রুতীয়, (৬) তাম্রশাতীয় (লাল পোষাক), (৭) বিভাজ্যবাদী।

(খ) আর্যসম্মতীয়—(৮) কন্‌ক-কুল্লক, (৯) অবন্তিক, (১০) বাৎসিপুত্রীয়।

(গ) মহাসাঙ্ঘিক—(১১) পূর্বশৈল, (১২) অপরশৈল, (১৩) হিমাবত, (১৪) লোকোত্তর-বাদী, (১৫) প্রজ্ঞাপ্তিবাদী।

(ঘ) আর্য-স্থবির—(১৬) মহাবিহার, (১৭) জেতাবনীয়, (১৮) অভয়গিরিবাদী।

খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ অব্দে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলনের পরে মহাসাঙ্ঘিকরা যখন নিজেদেরকে থেরাবাদীদের থেকে পৃথক করেছিলেন, মহাসাঙ্ঘিকগণ তখন মহাযানপন্থী এবং থেরাবাদীগণ হীনযানপন্থী নামে চিহ্নিত হয়েছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাদের মতবাদগুলি খ্রীস্টপূর্ব ১০০ অব্দ থেকে ৪০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।*

পিটকগুলির এ সকল বিভাগকে আরও স্পষ্ট করার জন্য আমি আধুনিক পণ্ডিতদের তৈরী এবং অনুমোদিত একটি তালিকা প্রদান করছি। আমার ধারণা, জ্ঞানান্বেষীদের কাছে

* মহাযানপন্থীদেরকে এরূপ বলার কারণ, এ মতবাদ আকাশের মতো বিস্তৃত এবং দেবতা, মানব ও মানবেতরকে সমান ভাবে এ মতবাদ অগ্রসর হবে।

(ক) বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধিমান জীব। (খ) মহাসত্ত্ব—মহান্‌জীব। (গ) সত্ত্ব—পূর্ণজ্ঞানী।

এ পুনরুক্তি কোন বিরক্তির কারণ হবে না। পালি ত্রিপিটকগুলি ছিল তিনটি প্রণালীবদ্ধ সঙ্কলন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, (১) বিনয়-পিটক হচ্ছে নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত পুস্তক, (২) সুত্ত-পিটক হচ্ছে জনপ্রিয়-ধর্মোপদেশ সংক্রান্ত পুস্তক এবং (৩) অভিধম্ম-পিটক হচ্ছে বৌদ্ধদের নীতিতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক দার্শনিক রচনা-সঙ্কলন। প্রকৃতপক্ষে, এই পিটকগুলি হচ্ছে যাজকীয় সাহিত্য ; এগুলি কিন্তু আবার বৌদ্ধদের অ-যাজকীয় সাহিত্যও বটে। সেগুলি হচ্ছে মিলিন্দ-পণ্হ, নেত্তি-প্রকরণ এবং বিনয়-পিটক ও অভিধম্ম-পিটক সম্পর্কে টীকা-টিপ্পনীসহ বুদ্ধদত্তের সারগ্রন্থ। এছাড়াও আছে জাতক বা বুদ্ধের জন্মকাহিনী, সিংহলের ঘটনাপঞ্জী—যথা, দীপবংশ, মহাবংশ, চূলবংশ এবং পরবর্তীকালে সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শে রচিত পালি-সাহিত্য। কচ্চায়ন ও মোগল্লান রচিত ব্যাকরণ এবং রূপসিদ্ধি ও সদ্দনীতি প্রভৃতি গ্রন্থও আছে। বুদ্ধঘোষ রচিত বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ বিশুদ্ধিমাগ্গ উল্লেখযোগ্য। মহাসাঙ্ঘিক শাখার লোকোত্তরবাদীদের মহাবস্তু পুস্তকটি বিনয়-পিটক সম্পর্কে লিখিত হয়েছে বলে কথিত। ললিতবিস্তর হচ্ছে বুদ্ধের একখানি অসমাপ্ত জীবনী। গ্রন্থখানি মিশ্র-সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই ললিতবিস্তরকে উদার মনোভাবাপন্ন মহাযানদের গ্রন্থ মনে করা হয়ে থাকে ; গ্রন্থখানি বৈপুল্য-সূত্রের একটি অংশ। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত ও সৌন্দরানন্দ এবং আর্যশূরের জাতকমালাও এসম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শশধর তর্কচূড়ামণি ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(সাত)

দ্বিতীয় মিলনের অবশিষ্ট সংবাদ :

[শশধরকে সাধন-কৌশল কথন]

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নম্র-নিরভিমান স্বভাব দর্শনে পরমহংসদেব বিশেষ প্রীত হন। তিনি অনুভব করেন যে, এই নিষ্ঠাবান সাধক-পণ্ডিত কিছুকাল নিভৃতে একাগ্রচিত্তে সাধন-ভজন ক'রলে এঁর আরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। তাই তিনি প্রসঙ্গক্রমে এঁকে সস্নেহে সাধন-কৌশল শিক্ষা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শশধরকে বলেন,—"বাণ-শিক্ষা ক'রতে গেলে আগে কলাগাছ ভাগ ক'রতে হয়, তারপর শরগাছ, তারপর সন্তে, তারপর উড়ে যাচ্ছে যে পাখী।···আগে সাকারে মনস্থির ক'রতে হয়।"

"যারা নেতি নেতি জ্ঞানবিচার ক'রছে, তারা অবতার মানে না। হাজরা [প্রতাপ] বেশ বলে,—ভক্তের জন্যই অবতার, জ্ঞানীর জন্য অবতার নয় ; তারা তো সোঽহং হ'য়ে ব'সে আছে।"

● ● ● ●

●

পরমহংসদেব ও উপস্থিত সকলে কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তারপর শশধর বিনীতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়? হাত দেখলে মাংসপেশী (muscles), স্নায়ু (nerves) মনে পড়ে। লোক দেখলে কি রকম nervous systems [স্নায়ুতন্ত্র] মনে পড়ে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বলেন,—"নারায়ণ শাস্ত্রী তাই ব'লতো, শাস্ত্র পড়ার দোষ,—তর্ক-বিচার এইসব এনে ফেলে।"

[শশধরকে ইষ্টলাভের উপায় কথন]

শশধর পণ্ডিত আবার জিজ্ঞাসা করেন,—"আজ্ঞে উপায় কি কিছুই নাই?—একটু মার্দব—[মৃদুভাবের]"

শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বলেন,—"আছে—বিবেক। একটা গানে আছে,—'বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তায় সুধাই।' বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অনুরাগ—এই উপায়। বিবেক না হ'লে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যায়ী[১] অনেক ব্যাখ্যার পর ব'ললে, 'ঈশ্বর নীরস।' একজন ব'লেছিল, 'আমাদের মামাদের এক গোরাল ঘোড়া আছে।' গোরালে কি ঘোড়া থাকে?"

শশধর তর্কচূড়ামণিকে ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে সহাস্যে বলেন,—"তুমি ছানাবড়া হ'য়ে আছ। এখন দু' পাঁচ দিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল। দু' পাঁচ দিন।"

শশধর পণ্ডিত ঈষৎ হাস্যে নিবেদন করেন,—"ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হ'য়ে গিয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে),—"না, না; আরশুলার রং হ'য়েছে।"

প্রতাপ হাজরা মহাশয় সংযোজন করেন,—"বেশ ভাজা হ'য়েছে, এখন রস যাবে বেশ।

[শাস্ত্র বেশী পড়ার দোষ সম্বন্ধে কথন]

শ্রীরামকৃষ্ণ শশধরকে আরও বলেন,—"কি জান,—শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক-বিচার এসে পড়ে। শুকটা [তোতাপুরী] আমায় শেখাতো—উপদেশ দিতো—'গীতা' দশবার ব'ললে যা হয়, তাই গীতার সার;—অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' দশবার ব'লতে ব'লতে 'ত্যাগী' হ'য়ে যায়।"[২]

"উপায়—বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অনুরাগ। কিরূপ অনুরাগ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল,—যেমন ব্যাকুল হ'য়ে বৎসের পিছে গাভী যায়।"

১। ব্রহ্মভক্ত সামাধ্যায়ী ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও প্রবক্তা।

২। "বস্তুতঃ 'ত্যাগী' হয়, কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী ব'ললেন, 'ত্যাগী' মানেও যা, 'ত্যাগী' মানেও তা। 'তগ্' ধাতু একটা আছে, তাই থেকে 'ত্যাগী' হয়।" —কথামৃত ৩ ৪।১।৩৪

ত্যাগী = √তগ্+ঘঞ্+ঈ। ত্যাগী = √ত্যজ্+ঘঞ্+ঈ।

ঠাকুরের এই উক্তি তর্কচূড়ামণি মহাশয় শাস্ত্রবাক্য সহায়ে সমর্থন করেন,—"বেদে ঠিক অমনি আছে, গাভী যেমন বৎসের জন্য ডাকে, তোমাকে আমরা তেমনি ডাকছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো। আর বিবেক বৈরাগ্য এলে যদি কেউ সর্বত্যাগ ক'রতে পারে, তাহ'লে সাক্ষাৎকার হবে। সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়—তা জ্ঞানপথেই থাকো, আর ভক্তিপথেই থাকো। দুর্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হ'য়েছিল।"

"সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান—অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান—দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটি আলো হয়, নিজের দেহ ঘরকন্না ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বার সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞানসূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুইই ছিল।"

[অ-ভাবমুখ চৈতন্য ও ভাবমুখ চৈতন্য সম্বন্ধে কথন]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শশধর পণ্ডিতকে প্রসঙ্গতঃ আরও বলেন,—"অ-ভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাবভক্তি একটি পথ আছে; আর অ-ভাবের ['নেতি' 'নেতি'] একটি পথ আছে। তুমি অ-ভাবের কথা ব'লছ। কিন্তু 'সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরুশিষ্যে দেখা নাই।' জনকের কাছে শুকদেব ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশের [উপদেশ লাভের] জন্য গেলেন। জনক ব'ললেন,—'আগে দক্ষিণা দিতে হবে। তোমার ব্রহ্মজ্ঞান [লাভ] হ'লে, আর দক্ষিণা দেবে না—কেননা, তখন গুরুশিষ্যে ভেদ থাকে না।"

"ভাবমুখ অ-ভাবমুখ সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্তু একটি কথা আছে—**কলিতে নারদীয় ভক্তি** - এই বিধান। এই পথে প্রথমে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হ'য়েছে, তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হ'য়েছে।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয় শাস্ত্রার্থ প্রচার বিষয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন,—'আজ্ঞে, ব'লতে গেলে তো অনেক কথা দিয়ে বুঝাতে হয়!"

এ বিষয়ে ঠাকুর এঁকে উপদেশ দেন,—"তুমি লেজামুড়ো বাদ দিয়ে ব'লবে হে।"

[বিবিধ প্রসঙ্গ]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট রয়েছেন। শশধর প্রভৃতি মেজেতে মাদুরে ব'সে আছেন। তত্ত্বকথা ব'লতে ব'লতে ঠাকুর কিয়ৎকাল নীরব থাকেন।

সেই অবসরে তর্কচূড়ামণি মহাশয় মণিলাল মল্লিকের সঙ্গে আলাপন শুরু করেন। মণি মল্লিক মহাশয় ব্রাহ্মসমাজভুক্ত—আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী। শশধর পণ্ডিত ব্রাহ্মসমাজের দোষ-ত্রুটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করেন। উভয়ের বিতর্ক শুনে পরমহংসদেব মৃদু হাস্য ক'রতে থাকেন। পণ্ডিত মহাশয়ের তেজস্বিতা ও প্রতিবাদের যৌক্তিকতা উপলব্ধি ক'রে তিনি মন্তব্য করেন,—"এ সত্ত্বের তমঃ—বীরের ভাব। এসব চাই। অন্যায় অসত্য দেখ্‌লে চুপ ক'রে থাকতে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সহাস্তে শশধর পণ্ডিতকে বলেন,—"মণি মল্লিকের ব্রাহ্মসমাজের মত অনেক দিনের। ওর ভিতর তোমার মত ঢোকাতে পারবে না। মণি মল্লিককে কিছু বোলো না। কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি [ঈশ্বর] নানা ধর্ম নানা মত ক'রেছেন, অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি [ঈশ্বর] সাকার পূজার ব্যবস্থা ক'রেছেন।"

• • • •

সকলে নীরব রয়েছেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। সন্ধ্যাসমাগমের আর বেশী দেরী নেই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শশধর পণ্ডিতকে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়-সমূহ ও উদ্যানবাটী দর্শন ক'রতে বলেন,—"যাও একবার ঠাকুর দর্শন ক'রে এসো,—আবার বাগানে একটু বেড়াও।"

তর্কচূড়ামণি মহাশয় ঠাকুরবাড়ি দর্শন ক'রতে যান। এঁর সঙ্গীদ্বয় ও উপস্থিত ভক্তগণের কেউ কেউ এঁকে অনুসরণ করেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও গাত্রোত্থান করেন ও মাষ্টার মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে চাঁদনীর ঘাটে উপস্থিত হন।

পণ্ডিত মহাশয় ঘুরে ঘুরে ঠাকুরবাড়ি দেখতে দেখতে ঐ ঘাটে আসেন। সেখানে ঠাকুরের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হয়।

ঠাকুর—এঁকে সস্নেহে বলেন,—"কালীঘরে যাবে না ?—তাই এসো।"

শশধর তখন ব্যস্তভাবে বলেন,—"আজ্ঞে, চলুন—দর্শন করি গিয়ে।"

চাঁদনীর ভিতর দিয়ে সেই মন্দির অভিমুখে যেতে যেতে শ্রীরামকৃষ্ণ এঁকে বলেন,—"একটা গানে আছে—এই ব'লে তিনি মধুরকণ্ঠে গাইতে শুরু করেন,—

"মা কি আমার কালো রে।
কালরূপে দিগম্বরী হৃদিপদ্ম করে আলো রে।"

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'য়ে ঠাকুর—এঁকে বলেন,—"একটা গানে আছে,—'জানাগ্নি জ্বেলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না' !"

মন্দিরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হ'য়ে জগন্মাতাকে প্রণাম করেন। ৺ভবতারিণীর নয়নাভিরাম প্রতিমা দর্শন ক'রে পণ্ডিত মহাশয় ও এঁর সঙ্গীদ্বয় বিশেষ আহ্লাদিত হন। ভূধরবাবুর দাদা পরমহংসদেবকে বলেন,—"শুনেছি [এই কালী প্রতিমা] নবীন ভাস্করের[৩] নির্মাণ।"

উত্তরে ঠাকুর বলেন,—"তা জানি না—জানি ইনি চিন্ময়ী।"

তর্কচূড়ামণি ও সঙ্গী ভক্তদের নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ নাটমন্দির হ'য়ে বলিদানের স্থানে উপস্থিত হন। সেইস্থান দর্শন ক'রে শশধর পণ্ডিত বলেন,—"মা পাঁঠা কাটা দেখতে পান না।" (সকলের হাস্য)।

৩। নবীন ভাস্কর এই কালী প্রতিমা নির্মাণ করে। এঁর পদবি ছিল ভাস্কার্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবার নিজ কক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধ্যা হ'য়েছে। তিনি তাঁর ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় গিয়ে বসেন। তিনি এখন ভাবস্থ—অর্ধবাহ্যদশা।

• • • •

শশধর পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরবাড়ি দর্শন ক'রে কিছুক্ষণ পরে সঙ্গিগণসহ শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে ফিরে আসেন। ঐ বারান্দা থেকে ঠাকুর এঁকে বলেন,—"তুমি একটু জল খাও।"

উত্তরে শশধর তাঁকে নিবেদন করেন,—"আমি সন্ধ্যা করি নাই।" এঁর এই কথা শুনে তিনি (ঠাকুর) ভাবে মাতোয়ারা হন ও দণ্ডায়মান হ'য়ে গাইতে শুরু করেন,—

"গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী ব'লে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥"

এই গান শেষে ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে এঁকে বলেন,—"কতদিন সন্ধ্যা?—যতদিন 'ওঁ' ব'লতে মন লীন না হয়।"

শশধর—"তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা ক'রব।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"আমি তোমার স্রোতে [নিয়মনিষ্ঠায়] বাধা দিব না। সময় না হ'লে, ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপনি ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি ক'রতে নাই। ওরকম ক'রে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ। তিনি এঁকে অর্ধবাহ্যদশায় উপরিউক্ত কথাগুলি বলেন।

শশধর পণ্ডিত সন্ধ্যা ক'রতে যান ও তা সাঙ্গ ক'রে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসেন। তারপর ইনি ঐ সঙ্গীয়গণসহ ঠাকুরের ঘরে জলযোগ করেন।

• • • •

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে এসে বসেন। সুধরবাবুর দাদা তাঁকে বিনীতভাবে বলেন,—"আমাদের কি হবে,—একটু ব'লে দিন, আমাদের উপায় কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তোমরা মুমুক্ষু, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ত্রীর মত থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাতদিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।"

[শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্তৃক পণ্ডিতকে আশীর্বাদ ও উৎসাহ দান]

তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন,—"তুমি তো গীতা পড়েছ,—'যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।"

শশধর পণ্ডিত গীতা থেকে ঐ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন,—"যৎ যদ্ বিভূতি মৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জিতমেব বা…।" [গীতা—১০।৪১]

শ্রীরামকৃষ্ণ—"তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর [ঈশ্বরের] শক্তি আছে।"

শশধর—"আজ্ঞে, যে ব্রত নিয়েছি, অধ্যবসায়ের সঙ্গে ক'রবো কি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—"হাঁ হবে।"

শশধর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করেন। সঙ্গীরাও তাঁকে এভাবে শ্রদ্ধা ও প্রণিপাত জানান। এবার তর্কচূড়ামণি মহাশয় ঠাকুরের কাছে বিদায় প্রার্থনা ক'রে গাত্রোত্থান করেন। বিদায়কালে ঠাকুর এঁকে সস্নেহে বলেন,—"আবার আসবেন। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে—হুকতো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে—অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে। অপরকে গুঁতোয়।"

পণ্ডিত মহাশয় প্রস্থান ক'রলে ঠাকুর উপস্থিত ভক্তদের এঁর বিষয়ে বলেন,—"ডাইলিউট (Dilute-বিগলিত) হ'য়ে গেছে একদিনেই। দেখলে, কেমন বিনয়ী—আর সব কথা লয়।"*

(ক্রমশঃ)

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(চার)

পাশ্চাত্যদর্শনে এস্থেটিকস্ বা সৌন্দর্যের ধারণা ও অনুভূতি কীভাবে গৃহীত ও আলোচিত হয়েছে—তার ইতিহাস স্বল্প পরিসরের নয়, গ্রীকদর্শন থেকে আরম্ভ ক'রে বর্তমান ইউরোপীয়-দর্শনে বিচিত্র ও বিস্তৃতভাবে রয়েছে। ভারতীয়-দর্শনেও তাই। বিভিন্ন মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মতভেদ সৃষ্টি হলেও সকল কালের ও সকল দেশের সৌন্দর্যের মূলকথা মনের বা অন্তরের প্রীতিপূর্ণ মনোরম-অনুভূতি ও আবেদন। দার্শনিক মেলভিন্ র‍্যাডারের (Melvin Rader) অভিমত হলো : 'In tracing the philosophy of art from ancient Greece to modern times, we find three concepts of major importance—imitation, form and expression' :—অর্থাৎ অনুকৃতি, আকৃতি বা আকার ও প্রকাশ এদের মধ্যে form—আকার, আকৃতি বা গঠন *imitation* বা অনুকৃতির মতোই গ্রীসীয়-চিন্তাশীলদের অবদান। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মধ্যযুগীয় নবজাগরণের সময়েই অনুকৃতিরূপ সৌন্দর্যের ধারণা জন্মলাভ করে বলে মনে হয়। রোমান্টিক-যুগে এই শিল্পের ও সৌন্দর্যের জগতে অনুকৃতি-শব্দটির পরিবর্তে প্রতিরূপ বা প্রতিফলন (representation)-শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। মানুষের দৃষ্টি ও রুচি যখন ক্রমাগতই পরিবর্তনশীল, তখন বিবর্তিত নাম বা শব্দের ব্যবহারে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই। গ্রীকদার্শনিক প্লেটো ও তাঁর অনুবর্তীরা সত্য,

---

* ...এই বিবরণের ঘটনাপ্রবাহ ও কথোপকথনসমূহ "কথামৃত"—এর ভাগ (১ম খণ্ড) থেকে পরিবেশিত।

শিব, সুন্দর—Truth, Goodness and Beauty প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অনুকৃতি ও আকারের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইংরাজী-কাব্যের বিদগ্ধ লেখক ও সমালোচক এ. সি. ব্র্যাডলে (A. C. Bradley) তাঁর ইংরাজী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত *Poetry for Poetry's Sake*-বক্তৃতায় মন্তব্য করেছেন—যা সমীচীন : তিনি বলেছেন—

'There is no such thing as mere *form* in poetry. All *form* is *expression*.....So that what you apprehend, may be called indifferently an expressed meaning or a significant form'.

অধ্যাপক এ. সি. ব্র্যাডলের ব্যবহৃত শব্দ 'significant form' কিছুদিন পরেই শিল্পসৌন্দর্যের বিশিষ্ট লেখক ক্লাইভ বেল (Clive Bell) তাঁর শিল্পসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে ব্যবহার করতে থাকেন। আরও কিছুদিন পরে শিল্পসৌন্দর্যের অন্যতম আধুনিক বিশ্লেষক মানসীয়া সুসেন লাঙ্গার (Susanne Langer) তাঁর গ্রন্থগুলিতেও ব্যবহার করতে থাকেন 'প্রাণবান-আকৃতি' (living form) বা 'প্রতীকাকৃতি' (symbolic form) প্রভৃতি শব্দ বা নামকে গ্রহণ ক'রে। সুতরাং ভাবের, ধারণার ও বস্তুর প্রকাশক কোন শব্দের ব্যবহার শুধু দর্শনজগতেই নয়, সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ভাবের প্রকাশক ও নির্দেশক কোন শব্দের (যেমন প্রতীক) ব্যবহার নূতন-কিছু নয়। আর অনুকৃতি (imitation) আকৃতি বা আকারের (form) প্রকাশক ও অভিব্যক্তির বা expression-শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে জর্মনের হার্ডার, শ্লেগেল, কোলরিজ (Herder, Schlegel, Coleridge) প্রভৃতি দার্শনিকদের গ্রন্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। অধ্যাপক আর. এন. নেটলশিপ্ অবশ্য ঐসব ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরের অভিব্যক্তির সঙ্গে অনুকৃতির ঐক্যের কথা বলেছেন : 'the oneness of expression and feeling', কেননা অনুকৃতির কথা তখনই জানা যায়—যখন সেটা বাইরের জগতে মূর্ত হ'য়ে প্রকাশ পায়। দার্শনিক ক্রোচের অভিমতও তাই। মনে হয়, অধ্যাপক নেটলশিপ্ ক্রোচের অভিমতকেই অনুসরণ করেছেন, কেননা মানুষের মনের গহন-গভীরে বিচিত্র বাসনা ও ধারণা সঞ্চিত থাকলেও যতক্ষণ না তাদের বাইরে (বাহ্যজগতে) প্রকাশ হয়, ততক্ষণ তারা আছে—কি নাই—তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অধ্যাপক ক্যারিট (F. F. Carritt) তাঁর *An Introduction to Aesthetics* (London, 1949)-গ্রন্থে কমপক্ষে প্রাচীন ও নবীন ৪০ জন সৌন্দর্যতত্ত্ববিদের কথার উল্লেখ করেছেন যে, শিল্প ও সৌন্দর্যতত্ত্ব সার্থক-রূপ গ্রহণ করে—যদি শিল্পীর ও সৌন্দর্যদ্রষ্টার অন্তরের ভাব, অনুভূতি বা প্রাণময়ী প্রেরণার একটি ক্রিয়াশীল সংগঠনীশক্তি নিহিত থাকে। সেজন্য শিল্পসত্তার ও সৌন্দর্যদৃষ্টির সার্থকতার মধ্যে অন্তরের অভিব্যক্তি ও প্রাণময়ী প্রেরণা দুটি সত্তার বা শক্তির বিকাশ থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। এ'সম্বন্ধে দার্শনিক টলষ্টয় বলেছেন 'পারস্পরিক-সহযোগ' বা communication, অধ্যাপক সান্তায়ন বলেছেন 'বাহ্যপ্রকাশ' বা objectification, বোসাঙ্কে ও রিড (Bosanquet and Reid) বলেছেন 'বাস্তব-রূপ', ল্যাঙ্গার প্রভৃতি (Langer and Aruheim) বলেছেন 'প্রতীকিকরণ' প্রভৃতি। নানা মুনির নানা মতবাদ হলেও সকলের

অভিমতের মধ্যে আন্তর-ভাবধারার বাস্তবীকরণনীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ অন্তরের ভাবধারা যতক্ষণ-পর্যন্ত-না বাইরে মূলরূপে প্রকাশ পায়, ততক্ষণ তার সত্যতা নির্ধারিত হয় না। এজন্য অধ্যাপক মেলভিন র‍্যাডার (Melvin Rader) ঠিকই বলেছেন : 'Neither imitation nor form, taken as exclusive, could be considered the defining mark of art, whereas *expression* comes much closer to the required degree of generality',—অর্থাৎ ভাবের বাহ্যাভিব্যক্তির সার্থকতাই অধিক। সেজন্য সঙ্গীতস্রষ্টা বিটোভেন তাঁর সঙ্গীতে এবং মাইকেল-এঞ্জেলো তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে অন্তরের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তাই একথাই সত্য যে, মানুষের শিল্পচেতনার ও সৌন্দর্যসৃষ্টির পিছনে থাকে আন্তর-প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভার বিকাশ, আর সেজন্য শিল্প-সৌন্দর্যকে প্রতীক বলা যায়—যার সাহায্যে তারা প্রকাশ পায় বাইরের জগতে মানুষের কাছে। অধ্যাপক র‍্যাডার একথা ভিন্নভাবে বলেছেন : 'The artist pours his knowledge into works of art. He *knows*—he does not merely feel—but he knows by sympathetic identification and imaginative insight'। শিল্পী সুন্দরের উপাসক, সেজন্য কেবলই শিল্পকে ও সুন্দরকে অন্তর দিয়ে অনুভব করেন না, তিনি জানেন বিশ্লেষভাবে সচেতন থেকে তাঁর অনুকৃতির কথা, সেজন্য সার্থক হয় তাঁর চেতনা, সৃষ্টি ও অনুকৃতি।

দার্শনিক জর্জ সান্তায়ন তাঁর *The Sense of Beauty* (1896) বা 'সৌন্দর্যের ধারণা ও অনুকৃতি'-গ্রন্থে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার ক'রে 'সৌন্দর্য কাকে বলে' (Definition of Beauty)-আলোচনার পর্যায়ে সৌন্দর্যকে ভাবেরই একটি বিকাশ ('it is an emotion') বলেছেন—যেমন ভারতীয় রসবাদীরা সৌন্দর্যের যথার্থানুভূতিকে 'রসানুভূতি' ব'লে ব্যাখ্যা করেছেন। জর্জ সান্তায়নের মতে emotion বা মানসিক-ভাব তার সুখ ও আনন্দেরই একটি বিকাশ বা অভিব্যক্তি। অধ্যাপক সান্তায়ন বলেছেন : 'An object cannot be beautiful if it can give pleasure to nobody'। সুতরাং মনের সুখকর বা আনন্দদায়ক ভাবকেই সুন্দরের বা সৌন্দর্যের আকার বলা যেতে পারে। এজন্য অধ্যাপক জর্জ সান্তায়ন *Definition of Beauty*-র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক'রে তারপরেই বলেছেন : 'Beauty is Expression',—অর্থাৎ সুন্দরের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি না থাকলে সুন্দরকে ধরা-ছোওয়া যাবে কি ক'রে। সেজন্য তিনি বলেছেন : 'Thus beauty is constituted by the objectification of pleasure. It is pleasure objectified' ;—অর্থাৎ আনন্দের বাইরের বাস্তব-প্রকাশই সুখ বা আনন্দরূপরূপে ধরা দেয় সুন্দর বা সৌন্দর্য। অবশ্য সুন্দরের প্রকাশকে অধ্যাপক সান্তায়ন দুটিভাবে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন : 'The *first* is the object actually presented, the word, the image, the expressive thing ; the *second* is the object suggested, the further thought, emotion, or image evoked, the thing expressed',—অর্থাৎ কথা, প্রতীক, বা প্রকাশ্য বস্তুর সাহায্যেই আমরা সুন্দরকে প্রথমে বুঝি ও পরে চিন্তা, ধারণা বা ভাবনা প্রভৃতির সাহায্যে

প্রকাশ করি। মনের এই দ্বৈতকর্ম বোঝা ও প্রকাশ করা একই সঙ্গে হলে তবেই সুন্দরকে আমরা সুন্দর ব'লে আখ্যা প্রদান করি।

অবশ্য ভারতীয় চিন্তায় ও অভিধানে সুন্দরকে মঙ্গল ও সত্যের সঙ্গে আমরা সংযুক্ত করি ও বলি—'সত্যং শিবং, সুন্দরম্'। এখানে সুন্দর সত্য ও শিব বা কল্যাণের সঙ্গে একীকৃত, পরস্পরে পৃথক নয়। অধ্যাপক জর্জ সান্তায়ন 'Beauty Defined'-পর্যায়ে সুন্দর কাকে বলে —তার পরিচয়প্রসঙ্গে বলেছেন : 'We know on excellent authority that beauty is truth, that it is the expression of the ideal, the symbol of divine perfection, and the sensible manifestation of good'. গ্রীসের বিদগ্ধ দার্শনিক প্লেটো বলেছেন Good—যার অর্থ শাশ্বত শান্তি ও কল্যাণ এবং ভারতের ঋষিরা বলেছেন 'শিবং'—যা চিরকল্যাণময় আনন্দ ও শান্তি। অবশ্য এ'সম্বন্ধে আমরা ভারতীয় রসপর্যায় নিয়ে যখন আলোচনা করবো তখন বিশেষভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবো।

●

॥ দেশাত্মবোধক গান : রজনীকান্ত সেন ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

বাংলাসাহিত্যের গীতিকারবৃন্দের মধ্যে রজনীকান্ত সেন এক বিখ্যাত পুরুষ। তাঁহার গীতাবলীর উপজীব্যবিষয়ের মধ্যে স্বদেশভাবনা অন্যতম। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশসঙ্গীতের এক বিশেষ দান থাকিবার কথা। রজনীকান্ত সেন-রচিত স্বদেশগীতগুলি সুপ্ত ভারতীয় চেতনার উদ্বোধন ঘটাইয়াছে। স্বাধীন ভারতেও তাহাদের মূল্য কমিয়া যায় নাই। মাতার প্রতি সন্তানের যে ভক্তি চিরজাগ্রত থাকিবার কথা, মাতৃভূমির প্রতিও সেই ভক্তি চিরজাগ্রত রাখিতে হইবে। বিষয়বস্তুর এই মূল্যায়ন ব্যতীতও গীতসমূহের সুরমাধুর্য সহৃদয় শ্রোতৃজনের নিঃসন্দেহে হৃৎকর্ণরসায়ন।

দেশবন্দনা-সঙ্গীতে বঙ্গভূমির সৌন্দর্য কবিভাষায় উৎসারিত হইয়াছে। নিম্নে শস্য-শ্যামলাধরণী, ঊর্ধ্বে নীলাকাশে অগণিত তারা-মণির শোভা। চন্দ্রকিরণস্পর্শে সমুজ্জ্বলা। গঙ্গা কলুষহারিণী হইয়া নর্তন-পুলক-রঙ্গে সাগরসঙ্গামিনী হইয়াছে :

তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।
ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত মণি-রঞ্জিত নভঃ নীলাঞ্চলা,
সৌম্য মধুর দিব্যাজনা শান্তকুশল-ধরণী।
দূরে হের চন্দ্রকিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা
নৃত্যপুলকগীতিমুখর কলুষ-হর-তরঙ্গা।

কেবল রূপপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়া কবি ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বপুরুষ আর্যগণের গুণ-গরিমা-কীর্তিরও উল্লেখ করিলেন :

ফিরে দিশি দিশি মলয়-মন্দ-কুসুমগন্ধ বহিয়া,
আর্য-গরিমা-কীর্তি-কাহিনী-মুগ্ধ জগতে কহিয়া।

অন্য একটি স্বদেশসঙ্গীতেও সেই একই ভঙ্গী। শ্যামল ও পুষ্প-ফল-সমৃদ্ধ রূপ, হিমগিরি ও সিন্ধু-গোদাবরী প্রভৃতি নদ-নদীর শোভা, রাম-যুধিষ্ঠির-অর্জুন-ভীষ্মপ্রমুখের গুণ-মহিমা, সামগানরত আর্যগণের শান্তরসাস্পদ তপোবনভূমির সমুল্লেখ সেখানে। সঙ্গীতটির আরম্ভভাগ :

শ্যামল-শস্যতলা
চিরশান্তিবিরাজিত পুণ্যময়ী।

সমাপ্তি-অংশ :

সামগানরত-আর্য-তপোধন
শান্তিসুধাস্নিগ্ধ কোটি তপোবন
রোগশোকদুঃখপাপ বিমোচন।

রজনীকান্ত-রচিত স্বদেশমূলক আর এক দীর্ঘান্বিত সঙ্গীতে সেই এক প্রকল্প বা ধারা। গানটির ধ্রুবপদ 'সে আমাদের সোনার ভারত আমাদের হিন্দুস্থান'। এই ধ্রুবপদ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত কবিতার 'সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরি বাংলা রে'—অংশকে স্মরণ করাইয়া দিবে। রজনীকান্ত ভারতের উত্তর-সীমান্তে গিরিরাজের ও তিনদিকে সমুদ্র-আবেষ্টনীর উল্লেখ করিয়াছেন, উল্লেখ করিয়াছেন শ্যামল-মাঠে থোকা-থোকা সোনাধানের, যমুনা-গঙ্গা-সিন্ধু-গোদাবরী প্রভৃতি নদীর, সুগন্ধি ফুল ও মিষ্ট ফলের, কোয়েল-পিক-পাপিয়া-প্রমুখ পাখীর। পূর্বতনপুরুষের গৌরব স্মরণ করিয়া রজনীকান্ত হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, শিবাজী প্রভৃতি বীরকে তাঁহার সঙ্গীতে স্থান করিয়া দিয়াছেন। চিতোর-পাণিপথ-হলদিঘাট প্রভৃতি স্থান ও কবিগণের বেদপাঠ এবং স্বামিব্রতা সতী-নারীর গৌরবও তাঁহার রচনায় কীর্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতটির প্রথম পঙ্‌ক্তি-চতুষ্টয় এইরূপ :

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি ?
কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র ঘেরি ?

গানটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত 'বাংলাদেশ কবিতা'র 'কোন্ দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয়রে দুর্বাকোমল'কে স্মরণ করাইয়া দিবে। রজনীকান্তরচিত সঙ্গীতান্তরে পরাধীন জাতির ঘুম ভাঙাইবার চেষ্টা। সেই চেষ্টা করিতে গিয়া গগনচুম্বিশৌনি হিমালয়, নানা নদ-নদী-নির্ঝরিণী, ইন্দ্রপ্রস্থ-পাণিপথ-চিতোর প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। আরম্ভাংশ অতি চমৎকার :

তবু ভাঙে না ঘুমের ঘোর
ভাব হয়েছে যামিনী ভোর।
ওই নবীন তপন মহাজাগরণ
আনে না নয়নে তোর !

শেষাংশ আরো চমকপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক :

ঐ নীলসিন্ধু জল
চিরনর্তিত-চঞ্চল
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত
বধির দুয়ার তোর ;
বলে "জাগ্ জাগ্ নতুবা ডুবে যা
অতল গর্ভে ঘোর।

"ঐ নীলসিন্ধুজল চিরগর্জিত অকল" রবীন্দ্রনাথের 'ঐ ভুবন মনোমোহিনী মা' গানের "নীলসিন্ধুজল ধৌত চরণতল" রচনাংশকে মনে করাইয়া দেয়।

এককালে স্বদেশমূলক যে সঙ্গীতটি সমগ্রদেশে প্রবল আলোড়ন তুলিয়াছিল তাহা এই :

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।
দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই॥

অন্য একটি সঙ্গীত এই ধরনের। সকলকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা, বিদেশ-বিদেশী-বর্জনের প্রয়াস তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য :

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট
তবু আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠো॥
ভুলে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান
বিদেশে না যায় ভাই গোলাবি ধান,
আমরা মোটা খাব, ভাইয়ে পরবো মোটা,
মাখবো না ল্যাভেণ্ডার, চাই না 'অটো'॥

রজনীকান্তের আক্ষেপ আর একটি যে-সঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার আরম্ভ এইরূপ :

সেথা আমি কি গাহিব গান।
যেথা গম্ভীর ওঙ্কারে সামঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান॥

সঙ্গীতটির অন্তঃংশে এই আক্ষেপের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে; সেই কারণের মধ্যে প্রাচীন ভারতের গর্ব-গৌরবের ব্যঞ্জনা :

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ, আর কি আছে সে প্রাণ॥

আর একটি সঙ্গীতে রজনীকান্ত ভারত-কাব্য-নিকুঞ্জে সুমঙ্গলময়ী জননীর জাগরণ চাহিয়াছেন, সেই জাগরণের মধ্যে যে সুখ-সুপ্ত ভারতবাসীর জাগরণ ঘটিবে। আর, ভারতবাসীর জাগরণের মধ্যে লুপ্ত পুরাতন গরিমার ঘটিবে উদ্ধার :

হের ভারত চির-সুখ-শয়ন-বিলীনা।
নীতিধর্মময় দীপক যন্ত্রে
জীবিত কর সঞ্জীবন মন্ত্রে
জাগিবে রাতুল চরণতলে যত লুপ্ত পুরাতনগরিমা॥

রজনীকান্ত সেন স্বদেশাত্মক গান রচনায় নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গীতি রচয়িতৃবর্গের অন্যতম। রজনীকান্তের গীতি চিরদিন ধরিয়া বাঙালীর স্বদেশ-বুদ্ধি ও উৎসাহকে উদ্দীপিত করিবে।

●

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

॥ শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে ॥

(উনিশ)

ভাঁটিতে ব্যবহৃত যেসব প্রকৃতিজাত জ্বালানীর কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—সেগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এই তিনটি শ্রেণী হলো কঠিন (solid), তরল (liquid) ও গ্যাসীয় (gaseous)। প্রকৃতিজাত কঠিন জ্বালানীর মধ্যে কাঠ এবং কয়লাই প্রধান।

বিভিন্ন ধরনের গাছ কেটে ওই গাছ শুকিয়ে কাঠ পাওয়া যায়। কাঠে সাধারণতঃ গন্ধকজাতীয় মিশ্রণ থাকে না। সেজন্য কাঠ-জ্বালানীর ভাঁটিতে সেঁকা সিরামিক্‌স্‌এ কোনোরকম অবাঞ্ছনীয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হবার সম্ভাবনা কম থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের কাঠ বাদামী রঙের কয়লার সঙ্গে একত্র পুড়িয়ে যে-কাঠকয়লা তৈরী করা হয়—সেই কাঠকয়লা সিরামিক সেঁকবার ভাঁটিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে বড়ো বড়ো গাছ মাটির তলায় বিভিন্ন স্তরে চাপা পড়ে লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে কয়লায় পরিণত হয়। মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কয়লা সংগৃহীত হয়ে থাকে। লিগ্‌নাইট্ (lignite) অথবা বাদামী রঙের কয়লায় শতকরা প্রায় দশভাগ জল থাকে। বিটুমেনযুক্ত কয়লায় উদ্বায়ী পদার্থ (volatile substance) থাকে শতকরা ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ভাগ। এ'ধরণের কয়লা থেকেই সাধারণতঃ জ্বালানী গ্যাস তৈরী করা হয়। জ্বালানীরূপে ব্যবহারের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাকে বলা হয় এ্যান্থ্রাসাইট্ (anthracite)। এ্যান্থ্রাসাইট্‌এ উদ্বায়ী পদার্থ থাকে শতকরা মাত্র পাঁচ ভাগ এবং এই শ্রেণীর কয়লা যেমন বেশ কঠিন হয় তেমনই এতে অগ্নিসংযোগ করলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে জ্বলতে থাকে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লাতে কম বেশি পরিমাণে গন্ধক মিশ্রিত থাকে। জলন্ত কয়লার গন্ধক সালফার ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস্এ পরিণত হয়। এই গ্যাস সিরামিক্স্এর গ্লেজএ অবাঞ্ছনীয় রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। ফলে গ্লেজ, উজ্জ্বল ও চকচকে হবার বদলে ম্যাট্মেটে হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গ্লেজএ ছোটো ছোটো ফোস্কা (blistering) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র (pinholes) দেখা দিতে পারে। এই কারণেই ভাটিতে ব্যবহার্য জ্বালানী কয়লার মান নির্বাচনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। নিম্নমানের কয়লা জ্বালানীরূপে ভাটিতে ব্যবহার করলে উচ্চমানের সিরামিক্স্ পাওয়া সম্ভব নয়।

তেল-জ্বালানীর ভাটিতে খনিজ পেট্রোলিয়াম জ্বালানীরূপে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জ্বালানী তেলকে ইংরেজীতে বলা হয় 'হেভি ফুয়েল অয়েল' (heavy fuel oil)। পেট্রোলিয়াম শোধন করে পেট্রোল, প্যারাফিন এবং ডিজেল বের করে নিলে যে-ঘন ও চট্চটে কালো রঙের তেল অবশিষ্ট থাকে—ওই তেলই হলো হেভি ফুয়েল অয়েল। ভাটিতে কয়লার বদলে তেল ব্যবহারের কয়েকটি বিশেষ সুবিধের কথা বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। যেমন—জ্বালানীর মানের সমতা; বিভিন্ন তেলকূপে সংগৃহীত হেভি ফুয়েল অয়েলএর মানের বিশেষ হেরফের হতে দেখা যায় না। দ্বিতীয়তঃ পরিচ্ছন্নতা; তেল পোড়ালে কাঠ কিংবা কয়লার মতো ছাই অথবা ধুলো অবশিষ্ট থাকে না। তৃতীয়তঃ মজুত করার সুবিধে; ট্যাঙ্ক অথবা চৌবাচ্চায় মজুত করা চলে, তাছাড়া কাঠ কিংবা কয়লার তুলনায় জ্বালানীর পরিমাণ অনেক কম দরকার হয়। চতুর্থতঃ তেল-জ্বালানীর ভাটিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উচ্চতাপ তোলা সম্ভব হতে পারে—যা সিরামিকনির্মাতাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কয়লা-জ্বালানীর ভাটির প্রকোষ্ঠের চারদিকে যেমন থাকে কয়েকটি অগ্নিকুণ্ড, তেমনই তেলজ্বালানীর ভাটির প্রকোষ্ঠের চারদিকে অগ্নিকুণ্ডগুলো থাকেই, তাছাড়াও থাকে কয়েকটি 'অয়েল বারনার'। ভাটিতে ব্যবহার্য তেল মজুত করে রাখবার জন্যে ভাটি থেকে কিছুটা তফাতে একটি চৌবাচ্চা তৈরী করা হয়। এই চৌবাচ্চার কাছাকাছি পনেরো / বিশ ফুট উঁচু কয়েকটি স্তম্ভের ওপর স্থাপন করা হয় গ্যালভানাইজড্ টিনের পুরু পাতে তৈরী একটি ট্যাঙ্ক। চৌবাচ্চায় মজুত করা তেল একটি পাম্পের সাহায্যে ট্যাঙ্কএ তোলা হয়। ট্যাঙ্ক থেকে অয়েল বারনারএর সঙ্গে যুক্ত নলের চাবি খুলে দিলে তেল অয়েল বারনারএর মুখে চলে আসে। ভাটির প্রকোষ্ঠের ফুটোর ভেতর দিয়ে অয়েল বারনারএর মুখ প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে ঢোকানো থাকে। একটি শক্তিশালী 'কম্প্রেসার' (compressor) যন্ত্রের সাহায্যে বারনারএর মুখে তীব্র বায়ুচাপ সৃষ্টি করা হয়। এই চাপে তেল বারনারএর সরু মুখ দিয়ে সূক্ষ্মকণার আকারে সবেগে প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অগ্নিকুণ্ডে আগুন ধরিয়ে দিলে অগ্নিশিখা প্রকোষ্ঠে ঢুকে ভেতরের বায়ু উত্তপ্ত করে তোলে। উত্তপ্ত বায়ু এবং অগ্নিশিখার সংস্পর্শে এসে অয়েল বারনার-নিক্ষিপ্ত সূক্ষ্ম তেলকণাগুলোও জ্বলে ওঠে। এর ফলে ভাটির প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতিজাত এবং কারখানায় উৎপাদিত গ্যাস জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেট্রোলিয়াম খনি থেকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক গ্যাস সংগৃহীত হয়। ওই গ্যাস ব্যবহারকারীদের কাছে সরবরাহ করা হয় নলের সাহায্যে। কয়লাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বাষ্পীভূত অবস্থায় পুড়িয়ে কৃত্রিম গ্যাস উৎপাদন করা হয়।

ভাঁটির প্রকোষ্ঠের দেয়ালের বাইরে স্থাপিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে গ্যাস বারনারএর মুখটি স্থাপিত থাকে। অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিসংযোগ করলে নলবাহিত গ্যাস জ্বলে ওঠে এবং প্রকোষ্ঠের ভেতরে প্রবেশ ক'রে অভ্যন্তর উত্তপ্ত ক'রে তোলে। বারনারএর মুখের চাবিটি ঘুরিয়ে গ্যাসের চাপ প্রয়োজনমতো বাড়ানো কিংবা কমানো চলে।

বিদ্যুতের সাহায্যে ভাঁটির প্রকোষ্ঠ উত্তপ্ত করবার ব্যাপারটি কিন্তু ভিন্ন ধরণের। কাঠ, কয়লা, তেল অথবা গ্যাস সরাসরি আগুনের সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে এবং তাপ সৃষ্টি করে। বিদ্যুত কেবলমাত্র বিশেষধরণের তড়িৎবাহকে (resistor) প্রবাহিত হয়ে ওই তড়িৎবাহকটিকে উত্তপ্ত করে তুলে তাপ সৃষ্টি করে। ভাঁটির অভ্যন্তরে মধ্যম এবং উচ্চ তাপ সৃষ্টির জন্য সাধারণতঃ দুই ধরণের ধাতব তড়িৎবাহক ব্যবহৃত হয়। ১০৫০° সেন্টিগ্রেড্ পর্যন্ত উত্তাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয় শতকরা আশি ভাগ নিকেল এবং শতকরা কুড়ি ভাগ ক্রোমিয়াম ধাতুর মিশ্রণে তৈরী তার। এই তার 'নাইক্রোম' (nichrome)-তার নামে পরিচিত। উচ্চ তাপের জন্য ব্যবহৃত হয় 'ক্যান্থাল্ তার (kanthal wire)। উচ্চতাপসহ কঠিন এবং ধাতুর মিশ্রণে তৈরী এই তার-এ ১২৫০° সেন্টিগ্রেড্ পর্যন্ত উত্তাপ তোলা যেতে পারে। বিদ্যুতের সাহায্যে সিরামিক ভাঁটির প্রকোষ্ঠে অতি উচ্চতাপ অথবা উগ্রতাপ সৃষ্টির জন্য চিরকাল যাবত ব্যবহৃত হচ্ছে 'সিলিকন্ কারবাইড্' (silicon carbide)-এর বিভিন্ন মাপের দণ্ড এবং পাত। সিলিকন্ কারবাইড্এর মাধ্যমে ১৪০০° সেন্টিগ্রেড্ পর্যন্ত উত্তাপ তোলা সম্ভব হয়েছে। অতি সম্প্রতি যে-ধাতুর মিশ্রণে নির্মিত তড়িৎবাহকের মাধ্যমে ১৬০০° সেন্টিগ্রেড্ পর্যন্ত উত্তাপ তোলা সম্ভব হয়েছে—সে'টির নাম মলিবডেনাম্ সিলিসাইড্ (Molybdenum Silicide)।

—দিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

১। রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ

২। Upanishad

উভয় গ্রন্থই রচনা করেছেন অধ্যাপক শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ. ; বি. টি. । প্রথম গ্রন্থে আশীর্বচন দিয়েছেন ডক্টর শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এবং ভূমিকা লিখেছেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় ইংরাজী-গ্রন্থে Foreword লিখেছেন ডক্টর সরোজকুমার দাস, এম. এ., পি. আর. এস. ; দর্শন-রত্নাকর। প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে 'প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিকেশন-সেলস্-কনসার্ণ, ৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে ; প্রকাশক : শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, মূল্য : পঁচিশ টাকা ; এবং দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে : Dasgupta & Co. Pvt. Ltd., 13, College Street, Calcutta-12 থেকে, মূল্য : ১২.৫০ টাকা।

'রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ'-গ্রন্থটি-সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ঐ গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'ভূমিকা' থেকে কিছু-অংশ উদ্ধৃত ক'রে বলি : "শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত বর্তমান সংকলন একটি মহৎ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনায় বিক্ষিপ্ত আকারে উপনিষৎ-সম্বন্ধে যে নানা মন্তব্য (এবং উপাদানও) ছড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যেই উপনিষদের বাণীর উপর তাঁর নিজস্ব ভাষ্য বিধৃত হয়ে আছে। সেগুলি সংগ্রহ ক'রে একত্র স্থাপন করলে সেই ভাষ্যের পরিচয় সহজে মিলবে। এই উদ্দেশ্যে সংকলক মহাশয় প্রভূত শ্রম স্বীকার ক'রে সেগুলি বর্তমান গ্রন্থে স্থাপন করেছেন।...সংকলিত বস্তুর বিন্যাসে সংকলক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উপনিষদের যে বাণীগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনায় সমগ্রভাবে বা অংশত ব্যবহার হয়েছে তিনি তাদের উপনিষৎ অনুসারে ভাগ করেছেন। তারপর তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি স্থাপন করেছেন। এই মন্তব্যগুলি কালানুক্রমে সাজানো"। এরপর শ্রদ্ধেয় হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছেন : "...বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি রবীন্দ্রসাহিত্যপিপাসুদের একটি বড় অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার সহিত যাঁরা নিবিড় পরিচয়ে উৎসুক তাঁদের কাছে এটি বিশেষ সমাদৃত হবে বলে আশা করি"। আমরা সমগ্র সংকলন-গ্রন্থটি নিজেরা আলোচনা করার পূর্বেই শ্রদ্ধেয় 'ভূমিকা'-লেখকের সঙ্গে একই সুরে বলি : 'বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি রবীন্দ্রসাহিত্য-পিপাসুদের একটি বড় অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে"।

এবার গ্রন্থ-সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করার পূর্বে সুপণ্ডিত সংকলক ও গ্রন্থকার শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. টি. মহাশয়ের বক্তব্য তাঁর সুলিখিত 'অবতরণিকা' থেকে উদ্ধৃত ক'রে বলি : (গ্রন্থে) "উপনিষদের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার সময়ে আমি আচার্য শঙ্করের মতানুযায়ী পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য—রবীন্দ্রনাথ কোথায় পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট হইবে। উদাহরণস্বরূপ ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকের উল্লেখ

করা যাইতে পারে। আচার্য শঙ্করের মতে যেখানে পাঠ 'ঈশাবাস্যম্', রবীন্দ্রনাথ সেখানে পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন 'ঈশাবাস্যম্' (ঈশ+আবাস্যম্)"। অবশ্য সুসাহিত্যিক সংকলক ও গ্রন্থকার শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায় সংকলন ও মন্তব্য করার জন্য যত রবীন্দ্রানুরাগী বিদগ্ধ গ্রন্থকার ও প্রবন্ধকারদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। 'সংগ্রহ' ও 'সাজানো' এই দুটি বিষয় একত্রে বুঝানোর জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজে 'সংগ্রথিত'-শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং গ্রন্থের অনিলবাবু ঐ শব্দটিই গ্রন্থের পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র 'ঈশা বাস্যমিদং' প্রভৃতির অর্থ আচার্য শঙ্করের যা অভিপ্রেত, রবীন্দ্রনাথের বরেণ্য পিতা কিংবা রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই অভিপ্রায়কে অনুসরণ করেন নি, মনে হয়—করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আচার্য শঙ্কর ঐ প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে বলেছেন : "ঈশা বাস্যমিতি।···ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বস্য। স হি সর্বমীষ্টে সর্বজন্তূনামাত্মা···। তেন যেন রূপেণাত্মনেদং বাস্যমাচ্ছাদনীয়ম্।···তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ।···ভক্ষীথাঃ পালয়েথাঃ···"। তারপর দ্বিতীয় মন্ত্র 'কুর্বন্নেবেহ···' প্রভৃতির ভাষ্যের পূর্বে বলেছেন : "এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সংন্যাসেন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্যঃ ইত্যেষ বেদার্থঃ"। ব্রহ্মের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা একটু ভিন্নভাবে করেছেন এবং পূর্বেই বলেছি যে, তা করাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। ব্রহ্মমন্ত্রে (অপ্রচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৮ই মাঘ, ১৩০৭) লেখা হয়েছে : "এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে।···সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্ব অনুভব করিবেন উপনিষদের এই অনুশাসন"। জ্ঞানদৃষ্টিসেবী আচার্য শঙ্কর সেখানে আত্মজ্ঞানী বরেণ্য মানুষদের উদ্দেশ্যে বলেছেন : "···আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ"। আত্মজ্ঞানী তাঁর সেই উপলব্ধ-শাশ্বত-সত্য-আত্মজ্ঞানকে রক্ষা বা পালন করবেন।—যদিও একবার আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি হলে সেই উপলব্ধি আর কোনদিনই ক্ষীণ বা মলিন (নষ্ট) হয় না। অবশ্য আত্মার বা ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমার প্রশংসাই সেখানে অনুস্যূত।

'রবীন্দ্রচেতনায় উপনিষৎ'-গ্রন্থটি যে সংকলন-গ্রন্থ সেকথা পূর্বেই বলেছি। সেজন্য গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মহানারায়ণ, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষৎ থেকে মন্ত্রসকল।

গ্রন্থে একটি 'পরিশিষ্ট' অংশ যোগ করা হয়েছে—যাতে উপনিষদ্-মন্ত্রগুলির প্রধান প্রধান অংশের অর্থ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি-সমর্থিত অর্থ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ যেমন—(ঈশোপনিষদে) 'জগত্যাং জগৎ'-শব্দ ; এর অর্থে বলা হয়েছে : "চরাচর-সম্বন্ধে তাঁরা যে- 'জগৎ' ও 'সংসার'-শব্দ ব্যবহার করেছেন তাতে তো গতিই বুঝায়। 'মায়াবাদী'-রা অবশ্য সেই কারণেই জগৎ ও সংসারকে 'মায়া' বলেছেন, কিন্তু বেদে সত্যের যে মহনীয় নাম 'ঋত' তা 'ঋ'-ধাতু হতেই নিষ্পন্ন। 'ঋ'- অর্থেই তো 'গতি'। এখানে 'মায়াবাদী' বলতে নিশ্চয়ই অদ্বৈতবেদান্তীদের বোঝানো হয়েছে, কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তীরা 'মায়াবাদী'

নন, তাঁরা 'ব্রহ্মবাদী'—'বয়ং তু ব্রহ্মবাদিনঃ' বলেছেন শঙ্করাচার্য। মায়াবাদী তাঁরা—যাঁরা মায়াকে প্রমাণ ও গ্রহণ করার পর মায়াকে স্বীকার করেন ও মায়াকে সিদ্ধান্তরূপে প্রতিপন্নও করেন। কিন্তু অদ্বৈতব্রহ্মবাদীরা মায়া ও মায়াবাদ খণ্ডন করেন, স্বীকার করেন না। এ'সম্বন্ধে বিচার অবশ্য বিশদ। আচার্য বলতেই আসলে আচার্য শঙ্করকে 'মায়াবাদী' ও 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ' বলে সম্বোধন করেছেন—যেটি মোটেই সমীচীন নয়।

পরিশেষে 'রবীন্দ্রচেতনার উপনিষৎ'-সম্বন্ধে বলি যে, এই সংগ্রহ-গ্রন্থ মহামূল্য-গ্রন্থ, কেননা রবীন্দ্রানুরাগী মানুষমাত্রেরই এই গ্রন্থ প্রামাণিক-গ্রন্থরূপে গ্রহণযোগ্য হবে। অসাধারণ পরিশ্রমসাপেক্ষ এই সংগ্রহকর্ম। সেজন্য সুসাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়, এম.এ., বি.টি. মহাশয়কে অন্তরের সঙ্গে আমরা কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এই অসাধ্য-সাধন-কর্মের জন্য।

দ্বিতীয় গ্রন্থ Upanishad in the Eyes of Rabindra Nath Tagore'-গ্রন্থটি-সম্পর্কে পৃথকভাবে আর কোন মন্তব্য করার প্রয়োজনীয়তা মনে করি না, কেননা গ্রন্থকার সমানভাবে পরিশ্রম করেছেন উভয় গ্রন্থেই—তবে অধিক ও অল্প। গ্রন্থ-দুটি সুধীসমাজে আদরণীয় হোক এটাই আমাদের অন্তরের কামনা।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

●

॥ সংঘবার্তা ॥

আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ (৭ই আশ্বিন '৮৯) শুক্রবার হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর (৯ই আশ্বিন) রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীশারদীয়াপূজা (সপ্তমী হইতে নবমী) ও ২৭শে সেপ্টেম্বর (১০ই আশ্বিন) সোমবার দশমীবিহিতপূজা ও সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জন এবং ২রা অক্টোবর (১৫ই আশ্বিন) শনিবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা হইবে।

আগামী ১৬ই অক্টোবর ১৯৮২ (২৯শে আশ্বিন '৮৯) শনিবার রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইবে।

—: অনুষ্ঠানসূচী :—

(বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত-পঞ্জিকামতে)

২৩শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সায়ংকালে দেবীর বোধন ও আমন্ত্রণাধিবাস। ২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর সপ্তমীবিহিত পূজারম্ভ। ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে মহাষ্টমীবিহিত পূজারম্ভ। রাত্র ঘঃ ১০।৩১ মিঃ গতে সন্ধিপূজারম্ভ। রাত্র ঘঃ ১১।১৯ মিঃ মধ্যে সন্ধিপূজা সমাপন। ২৬শে সেপ্টেম্বর রবিবার পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে শ্রীশ্রীদেবীর নবমীবিহিত পূজারম্ভ। ২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার পূর্বাহ্ণ ঘঃ ৯।২৯ মিঃ মধ্যে দশমীবিহিত পূজারম্ভ। সন্ধ্যায় প্রতিমা নিরঞ্জন। সপ্তমী ও নবমীতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর কালীকীর্তনাদি হইবে।

●

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানা দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতল) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে ত্বরান্বিত করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

ফোন : ৪৪-৬১৪৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪
(মিত্রা সিনেমার পাশে)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে
শ্রীবিষ্ণুর
অমলিন অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :
SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

ফোন : ৪৪-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রদাসসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০৭৩

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙালী	১০·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙালী	৭·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিপ্লবী	৭·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভাগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	১৬·০০	হিন্দুনারী	
যোগশিক্ষা	১০·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	আত্মজ্ঞান	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মবিকাশ	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০		

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ (১ম)	২৫·০০	তীর্থরেণু	
মন ও মানুষ (২য়) প্রকাশের অপেক্ষায়			
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	২৫·০০		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাস ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ		অভেদানন্দ দর্শন (১ম) প্রকাশের অপেক্ষায়	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	৫·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০		
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন· ৫৫-২৫৪৯) ৫৫-৬৫৬৫

ডি. রতন এণ্ড কোং

ষ্টেশনার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি ৬

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুতকারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও "JECY" ব্রাণ্ড পলিথিন পাইপ ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিধাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিঃ

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট মূল্যে-মফঃ-স্বিল্লযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত

একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

হেড অফিস : "NEELAMBER", ২৮বি, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ৪৪-৪০২৫, ৪৩-৪২৫৮/৯ টেলেক্স : ২১-২৫১৯ TNGIN

ফ্যাক্টরী : ১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৫-১৬১৩

With Best Compliments From :— Phone : 24-4718

THE SMITAJA CHEMICALS PVT. LTD.

OUR PRODUCTS :—

ACTIVATED CARBON POWDER CRPH FOR CRITICAL APPLICATION ;
ACTIVATED CARBON POWDER CRTECH FOR NON-CRITICAL APPLICATION ;
ACTIVATED CARBON GRANULES FOR WATER TREATMENT AND OTHER USES ;
ACTICARB-PI FOR PRINTING INK/PAINTS ;
ACTICARB-RG FOR RUBBER.

Regd. Office : NARENDRAPUR 24-PARGANAS, WEST BENGAL

City Office : 30F, FREE SCHOOL STREET, CALCUTTA-700 016

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
Publication Office, 5 Dehi Entally Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A Study of Religion on Scientific Basis		Reincarnation	
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi		Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion		Religion, Revelation and God	
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10·00	Swami Vivekananda and His Works	
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	
Human Affection and Divine Love	4·00	The Steps Towards Perfection	
Ideal of Education		The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	18·00	Yoga Psychology	
Mystery of Death	10.00	Yoga : Theory & Practice	10.00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music	120.00	Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour		The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	48.00		
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its Form, Function and Value	55.00	Music of the South-Asian Peoples. Vol. I	125·00

The forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture

Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
44th Year, September 1982
VOL. VII

20 SEP 1982

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (শাইস) প্রাঃ লিঃ

২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৩০২৯৫, ৩২৬৬৩২, ৩৩১২৩২

Cable:'Cookmepure','Queenspica'
Telex:021 2591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70

iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6,Duff Street, Calcutta-700006
PRICE Rs. 1.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১·৫০ টাকা

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক :
শ্রীশান্ততোষ ঘোষ

স্বামী অভেদানন্দ
প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত পীঠ, কলিকাতা

চুয়াল্লিশ বর্ষ
শারদীয়া সংখ্যা
আশ্বিন
১৩৮৯

With Best Compliments from

Messrs Utkal Plumbing Works

16, GOLAP SASTRI LANE CALCUTTA-700 014

PHONE : 35-0406

AIR CONDITIONING PLUMBING SYSTEMS

"অন্নের ক্ষেতে ওই ছেলে মেরে আকাশ করে, মাটির দিকে তাকায়। দেখেই বোঝা যায় আকাশ-বাতাসে ওদের কত হাজার বছর ধরে এই মাটি আমাদের লাখী দিয়েছে। আর আমাই ঘোর আমরা কলকে মানুষ অনেক অনুপ্রাণ বটি বাই কিন্তু আমাদের মেন গ্রামদের সেই অন্নের অভাব ঘটিয়াছে।" — রবীন্দ্রনাথ

এই অন্নের অভাব পূরণ করার জন্য প্রয়োজন মাটির পুষ্টি সাধন। তাই আমরা বলি মাটি পরীক্ষা করান সর্বাগ্রে, তারপর দিন প্রয়োজন মত সার। ব্যবহার করুন হিন্দুস্থান সার কর্পোরেশনের সুষম এবং ইউরিয়া। অনুরূপ অন্নের নিশ্চিত আশ্বাস।

হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড

বিপণন বিভাগ,
৪১ নং চৌরঙ্গী রোড,
কলিকাতা-৭০০০৭১

"দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল-কলস।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জনগণের সেবায়—
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

প্রতিদিন এই 'লেট' অসহ্য !
–ঠিকই, আসুন কারণটা খতিয়ে দেখা যাক !

যাঁরা নিয়মিত, বছরের পর বছর রোল-কলিংকে উপেক্ষা করে আপনার নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করে চলেছেন—তাঁদের কথা কোনদিন ভেবে দেখেছেন কি ? বিভিন্ন ট্রেনে, স্টেশনে, কেবিনে এবং অন্যান্য জায়গায় কর্মরত আমাদের এইসব কর্মীরা আপনাদের হয়রানি বা আটকে যাওয়ায় তেমন কিছু কোন মতেই দায়ী নন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রায় প্রতিদিন কোথাও না কোথাও এঁদের মধ্যে কেউ না কেউ অনর্থক লাঞ্ছিত, অপমানিত হচ্ছেন—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এঁদের মারধোরও করা হচ্ছে। অথচ ট্রেন আটকে পড়ায় এঁদের কিছু বিন্দুমাত্র দোষও নেই। ভুল জায়গায় এ ধরনের ক্ষোভ দেখানোর ফলেও অনেক সময় ট্রেন চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে।

ট্রেন লেট হলে আপনাদের অসুবিধা ও রাগের কারণ আমরা বুঝি। কিন্তু ট্রেন কেন লেট করে তার কারণ কি আপনারা জানেন ? বেশির ভাগ সময়েই কিন্তু এমন সব কারণে ট্রেন লেট করে যার উপর আমাদের কোন হাতই নেই, যেমন ধরুন সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য, বিপদ-সঙ্কেত টানা, চেন পুলিং খুলে দেওয়া, তাদের চোরাকারবারীদের মালপত্র সরকম জায়গায় আটকে যাওয়া ইত্যাদি। অবশ্য যান্ত্রিক কারণেও কখনো-সখনো ট্রেন লেট করে না—এমন নয়, তবে তেমন ঘটনা কমই ঘটে। কিন্তু তার জন্যে কি হিংসাত্মক কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হবে ? নিজেরাই ভাবুন। যাঁরা প্রতিদিন আপনাকে বাড়ি থেকে কাজের জায়গায় এবং আবার সেখান থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেন তাঁদের ওভাবে ভয় দেখানো বা তাঁদের মনোবলে ও ভাবে চিড় ধরানো কি যুক্তিসঙ্গত ? ফলের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ড্রাইভার/গার্ডদের মারধোর বা অপমান করলে তাঁদের মনোবলে চিড় ধরে এবং তাঁরা নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এই ধরনের হুমকি এবং মানসিক চাপের ফলেই অনেক সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। উপরন্তু এ ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সমাজবিরোধীরাও জল ঘোলা করার বিরাট সুযোগ পেয়ে যায়।

কাজেই আর একবার ভেবে দেখুন, ভুল জায়গায় রাগ দেখিয়ে আপনার লোকসান ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ভুল জায়গায় ক্ষোভের প্রকাশ

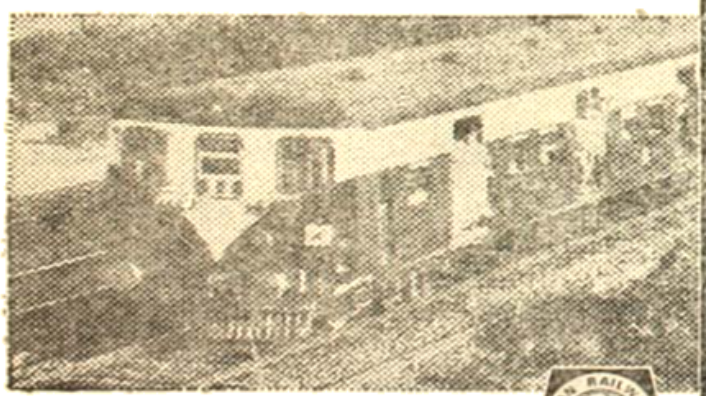

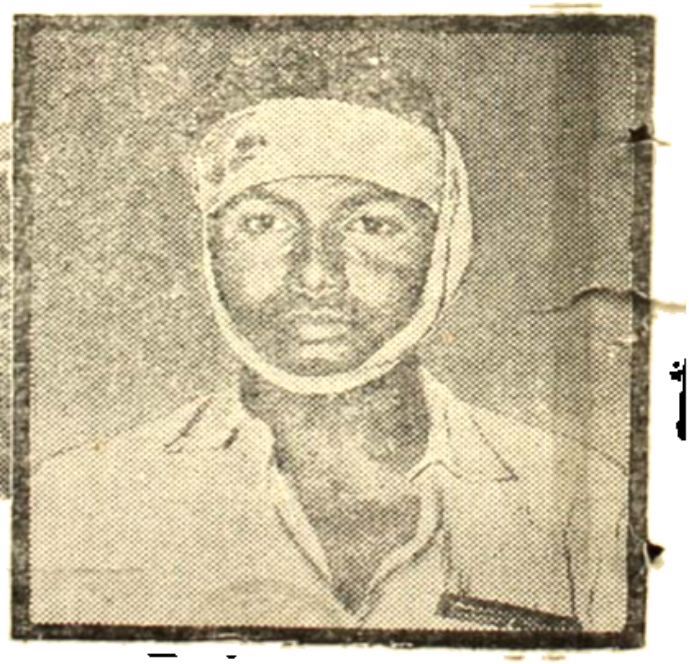

পূর্ব রেলওয়ে

INDIAN RAILWAYS
EASTERN RAILWAY

রাজপথের পাঁচালী

কলকাতা সত্তরের দশক

৭০-এর দশক মুক্তির দশক। জনসাধারণের দুরবস্থা থেকে গতিহীনতা আর দুঃসহ কষ্টের হাত থেকে। বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করলেন, প্রশাসকরা চিন্তা করলেন। শহরে এলো মিনি বাস আর স্পেশাল বাস। সাধারণ বাস [illegible]মের সংখ্যাও বাড়ানো হল। শহরতলীর [illegible]নের সংখ্যাও বাড়লো অনেক। ইতিমধ্যে এসেছে সি.এম.ডি.এ. রাস্তা চওড়া হতে শুরু করলো — যাতে যানবাহনের সংখ্যা আর গতি বাড়ানো যায়। কিন্তু এতো সব প্রচেষ্টাতেও মুক্তি এলো না সাধারণ মানুষের। তাঁদের যাতায়াতের কষ্টের লাঘব হল না। বিশেষজ্ঞরা এবার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে রায় দিলেন — 'কলকাতার পিঠে জুড়ে দিতে চাই সেই ডানা, যার আরেক নাম গতি'। কিন্তু উপর দিয়ে নয়, মাটির তলা দিয়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণ — দমদম থেকে টালীগঞ্জ — ১৬.৪০ কিলোমিটার পথে বসবে পাতালে রেল। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয় ১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। কাজ শুরু হল প্রথমে ময়দানে ও পরে ময়দানে। বিগত দশকের শেষে সারা কলকাতা জুড়েই ছড়িয়ে পড়ল এই [illegible] কর্মযজ্ঞ।

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

একটি বিশিষ্ট ধরনের গেঞ্জী

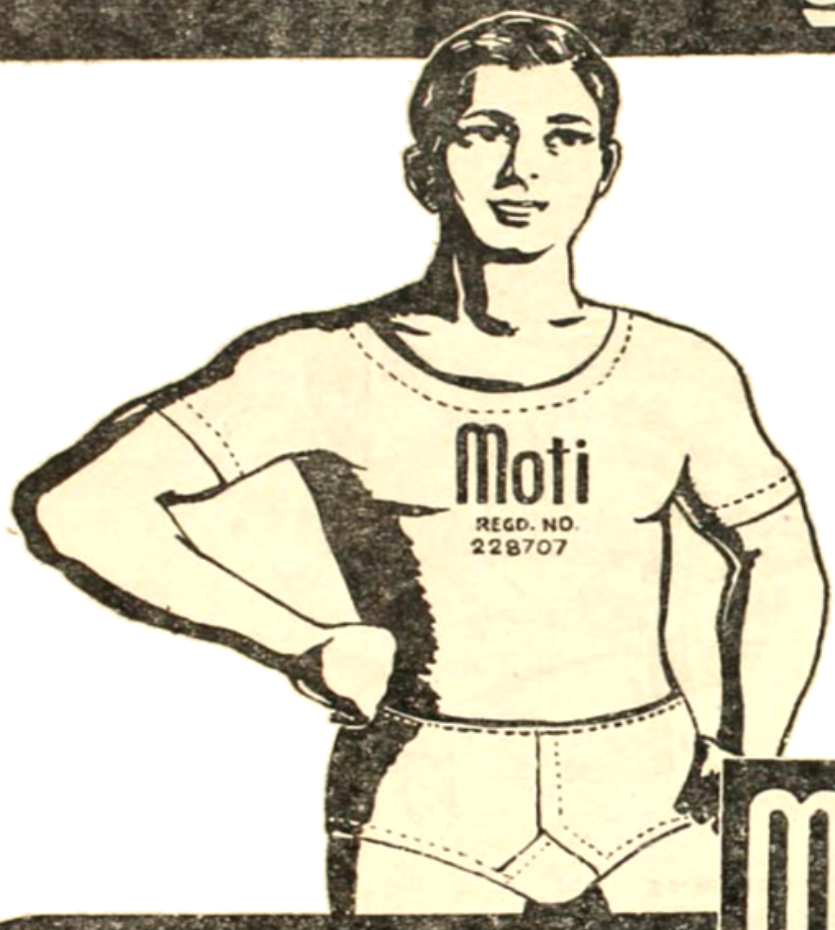

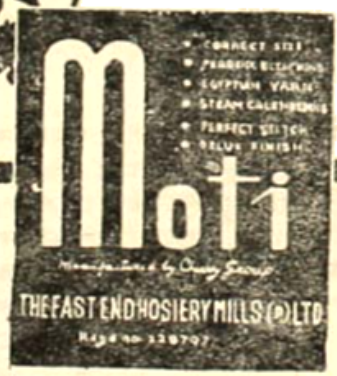

মতী গেঞ্জী

রেজিঃ নং ২২৮৭০৭

প্রস্তুত কারক:
চেরীগ্রুপ
দি ইষ্টএণ্ড হোসিয়ারী মিলস্ (প্রা-) লিঃ
১০০-রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট ● কলিকাতা-৬ ● ফোন: ৩৫-৪৭৭২

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

আশ্বিন, ১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীসেবাব্রীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

। সাপ্তাহিক আলোচনা ।

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন। ● স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। ● প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিশিষ্ট মনীষীগণ। ● ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস বিহারী ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন। ● প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

"শিরদার তো সরদার, মাথা দিতে পার তো নেতা হবে।"

ভারতাত্মার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দকে যিনি ভাব-গুরুরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর অমোঘ বাণী নিজ জীবনে বহন করেছেন সকল নেতার নেতা সেই নেতাজীর সচিত্র পূর্ণজীবন-কাহিনী কার্টিজ কাগজে অফসেটে ছাপা বোর্ড বাঁধাই—

NETAJI—A PICTORIAL BIOGRAPHY—Rs. 50·00

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ॥ **বিবেকানন্দ চরিত** ১৫·০০ **ছেলেদের বিবেকানন্দ** ২·০০
প্রফুল্লকুমার সরকার ॥ **শ্রীগৌরাঙ্গ** ৬·০০
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ॥ **রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা** ৮·০০
সুভাষচন্দ্র বসু ॥ **তরুণের স্বপ্ন** ১০·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ **আমাদের নিবেদিতা** ৬·০০
সৌরীন্দ্র মিত্র ॥ **খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে** ৪০·০০
কিশলয় ঠাকুর ॥ **পথের কবি** ২০·০০
অম্লান দত্ত ॥ **ব্যক্তি মুক্তি সমাজ** ৫·০০
অশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **সূর্য পথিক শ্রীঅরবিন্দ** ৮·০০
রাণী চন্দ ॥ **পথে ঘাটে** ১৫·০০
পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥ **মাধুরীলতার চিঠি** ৫·০০
রাধারাণী দেবী ॥ **শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প** ১৫·০০
ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও নলয় দাশগুপ্ত ॥ **ফুলের বাগান** ২০·০০
শিবকালী ভট্টাচার্য ॥ **চিরঞ্জীব বনৌষধি** (ছয় খণ্ডে) ১ম ৪র্থ খণ্ড ২৫·০০
৫ম খণ্ড ৩০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫, বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯
৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

বিশ্ববাণী

আশ্বিন, ১৩৮৯

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	প্রার্থনম্	২৮১	শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য
২।	বাণী ও বিচার	২৯০	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে	২৯৭	স্বামী প্রভানন্দ
৪।	ভজন	৩০২	শ্রীঅমর শঙ্কর ভট্টাচার্য
৫।	গয়াধামে নরেন্দ্রনাথ	৩০৩	শ্রীশচিমল কান্তি দাস
৬।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা	৩০৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭।	চতুঃশ্লোকী ভাগবত কথা	৩১১	শ্রীরণজিৎ কুমার সেন
৮।	রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন	৩১৯	ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

Gram : BANDUKGHOR Phone : 23-3147

J. BISWAS & CO.

Arms & Ammunition Dealers

Purchase/Sale/Repairing/Safe Keeping of Weapons

Air Guns and Pistols (No Licence)

2, JAWAHARLAL NEHRU ROAD

CHOWRINGEE ROAD

CALCUTTA-700013.

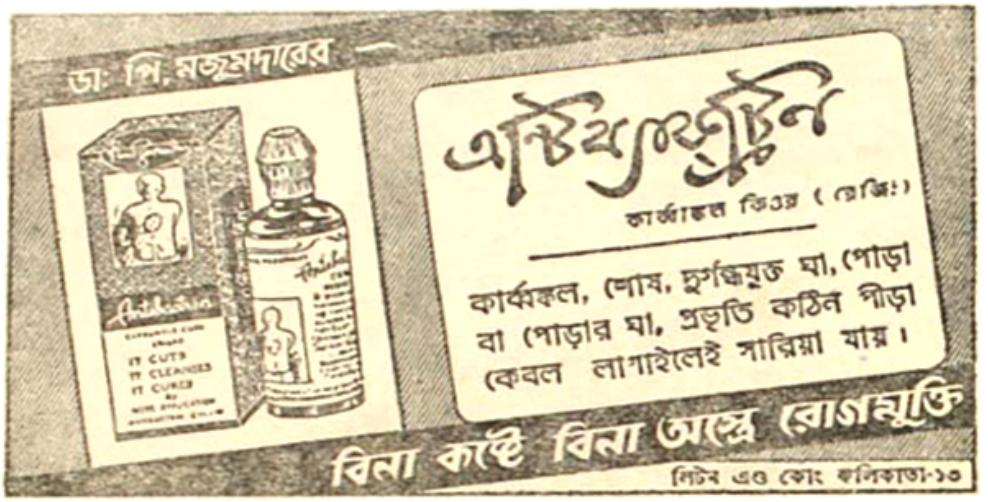

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

[illegible]

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	যোগদর্শনের সার্বজনীনতা	৩২৩	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
১০।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৩২৫	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
১১।	শিক্ষা-গুরু : উপনিষদে	৩২৭	শ্রীজাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী
১২।	প্রতীক্ষা	৩২৯	শ্রীঅমরশঙ্কর ভট্টাচার্য
১৩।	শাক্তমহাজনগীতি: ইচ্ছাময়ী মা	৩৩০	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
১৪।	গান	৩৩২	শ্রীশান্তশীল দাস
১৫।	ক্লাসিক্, রোমান্টিক ও বিহ্নিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্য	৩৩৩	শ্রীআশুতোষ ঘোষ

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

১৬৫, শরৎ বসু রোড

কলিকাতা - ৭০০০২৬

আমাশয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

ন্যাশকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, সুপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১৬।	গান	৩৩৫	শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস
১৭।	দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' প্রসঙ্গে	৩৩৬	ডক্টর ত্রিপুরা বসু
১৮।	ভুল	৩৪১	শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী
১৯।	বিদ্যাচর্চায় বাঙালী মনীষী ও তাঁদের শিক্ষাগুরু প্রসঙ্গে	৩৪২	শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী
২০।	ভূত আর ভয়ের দেশ ভুটানে	৩৪৭	শ্রীবিশ্বজিৎ দাস
২১।	পিকাসো-র শিল্পীজীবনের আর এক অধ্যায়	৩৫১	শ্রীদিবাকর সেন রায়
২২।	স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র	৩৫৪	

ফোন : ৫৫-৪৪৫৭

পি. রায় এণ্ড ব্রাদার্স

কোণারক ব্র্যাণ্ড সিমেণ্ট এজেণ্ট

সকল প্রকার রং, ইমারতী দ্রব্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬/৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

With Best Compliments of :

ECONOMIC ROADWAYS CORPORATION

Regional Office :
P-9, New C. I. T. Road
Calcutta-700 073
Phone : 27-7704, 26-7611, & 26-8029

Booking Office :
103, C. R. Avenue
Calcutta-700 073
Phone : 27-3534

Head Office :
15-8-206 Begum Bazar
Hyderabad-12

412, Bellilious Road,
Howrah-1
Phone : 62-2414

With the best Compliments of :

DECORINA

59, SIMLA STREET
CALCUTTA-700 006

DESIGNER, Interior Decorator and Quality Furniture Makers.

With the best Compliments :

O SICERIN & BIVA

85B & C, JATINDRA MOHAN AVENUE
CALCUTTA-700 005
STOCKIST OF GLAXO PRODUCTS
&
MANUFACTURERS OF QUALITY FILTER PAPER
FOR
RESEARCH, INDUSTRY, EDUCATION

Phone : 55-5893 **Gram : Filterort**

For a wide choice of cables of International standard there's one choice INCAB

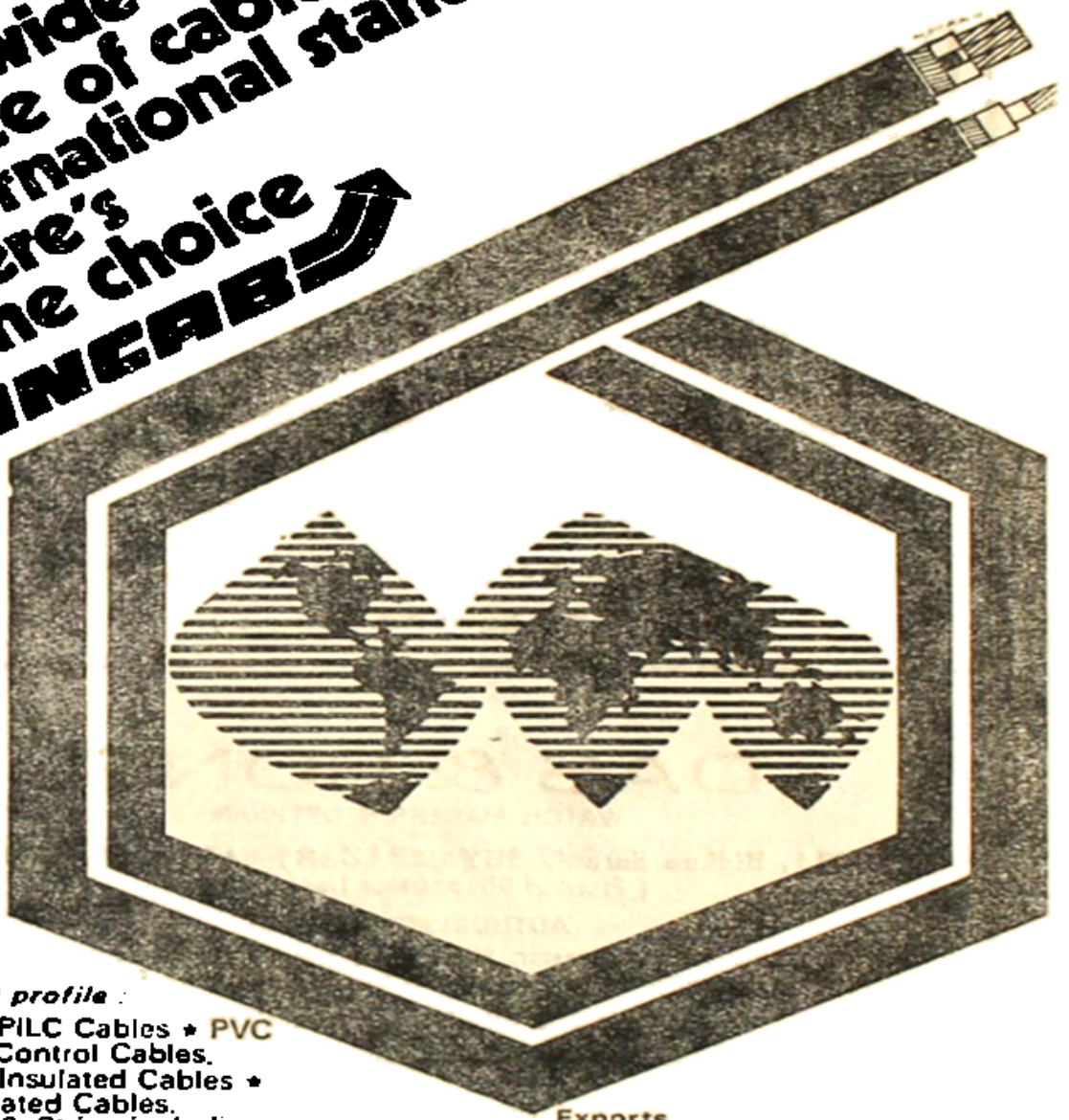

INCAB product profile :

XLPE Cables * PILC Cables * PVC Power Cables, Control Cables. Thermo Plastic Insulated Cables * Elastromer Insulated Cables. Winding Wires & Strips including Continuously Transposed Conductor * Cable Jointing Accessories

These are just a few in *INCAB'S* wide range.

Contract Department

INCAB not only manufactures cables, it helps in their installation too. For over half-a-century, *INCAB* Contract Department has successfully carried out the electrification of major projects all over the country.

Exports

INCAB products have come to be recognised as equal in quality and technical perfection to the best in the international market

INCAB products have been exported to over 35 countries

INCAB

quality cablemakers - first and foremost

THE INDIAN CABLE COMPANY LTD.

9, Hare Street, Calcutta-700 001.

PR1/8

Phone : 34-7399

S. SARKAR & BROTHERS

72 Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

ORTHOPÆDIC & DEFORMATIC APPLIANCES

Manufacturers of

Artificial Limbs, Deformatic Shoes, Walking Calipers, Spinal Braces, Lumber Corsets, Hernia Trusses, Abdominal Belts Cervical Collars Etc.
Specialist in ARTIFICIAL LIMBS

Gram : Holselil

Phone : 26-2403, 27-2404, 27-9811

B. K. SAHA & BROS LTD.

TEA MERCHANT

5, POLLOCK STREET, CALCUTTA-700 001

(We have No Branch)

Phone : 55-2628, 64-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004
(Front of Shyambazar Tram Dept)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timestar, Shreeshyla, Sandoz, Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches, Hes, Anglo-Swiss & Favre-Leuba Time Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

G. C. DAS ELECTRIC CO.

Services & Decoration A. C. D. C. Fan, Motor, Building Wiring & Everything Repair.

12/6A, GOABAGAN STREET,

CALCUTTA-700 006

(ON MIKE HIRE)

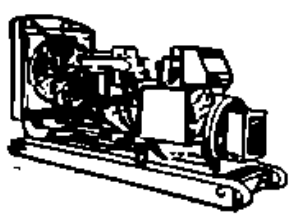

আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক—
এই আমাদের প্রচেষ্টা...

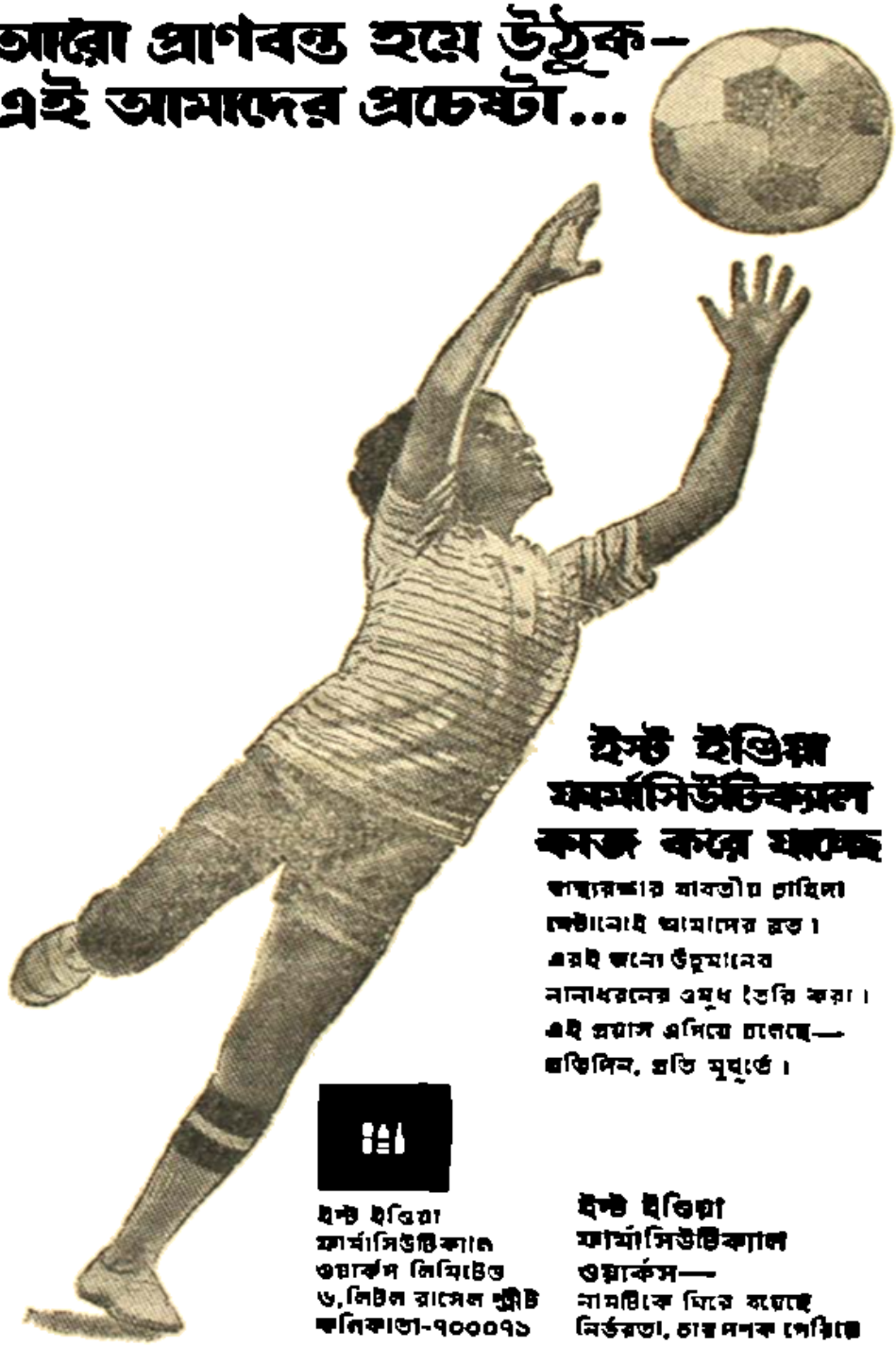

ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
কাজ করে যাচ্ছে

স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় চাহিদা
মেটানোই আমাদের ব্রত।
এরই জন্যে উন্নমানের
নানাধরনের ওষুধ তৈরি করা।
এই প্রয়াস এগিয়ে চলেছে—
প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস লিমিটেড
৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭১

ইস্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস—
নামটিকে ঘিরে রয়েছে
নির্ভরতা, চাহিদা বেড়েছে

EIPW:CAS-1/80 BEN

With Compliments from :

★
★★

A WELL WISHER

নির্ম্মল লেখার কলম

বিশিষ্ট সাংবাদিক
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন—
নির্ম্মল পেন ব্যবহার করে আমি
আনন্দিত হয়েছি। কলমটির ডিজাইন সুন্দর
ও নিব এই কলমের পেন হোল্ডারের
সাহায্যে ব্যবহার করা যায়।

নির্ম্মল পেন

যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার বলেন—
আমি কিছুদিন যাবৎ নির্ম্মল পেন
ব্যবহার করিতেছি এবং ব্যবহারে বিশেষ
সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই পেন ব্যবহারে সকলেই
যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন সে বিষয়ে
আমি নিঃসন্দেহ।

নির্ম্মল ষ্টোর্স
১, রামরতন মল্লিক লেন • মণিহারিপট্টি • বড়বাজার • কলিকাতা-৭

মহাশক্তি স্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদাময়ী

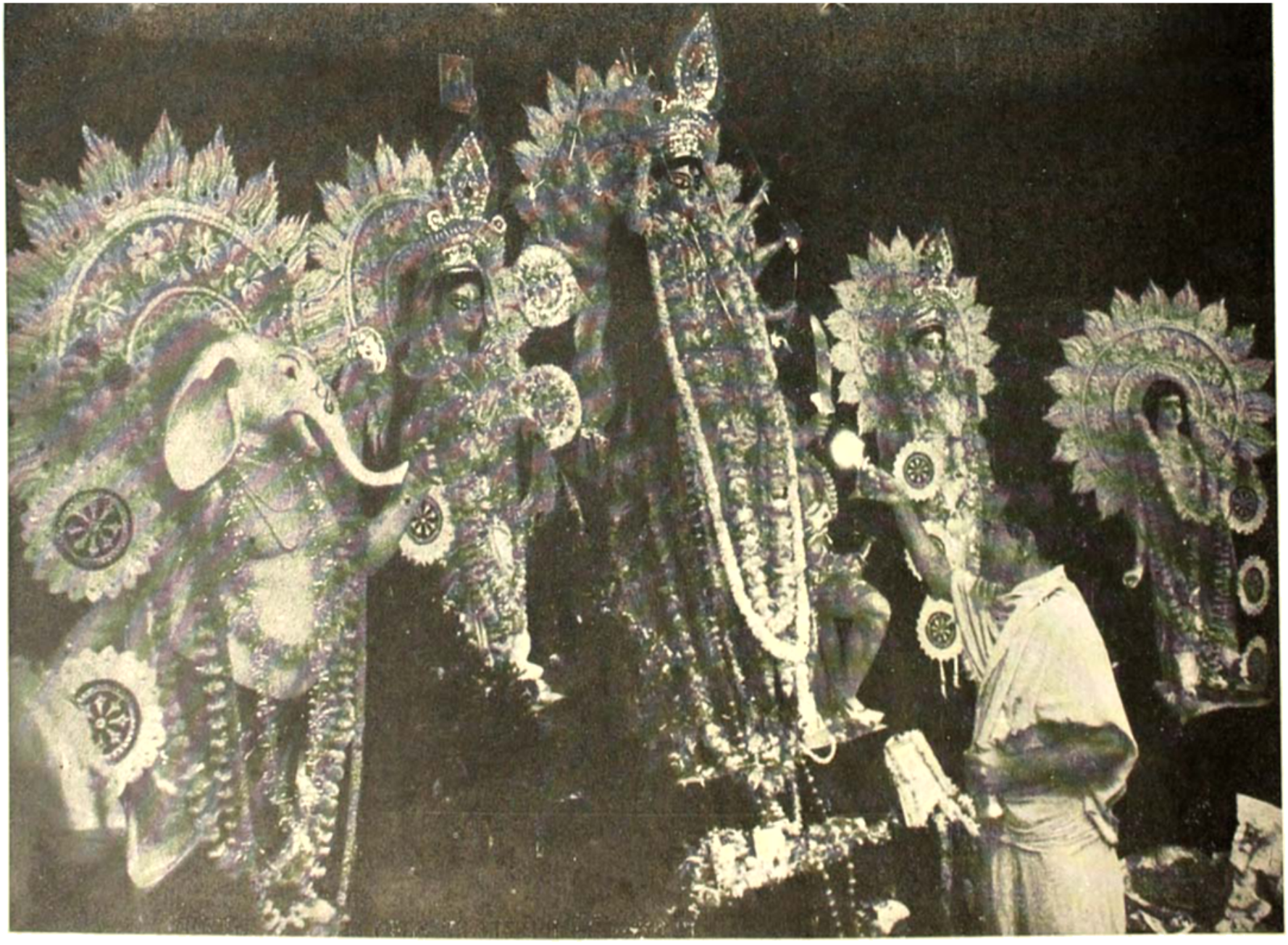

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে সারদীয়া শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

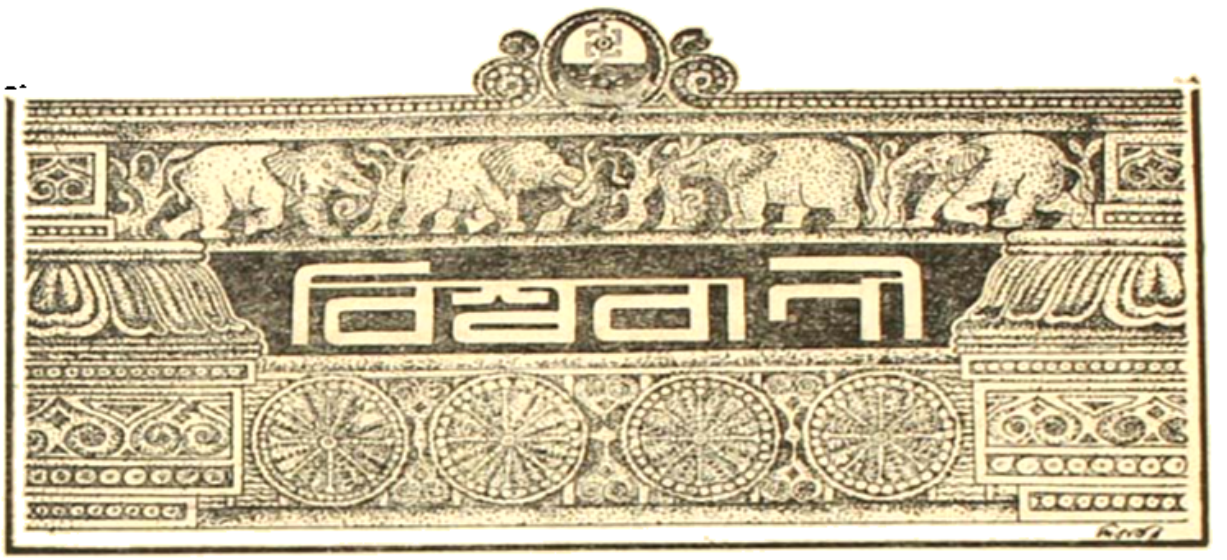

চুয়াল্লিশ বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা | আশ্বিন ১৩৮৯

॥ প্রার্থনম্ ॥

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

বিপদুদ্ধারিণি দুর্গে !
পুণ্যতরঙ্গে যৌক্তিকরঙ্গে
দলিতোৎপীড়কবর্গে।

তব পদকমলং যেষাং শরণম্
ইহ চিরমভয়ং তেষাং পরমম্
ভবতি চ শুভদং সর্ব্বং করণম্
গমনং স্বাদপবর্গে।

ভগবতি ! সম্প্রতি বিশ্বে বিষমম্
প্রভবতি দুর্মতি-শাঠ্যং চরমম্
প্রশময় সকলং দুষ্টাচরণম্
জগদুদ্ধারিণি ! সর্গে ॥

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ আমি ও আমার,—আমার কেউ নয় ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমিই সব করছ, আর তুমিই আমার আপনার লোক; আর তোমার এই সমস্ত ঘর-বাড়ি, পরিবার, আত্মীয়-বন্ধু, সমস্ত জগৎ। সব তোমার। আর আমি সব করছি, আমি কর্তা, আমার ঘর-বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে বন্ধু, বিষয়—এ'সব অজ্ঞান।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ২৪০

ইংরাজী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই অক্টোবর। দক্ষিণেশ্বরে সিঁথির বেদান্তবাগীশকে উপদেশ: (পণ্ডিতের প্রতি)—'থাকে মাঝে সাধুসঙ্গ ভাল। রোগ মানুষের লেগেই আছে। সাধুসঙ্গে অনেক উপশম হয়'। তারপর পুনরায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'আমি ও আমার, —আমার কেউ নয়; দাসভাব'।

এখানে জ্ঞানের বিচার। আবার ভক্তির প্রসঙ্গ ও সঙ্গে সঙ্গে দাসভাবের কথা। এই প্রসঙ্গে পুনরায় ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের প্রসঙ্গে জ্ঞানের লক্ষণেরও আলোচনা (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪২)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেকোন প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে বিচিত্র বিষয়ের কথা থাকে।

তিনি সিঁথির বেদান্তবাগীশকে উদ্দেশ্য ক'রে সাধুসঙ্গ করার প্রসঙ্গে 'আমি ও আমার, —আমার কেউ নয়'—এই জ্ঞানের সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলেন। বলেন: 'এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমিই সব করছ, আর তুমিই আমার আপনার লোক' প্রভৃতি। কথাই তাই যে, 'আমি-আমার ভাব' অজ্ঞানের, আর 'তুমি-তোমার ভাব' জ্ঞানের। 'আমি-আমার' অহংকারের ভাব; এতে স্বার্থ-ভাবরূপ 'অহং'-অভিমানে মন ডুবে থাকে, অথচ আমার (নিজের) সত্য সত্য কিছুই নয়। পৃথিবীতে সকল জিনিস, সকল সম্পর্কই দু'দিনের, সুতরাং অনিত্য,—আজ আছে, কাল নাই। যা নিত্য—তা চিরকালই থাকে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ চলমান অনিত্য সকল-কিছুর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—মানুষের দেহের প্রতি এতো মমতা ও ভালবাসা; দেহকে নিত্য ও শাশ্বত ব'লে মনে করা—এটা কিন্তু ঠিক নয়; কেননা দেহের পরিবর্তন আছে: শিশুকালের দেহ যৌবনকালে থাকে না, আবার বার্ধক্যে সেই দেহের অনেক পরিবর্তন হয়—'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি' (গীতা ২।১৩)। চক্ষুষ্মান জ্ঞানী ব্যক্তি (আত্মজ্ঞানী) যাঁরা—তাঁরা দেহের নাশে শোক করেন না, কারণ পার্থিব-দেহ নিত্য ও শাশ্বত নয়, কেননা দেহের পরিবর্তন আছে ও দেহের নাশ বলতে মৃত্যু আছে। তাই অসৎ বা অনিত্য যা—তা কখনও সৎ বা নিত্য হয় না, তা মিথ্যাই (অনিত্যই) চিরদিন। আবার সৎ বা নিত্য ও শাশ্বত যে বস্তু—তার কখনও নাশ বা মৃত্যু হয় না। এটিই গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী। শুধু ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ কেন, সকল ঋষি, মুনি, জ্ঞানী ও অবতারপুরুষেরই ঐ এককথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ঐকথা বলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: 'তত্ত্বদর্শিভিঃ অনয়োঃ উভয়োঃ সদসতোঃ অন্তঃ',—অর্থাৎ সৎ ও অসতের তত্ত্ব-নির্ণয় করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তত্ত্বদর্শী তাঁরা—যাঁরা 'বস্তুযথার্থাবেদিভিঃ'—বলেছেন টীকায় শ্রীধর-স্বামী। যাঁরা বস্তুর যথার্থতত্ত্ব জানেন, তাঁরাই তত্ত্বদর্শী ও জ্ঞানী।

তত্ত্বদর্শীরাই জ্ঞানী, কেননা তাঁরা পার্থিব ও অপার্থিব—অনিত্য ও নিত্য সকল বস্তুরই স্বরূপতত্ত্ব জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "আমি ও আমার,—আমার কেউ নয়", অথচ আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষেরা বলি—'আমারই সব'। এরই নাম অজ্ঞান। অজ্ঞান কিনা অযথার্থজ্ঞান। যা যথার্থ বা নিত্য ও সত্য নয়, তাকে নিত্য ও সত্য বলি—এর নাম অজ্ঞান। নিত্য ও সত্য হলো সেই ত্রিনিত্য বা বস্তু—যা ত্রিনকালে থাকে। ত্রিনকাল বলতে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ। আমরা অনন্তকালকে তিনটি মানদণ্ডে ভাগ করি, অথচ মহাকালের মধ্যে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই কোন কালের বা কোন সময়ের ভাগই নাই। মহাকাল অনন্ত, অখণ্ড ও একাকার। এই মহাকাল অব্যক্ত ও অনন্ত ব্রহ্মেরই অন্যনাম। আমরা নাম ও রূপ দিয়ে ভাগ ক'রে তাঁকে মহাকাল বলি। ব্রহ্মের definition বা পরিচয়ই তাই—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ',—সীমাহীন অসীম একাকার আকাশ, বাতাস বা বায়ু যেমন অখণ্ড, অনন্ত ও একাকার, তেমনি বিরাট সীমাহীন চৈতন্য বা মহাচৈতন্য-ব্রহ্মসত্তা সর্বব্যাপক। আমরা বাস্তব সকল-কিছুর আকার ও রূপ চিন্তা করি, কেননা তা না হ'লে মন দিয়ে বা বুদ্ধি দিয়ে সেই অনন্ত-একাকার মহাচৈতন্যের ধারণা করতে পারি না। মন সাকার বা সীমিত-চৈতন্য, তাই মন দিয়ে ধরতে ও বুঝতে গেলেই অসীম ও অনন্তকে সীমা ও অন্ত দিয়ে ধরতে-বুঝতে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না, অসম্ভব।

সত্যকার জ্ঞানও তাই। সত্যকার অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞানের কোন সীমা ও নির্বচন নাই, কারণ সীমা ভাবতে গেলেই সেই জ্ঞান পার্থিব ও ব্যবহারিক জ্ঞানে পরিণত হয়। 'পরিণত'-শব্দটি ঠিক অদ্বৈতবেদান্তে প্রযোজ্য নয়, এটি সাংখ্যদর্শনের পরিভাষা। অদ্বৈতবেদান্তে এর নাম অধ্যাস বা অধ্যস্ত-রূপ। এই অধ্যাস বা অধ্যস্ত-রূপকে আবরণও বলা যায়—যদিও সেই আবরণ ক্ষণিক ও মায়িক, সত্য নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর, তুমিই সব করছ, আর তুমিই আমার আপনার লোক"। 'তুমিই সব করছ', সুতরাং আমি কিছুই করছি না—বলতে গেলেই নিজের মধ্যে 'অহং' বা 'আমি'-অভিমানটি (অস্মিতাকে) বিসর্জন দিতে হয়, 'আমি'-অভিমানটিকে একেবারে মুছে ফেলতে হয়। এই মুছে ফেলার নামই 'আমি'-কে 'তুমি'-তে রূপান্তরিত করা। তাই 'আমি'-র লোপ করা নয়, 'আমি'—এই ভাবের বা অভিমানের স্থানে 'তুমি'-ভাবকে আরোপ করতে হয়। 'তুমি'-ভাবে কোন অর্থেই বলতে 'আমি'-ভাবের অভিমান থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলতেন—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু';—আমি নয়, আমি নয়, কিন্তু তুমি। এখানে ভক্ত-সাধকের একটি গান স্মরণ করতে বলি:

সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি করো মা,
লোকে বলে করি আমি।

লোক বলতে সাধারণ লোক। সাধারণ লোক 'অহং'-অভিমান-রূপ অজ্ঞানে পূর্ণ থাকে, তাই সে 'আমি-আমি' বলে, কিন্তু জ্ঞান হ'লে অর্থাৎ অজ্ঞান চলে গেলে বলে 'তুমি—তুমি', অর্থাৎ 'হে ভগবান, আমি কিছু নই, তুমিই সব'। আর তখনই জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয় ও বলে: "তুমিই সব করছ, তুমিই আমার আপনার লোক। আর তোমার এই সমস্ত ঘর-বাড়ি, পরিবার, আত্মীয় বন্ধু,—সমস্ত জগৎ'। যখনই বলি 'আমি সব করছি',—সেখানে 'আমি' কর্তা। তাই আমার ঘর-বাড়ি, পরিবার, ছেলেপুলে, বন্ধু, বিষয়—এ'সব অজ্ঞান। অজ্ঞানে বিবেকবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়, তাই লোকে যা আমার নয়—তাকে 'আমার আমার' বলে। অজ্ঞান তাই অন্ধ,—সত্য কি ও নিত্য এবং শাশ্বত কি—তা দেখতে পায় না। সেজন্য সাধুসঙ্গ দরকার। সাধুসঙ্গ বলতে যাঁরা সৎস্বরূপ নিত্য-সত্তা-ভগবানের নাম ক'রে, চিন্তা করে ও আরাধনা করে—তাঁদের সঙ্গ। ঈশ্বরের ধ্যান-চিন্তা করার জন্য সাধুরা ঈশ্বরের কাছে-কাছেই থাকেন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গ করলে বা তাঁদের সংস্পর্শে এলে ঈশ্বরের প্রসঙ্গই শোনা যায়, সুতরাং সৎস্বরূপ ঈশ্বর বা ভগবানেরই স্পর্শ ও ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সংসারী-মানুষের সঙ্গ করলে কেবল সংসারের প্রসঙ্গ ও সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা আসে, সুতরাং শান্তি নাই, সুখ নাই ও সত্যবোধের আনন্দ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এজন্য সাধুসঙ্গ করার জন্য বলেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে অসাধুসঙ্গ বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ জ্ঞান-অজ্ঞানের প্রসঙ্গে একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। গল্পটি হলো এই—

গুরু শিষ্যকে একথা বুঝাচ্ছিলেন: 'ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়'। শিষ্য বলে: 'আজ্ঞে, মা, পরিবার (স্ত্রী) এরা তো খুব যত্ন করেন, (আমার) না দেখলে অন্ধকার দেখেন, কত ভালবাসেন'। গুরু বলেন: 'ও তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি—কেউ তোমার (আপনার) নয়'। এই ব'লে শিষ্যকে একটি ঔষধের বড়ি দিয়ে বলেন: 'এটা খাবে ও খেলেই তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। তবে তোমার বাইরের জ্ঞান থাকবে, কেউ কিছু বলে তুমি শুনতে পাবে'। শিষ্যটি তাই করলো। গুরুর কাছ থেকে ঔষধের বড়িটি নিয়ে বাড়ী গিয়ে খেয়ে সে শুয়ে থাকলো। নড়েচড়ে না। ওঠেও না বহুক্ষণ। মা, পরিবার (স্ত্রী) সকলে ও আত্মীয়জন সকলে বহুক্ষণ নড়াচড়া না করার জন্য ভাবলে শিষ্য মারা গেছে। বাড়ীতে কান্নাগোল উঠ্‌লো। নিরুপায়, কি করবে ঠিক করতে পারলো না সকলে। এমন সময়ে গুরু কবিরাজের বেশে শিষ্যের বাড়ী গিয়ে হাজির। মা, পরিবার সকলে ব্যাকুল। কবিরাজকে ধরে বস্‌লো কোন একটা উপায় করার জন্য। গুরু (কবিরাজ) বলেন: 'ভয় নাই। আমার কাছে বাঁচার ঔষধ আছে, ঔষধ খেলে এখুনি বেঁচে উঠ্‌বে। তবে একটা কথা আছে'। সকলেই সশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—'কি কথা'? গুরুদেব গম্ভীর হয়ে বলেন: 'হ্যাঁ, আমার

কাছে দু'টি ঔষধের বড়ি আছে। ঐ দু'টির একটি তোমাদের কাউকে খেতে হবে, আর শিশু আর-একটি খাবে। কিন্তু তোমাদের যে ঐ বড়িটি খাবে, তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে, আর শিশুটি তৎক্ষণাৎ বেঁচে উঠ্‌বে'। গুরুদেবের কথা শুনে মা, পরিবার (স্ত্রী) এবং আরও সকলে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। মৃত্যু হওয়ার ভয়ে কেউ আর বড়ি খেতে রাজী হলো না। মা, পরিবার সকলেই বল্লে: 'হাঁগা, ওতো মরেছে, কিন্তু আমরা আবার ওষুধ খেয়ে মরি কেন'? সুতরাং কেউই আর ঔষধের বড়ি খেতে চাইলো না। শিশুটি শুয়ে শুয়ে সকলের কথাই শুন্‌লো ও সকল ব্যাপারই বুঝ্‌লো। তখন শিশু ধড়মড় ক'রে উঠে বল্‌লো: 'গুরুদেব, ঠিকই বলেছেন, কেউ কারু নয়, এক ঈশ্বরই আপনার জন (লোক)। শিশুর কাণ্ড দেখে সকলেই অবাক্। শিশুটি তখন উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গল্প-বলা ফুরুলো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সিঁথির বেদান্তবাগীশকে বল্লেন: "তাই তাঁর (ঈশ্বরের) পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়, যাতে তিনিই (ঈশ্বরকেই) 'আমার' (একান্ত নিজের) ব'লে (ঈশ্বরে) ভালবাসা হয়—তাই করাই ভাল। সংসার দেখেছো—দু'দিনের জন্য। আর এতে কিছুই নাই"। কিন্তু এ'সকল কথা শোনে কে? মানুষ বুঝেও বোঝে না,—এমনি মায়ার মোহিনীশক্তি। অঘটনঘটনপটিয়সী মায়া। যা কোনদিন কিছু ঘটে না, তাও মায়ার প্রভাবে ঘটে যায়। মানুষের মন আছে, বুদ্ধি আছে, বোধি বা বোঝার যথার্থজ্ঞান আছে, কিন্তু মায়ার মোহিনীখেলা কোনটাই মানুষকে বুঝতে দেয় না। এটাই সংস্কারের প্রভাব। বদ্ধসংস্কার ও সংসার। সংস্কারই মায়া। তাই সংস্কারের পারে যেতে হয়। সংস্কার বন্ধন,—সকল কাজেই বাধা সৃষ্টি করে। তাই বন্ধনের পারে না গেলে সংস্কাররূপ মায়ার অতীত হওয়া যায় না; অতীত না হ'লে ঈশ্বরদর্শন হয় না, আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি হয় না।

এরপর আলোচনার শিরোনামা হলো—"গৃহস্থ সর্ব ত্যাগ (করতে) পারে না। জ্ঞান অন্তঃপুরে যায় না—ভক্তি যেতে পারে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪১)।

পণ্ডিত অর্থাৎ সিঁথির বেদান্তবাগীশ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা শুনে স্তব্ধ ও ভাবমুগ্ধ। তিনি সহাস্যে বল্লেন: "আজ্ঞে, এখানে (আপনার কাছে) এলে সে'দিন পূর্ণবৈরাগ্য হয়। ইচ্ছা করে—সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাই"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের কথা শুনে হেসে সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন: "না, (সংসার) ত্যাগ করবে কেন? আপনারা মনে ত্যাগ কর। সংসারে (আসক্তি মানে বন্ধন, তাই) অনাসক্ত হয়ে থাকো"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের মুখে ক্ষণিক-বৈরাগ্যের কথা শুনে অন্তভাবে পণ্ডিতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বল্লেন: "না, (সংসার) ত্যাগ করবে কেন?" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরের অভিপ্রায় হলো পণ্ডিতকে শিক্ষা দেওয়া যে, সংসারও ঈশ্বর-ছাড়া নয়। ঈশ্বর তো সর্বত্রই বিদ্যমান, সুতরাং সংসার ত্যাগ করার কোন সার্থকতা নাই। তাছাড়া গৃহস্থ যারা—অর্থাৎ সংসারকে যারা জীবনের সার মনে ক'রে ঈশ্বরকে ডাকে না বা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয় না, তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে অসারই ভাবে। অসার কিনা অবাস্তব ও অবাস্তব, আর

কামনা-বাসনার সংসার বাস্তব। আবার বাস্তব বলতে নিত্য, আর অবাস্তব বলতে অনিত্য। কিন্তু একথাও ঠিক নয়। এ'দিক থেকে ঈশ্বরই একমাত্র বাস্তব বা নিত্য এবং জীবনের লক্ষ্য ও সারবস্তু, এবং ঈশ্বর-ছাড়া আর সকল বস্তু অবাস্তব ও অনিত্য। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মকেই একমাত্র বস্তু ও অন্য-সকলকে অবস্তু বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝেছিলেন যে, পণ্ডিতের যথার্থজ্ঞান হয় নি। তাই ক্ষণিক-বৈরাগ্যের ভাবাবেগে বলেছে 'এখানে (আপনার কাছে) এলে সে'দিন পূর্ণ-বৈরাগ্য হয়'। পূর্ণ বা তীব্র-বৈরাগ্যের লক্ষণ কিন্তু এই নয় যে, একটা কোন ভাবের উদ্দীপনায় ক্ষণিকের জন্য ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভাব মনে আসে, আবার কিছুক্ষণ পরে সেই ভাব চলে যায়। বৈরাগ্যের অপর নাম 'বিরজ'-ভাব (বি = বিগত + রজ = কামনা-বাসনার মালিন্যরাহিত্য)। সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের পূর্বে বোধানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে বিরজাহোম করেন সকল 'রজ' বা মালিন্যরূপ বাসনা-কামনার পারে যাওয়ার জন্য।[১] তাই সংসারত্যাগ করার কোন অর্থ ও সার্থকতাই থাকে না—যদি না মন পরিশুদ্ধ (চিত্তশুদ্ধ) হয়। মনের পরিশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি হলো মন থেকে সংকল্প-বিকল্প-রূপ বৃত্তি লোপ পেয়ে মন শান্ত বা বৃত্তিহীন হওয়া। মনের নাশ বা মনের লোপ হওয়ার অর্থ মন প্রশান্ত হয়ে শুদ্ধচৈতন্যসাগরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। তাই চিত্তশুদ্ধির অর্থ মনকে চৈতন্যে রূপান্তরিত করা। মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হলেই তখন চৈতন্যের সঙ্গে পরমচৈতন্যরূপ ব্রহ্মের মিলন হয়। এই মিলনের অর্থ এক (অভেদজ্ঞান) হওয়া, কেননা পরমসত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতকে তাই বলেন: "না, (সংসার) ত্যাগ করতে হবে কেন? আপনারা মনে ত্যাগ করো। সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকো"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একেবারে পাড়াগাঁয়ের ভাষা 'তোমরা'-র পরিবর্তে 'আপনারা'-শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই সাদাসিদে সরল-স্বচ্ছন্দ-পল্লীগ্রামের ভাষায় 'তুমি' ও 'আপনি'-র মধ্যে কোন ভেদের দূরত্ব থাকে না। এখানে 'ন'-ব্যবহারেরও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। 'আপনি করুন'-এর জায়গায় 'আপনি কর'-শব্দ-ব্যবহারেরই মর্যাদা বেশী।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'মনে' ত্যাগ করতে বলেছেন। শ্রীরামপ্রসাদও বলেছেন: 'বাসনায় দে আগুন জেলে, কায় হবে তায় পরিপাটী'। এখানে বাসনায় সাধারণ অর্থ কলার পেটো, অর্থাৎ কলাগাছের গায়ের খোলা হলেও 'মন' এর সত্যকারের অর্থ। বাসনা নির্বাসনা হয় মনের চাঞ্চল্যরূপ সংকল্প-বিকল্পরূপ বৃত্তির (সংস্কারের) নাশ (অভাব) হ'লে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৃহবাসী গৃহস্থ বা সংসারী-মানুষদের তাই সংসারে থেকেই নির্লিপ্তভাবে সকল কাজ করতে বলেছেন এবং কাজের পূর্বে ঈশ্বরকে সকল-কিছুর—সকল কর্মের কারণ ও কর্তারূপে চিন্তা করতে বলেছেন। কর্মযোগের মর্মকথাই তাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন 'কর্মেই' অর্থাৎ কাজ করাতেই তোমার (মানুষের) অধিকার, ফলে নয়'—'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। 'অনাসক্ত'-কথার অর্থ তাই। কাজের সংসারে একমাত্র ঈশ্বরকেই সর্বকর্মের কর্তা ভেবে

১। 'সংন্যস্তম্ ময়া'—'আমি সন্ন্যাসরূপে তিন লোকের ভোগবাসনা ত্যাগ করলাম'—এটি বিরজ বা বৈরাগ্যযজ্ঞের নিদর্শন।

কাজ করতে বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, কাজ পরিত্যাগ করতে বলেন নি, কেননা কাজের সংসারে কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে কাজ না ক'রে নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকার নাম মিথ্যাচার; ইংরাজীতে বলে হিপোক্রিট।[২]

এরপর সুরেন্দ্রের কথা উত্থাপন ক'রে (সুরেন্দ্রের কথার নিদর্শন দিয়ে) প্রকারান্তরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন সকল কাজের পূর্বে মন ও মুখ—কথায় ও কাজে ঐক্যভাব রাখার কথা। সুরেন্দ্র মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করার জন্য বালিশ-বিছানা এনে রেখেছিলেন, কিন্তু একদিন-মাত্র শোওয়ার জন্য এসে শেষে তাঁর 'পরিবার' বা স্ত্রীর কথায় সেই বাসনা ত্যাগ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গুরু ও শিষ্যের গল্প বলার পর সিঁথির পণ্ডিতকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রাখার কথাও বলেছিলেন। বলেছিলেন: "তাই তাঁর (ঈশ্বরের) পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়,—যাতে তিনিই (ঈশ্বরই) 'আমার' (নিজের) ব'লে ভালবাসা হয়—তাই করা ভাল"। বিশেষ ক'রে সংসারী-গৃহস্থদের পক্ষে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা রাখা উচিত। ভক্তি থাকলেই ভালবাসা আসে। তবে একথা ঠিক যে, 'আপনার' বা 'নিজের' বোধ ও ভাব সৃষ্টি না হ'লে ঠিকঠিক (যথার্থ) ভালবাসা আসে না। কিন্তু অপরকে নিজের ব'লে ভাবা বা চিন্তা করা কি সোজা-কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "শুধু-বিচার করলে কি হবে?—তাঁর (ঈশ্বরের) জন্য ব্যাকুল হও। তাঁকে (ঈশ্বরকে) ভালবাসতে শেখ। জ্ঞান—(জ্ঞান-বিচার) পুরুষ-মানুষ, বাড়ির বারবাড়ি-পর্যন্ত যায়; ভক্তি—মেয়ে-মানুষ—অন্তঃপুর-পর্যন্ত যায়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪২)।

জ্ঞান—"বিচার পুরুষ-মানুষ ও ভক্তি—মেয়ে-মানুষ" বলার অর্থ ভক্তি দিয়ে ভগবানকে সহজে পাওয়া যায়, আর জ্ঞান বা বিচার দিয়ে পাওয়া যায় বিলম্বে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই জ্ঞানের (বিচারের) জন্য নির্দিষ্ট করেছেন বাড়ির 'বার-বাড়ি' এবং ভক্তির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন 'অন্তঃপুর'। একথা অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধারণভাবেই বলেছেন, কেননা জ্ঞানপথ শুষ্কবিচারের পথ,—বুদ্ধির সাহায্যে বোঝিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ। কিন্তু সরল-স্নিগ্ধ-ভক্তির পথে সহজেই মানুষ ইচ্ছা করলে যেতে পারে। সেজন্য তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন: "শুধু-বিচার করলে কি হবে? তাঁর জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য, বা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-উপলব্ধির জন্য "ব্যাকুল হও: তাঁকে ভালবাসতে শেখ"। ব্যাকুল হওয়ার অর্থ মুমুক্ষুত্ব—মুক্তির ইচ্ছা। মুমুক্ষুত্ব অন্তরে প্রবল না হ'লে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয় না।[৩] ঋষি পতঞ্জলি এজন্য স্পষ্টই বলেছেন: 'তীব্র-সংবেগানামাসন্নঃ' (১।২১)। সংবেগ বা ঈশ্বরকে (মুক্তি) লাভের ইচ্ছা প্রবল না হ'লে অতিশীঘ্র (সহজে) মুক্তি পাওয়া যায় না। এজন্য আচার্যপাদ ব্যাস তাঁকে মৃদু-মধ্য-অধিক এই তিন

২। গীতার কথা উদ্ধৃত ক'রে বলি—
(১) 'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ' ৩।১৯
(২) 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে' ৩।২৭

৩। গীতার (৭।১৬) আছে: "আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ"—এখানে জিজ্ঞাসু অর্থে আত্মজ্ঞানলাভের জিজ্ঞাসু বা আত্মজ্ঞানেচ্ছু। একথায় মুমুক্ষু।

রকমের ইচ্ছার (সংবেগের) কথা বলেছেন : '…যোগিনঃ মৃদুমধ্যাধিকমাত্রোপায়াঃ ভবন্তি, তৎ যথা মৃদূপায়ঃ মধ্যোপায়ঃ অধিকমাত্রোপায়ঃ ইতি'। অর্থাৎ 'ত্রিবিধঃ মৃদুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগঃ ইতি'। সমাধি, ঈশ্বরজ্ঞান, মুক্তিলাভ প্রভৃতির জন্য তীব্রসংবেগ বা প্রবল ইচ্ছার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : যেমন একটা মানুষকে জলে ডুবিয়ে ধরলে সে উপরে ওঠার জন্য ছটপট করে, তেমনি ঈশ্বরলাভের জন্য সাধককে প্রবল ইচ্ছাযুক্ত (ব্যাকুল) হতে হয়। তাছাড়া ঋষি পতঞ্জলি ১।২৩ সূত্রে বলেছেন : 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা',—ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করলে অচিরাৎ বা শীঘ্র শীঘ্র মুক্তিলাভ হয়। তাতে আচার্য ব্যাস বলেছেন : 'প্রণিধানাৎ ভক্তিবিশেষাৎ…আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি'। যোগে সমাধি ও বেদান্তে নিদিধ্যাসন। এজন্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধিলাভের জন্য তীব্র-ইচ্ছার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "তাঁর জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে ভালবাসতে শেখ"। ব্যাকুল হওয়ার নাম তীব্রসংবেগ। তীব্রসংবেগ বলতে প্রবল ও একান্ত ইচ্ছা হলেই অন্তরে অনুরাগ জাগে। এই অনন্য-অনুরাগের নাম ভালবাসা। ভালবাসা আসে অনুরাগ ও ভক্তি থেকে। নারদীয়ভক্তিসূত্রে ও শাণ্ডিল্যসূত্রে ঋষি নারদ ও শাণ্ডিল্য দু'জনেই ঈশ্বরে একান্ত অনুরক্তি থেকে ভক্তি ও ভালবাসার সৃষ্টির কথা বলেছেন।[৪] ভক্তি ও ভালবাসায় ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সম্পর্ককে অবিচ্ছেদ্য নিবিড় করে ও নিকট করে। এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তকে (সাধককে) একটি 'ভাব'-কে আশ্রয় করতে বলেছেন। ভাব কিনা দাসভাব, শান্তভাব, বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব, মধুরভাব প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "একটা কোনরকম ভাব আশ্রয় করতে হয়। তবে ঈশ্বর লাভ হয়"। সনকাদি ঋষিরা শান্তরস নিয়ে ছিলেন। শান্তরসের ভাব 'শম' বা প্রশান্তি। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারাদি আটটি রস স্বীকার করেছেন—

'শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ রসাঃ স্মৃতাঃ।—নাট্যশাস্ত্র ৬।১৫

আচার্য ভরত বলেছেন : 'ভাবেভ্যো রসানামিতি'। ভাব রসের সৃষ্টি করে। 'তন্নাষ্টৌ ভাবাঃ স্থায়িনঃ…' প্রভৃতি। অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আচার্যরা শান্তরস ও তার ভাব শম বা প্রশান্তির উল্লেখ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "হনুমান দাসভাব নিয়েছিলেন। শ্রীদাম, সুদাম, ব্রজের রাখালদের সখ্য বা সখী-ভাব। যশোদার বাৎসল্যভাব—ঈশ্বরেতে সন্তানবুদ্ধি। শ্রীমতীর (শ্রীরাধার) মধুরভাব"। বাৎসল্যভাব ও মধুরভাব মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্বীকার করেন নি। বৈষ্ণবশাস্ত্রীরা বাৎসল্য ও মধুর রস ও ভাব স্বীকার করেছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে বাৎসল্য ও মধুর-রসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "হে ঈশ্বর, তুমি প্রভু, আমি দাস—এ'ভাবটির নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ'ভাবটি খুব ভাল" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪২)।

●

৪। ভক্তিসূত্রে ঋষি নারদ 'ভক্তি'-সম্পর্কে বলেছেন : 'অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ'। 'সা (ভক্তি) ত্বস্মিন্ পরম (ম) প্রেমরূপা'। এই প্রেম অনির্বচনীয়—'অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্'। তাছাড়া এই প্রেম (একান্তিক অনুরক্তি) উপলব্ধির স্বরূপ—'মূকাস্বাদনবৎ'। সেজন্যই প্রেম ও মুক্তি অনির্বচনীয়।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ॥

স্বামী প্রভানন্দ

ঈশ-প্রাণিত শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি জ্ঞানী-মানী লোকদের দেখবার জন্য সর্বদাই ব্যগ্র হতেন; এবং সে-সকল ব্যক্তির মধ্যে ঈশ-শক্তির বিচিত্র বিস্ফুরণ দেখে তিনি আনন্দলাভ করতেন। তিনি বলতেন: যাকে দশে মানে-গণে, তাতে অধিক শক্তির বিকাশ; সেইখানেই ঈশ্বরের অধিক কৃপা। একবার তাঁর সাধ হ'ল তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখবেন। তখনকার কলকাতার প্রধান দ্রষ্টব্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাছাড়া, তিনি প্রায় বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছেন বিদ্যাসাগরের যশ-গাথা। লোকে বলত তিনি গুণনিধি, তিনি বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত মহেন্দ্রনাথকে বলেন তাঁর অভিলাষ। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন স্কুলের শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চের প্রধান শিক্ষক। স্কুলটি তখন ১০০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে। মহেন্দ্রের চেষ্টায় সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়, দিন স্থির হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর এই দুই মহাত্মার সাক্ষাৎ ঘটেছিল বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে। দিনটি ছিল ৪ই আগষ্ট ১৮৮২; শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি। দুজনের মধ্যে প্রায় পাঁচ-ঘণ্টা ধরে কথাবার্তা চলেছিল। রসাল প্রজ্ঞাঘন মধুর সংলাপ। সমগ্র কথামৃতের মধ্যে একটি বিরল অত্যুত্তম অংশ। এই সংলাপ বাংলা সাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ। শ্রীম'র সাহিত্যপ্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ ফসলও বটে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণই কথা বলে চলেছিলেন; আর বিদ্যাসাগর মুগ্ধ প্রশান্তি নিয়ে শুনছিলেন, কদাচিৎ সামান্য কথা বলছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীর সঙ্গে সুপরিচিত পাঠকমাত্রেই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেন এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা—বিদ্যাসাগর চুপ করে শুনছেন, আর তাঁর চাইতে বয়সে অনেক ছোট একজন কথা বলেই চলেছেন; কথা তো নয়, যেন কথার ঢল নেমেছিল। কথামৃতের পাঠক এই সাক্ষাৎকারটি বারংবার পড়েন, তার মধ্যে নিত্য নূতন রসাস্বাদন করে থাকেন। এই বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের শতবর্ষপূর্তি স্মরণ করে বই বেরুচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় লেখা বেরুচ্ছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সাক্ষাতের কয়েকদিন পরে, ৬ই সেপ্টেম্বরের New Dispensation পত্রিকায়। 'Two Great Minds' শিরোনামায় শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাতের প্রারম্ভিক বাক্যালাপটুকু প্রকাশিত হয়েছিল। আশ্চর্যান্বিত হয়ে লক্ষ্য করি শ্রীম'ও প্রথম দিকে এই সাক্ষাতের বিবরণী সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করেছিলেন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) রচনাটি "ক্রমশঃ" দিয়ে সমাপ্ত হলেও অবশিষ্টাংশ ঐ পত্রিকায় আমাদের চোখে পড়েনি। কিন্তু ঐ রচনাটি ঐ পত্রিকার ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। প্রায় হুবহু এক রচনাই এর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল 'উদ্বোধন' পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যায় (১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬)। পরবর্তীকালে শ্রীম অপ্রকাশিত অংশের বাকীটুকু ও প্রকাশিত অংশটির বিস্তার করে প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমান 'কথামৃতের' তৃতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ডের সাতটি পরিচ্ছেদ জুড়ে রয়েছে এই রচনাটি।

শনিবার। বিকালের পরও রোদের মধ্যে একটি গাড়ী—ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী চলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ চলেছিলেন বিদ্যাসাগরকে দর্শন করতে। গাড়ীতে যাত্রী শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও প্রতাপচন্দ্র হাজরা। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর থেকে রওয়ানা হয়ে, বাগবাজারের পুল পেরিয়ে শ্যামবাজার দিয়ে চলেছে। পথে এক জায়গায় ভীড় জমেছিল। বেশ কয়েকটি গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ী মিলে রাস্তা জ্যাম্। শিশুর স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণের। গাড়ী থেমে যেতেই তিনি বাইরে তাকিয়ে দেখেন। তাঁর নজরে পড়ে, পাশের একটি গাড়ীর আরোহী তার মোজা পরা পা-খানা নেড়ে-চেড়ে খুব দেখছে। মোজা পরলে তার পা দু'খানি এত সুন্দর দেখায় লোকটি বোধ করি সদ্য আবিষ্কার করেছে। লোকটির আচরণ ভবনাথের চোখেও পড়ে। ভবনাথ বলেন: মশায়, এ লোকটা বোধ হয় জন্মে কখনও মোজা পরে নি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: আহা মা। এর ভোগ হয় নি মা, এ ভোগ করে নিগ মা, একে ভোগ করতে দে মা।[১]

গাড়ী আরও এগিয়ে চলে। শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করতে করতে চলেছিলেন। বাদুরবাগানের কাছাকাছি পৌঁছতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে আপনা-আপনি বলতে শোনা গেল: মা। বিদ্যাসাগরকে দেখতে যাচ্ছি মা, আমার কিন্তু বিদ্যে নেই মা, লেখাপড়া কিছুই জানি না মা।[২] শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরূপ আচরণ অন্যত্রও, বিশেষতঃ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের পূর্বক্ষণেও দেখা গিয়েছিল। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে গাড়ী পড়তে না পড়তেই ঠাকুরের ভাবান্তর দেখা গেল। তিনি ভাবসাগরে ডুব দিলেন, তাঁর সত্তায় পরিস্ফুট হয়ে উঠল ঈশ্বরাবেশ। মাষ্টারমশায় ঠাকুরের ভাবান্তর খেয়াল করেন নি। রাজা রামমোহন রায়ের বাগানবাড়ীর কাছ দিয়ে গাড়ী চলেছিল, মাষ্টারমশায় বলে ওঠেন: এইটি রামমোহন রায়ের বাটী। একথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হন, বলেন: এখন ও-সব কথা ভাল লাগছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভাবাবিষ্ট হন। ক্রমে গাড়ী এসে দাঁড়ায় বিদ্যাসাগরের বাড়ীর সামনে।

"গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ীর পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি বাড়ীর দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল-গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ। পশ্চিমদিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে হলঘর। ঘরের দক্ষিণপূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তকে পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতি সুন্দররূপে বাঁধান বইগুলি সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও

১। গুরুদাস বর্মন: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ৩১২ (লেখক ভবনাথ-সূত্রে এই তথ্য পেয়েছিলেন।)
২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃ: ৩১২

টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধান হিসাবপত্রের খাতা, দু'চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্যপুস্তক রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট-বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।"[৩]

ভবনাথ ঠাকুরের হাত ধরে গাড়ী থেকে নামান। ঠাকুরের গায়ে একটি লম্বা কুর্তার জামা, পরনে সরু লালপেড়ে ধুতি, কোঁচার খুঁটটি কাঁধে ফেলা, পায়ে বার্নিশ-করা চটিজুতো। উঠানে ফুলগাছের মধ্য দিয়ে পথ, মাষ্টারমশায় পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলেন। চলতে চলতে ঠাকুর জামার বোতামে হাত দিয়ে মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন: জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কিছু দোষ হবে না? মাষ্টারমশায় তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন: আপনি ওর জন্য ভাববেন না, আপনার কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।

বাগান পেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠেন, উত্তরের ঘরটিতে প্রবেশ করেন। ঘরে বিদ্যাসাগর দক্ষিণমুখো হয়ে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে একটা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের পূর্বধারে একটা হেলান-দেওয়া বেঞ্চ, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশে কয়েকখানা চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে একজন ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়, তিনি বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরির সত্বাধিকারী[৪] হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে প্রবেশ করতেই বিদ্যাসাগর দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে অভ্যর্থনা করেন, বলেন: আসতে আজ্ঞা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ টেবিলের পূর্বপাশ ঘেঁসে দাঁড়ান। তাঁর বামহাত টেবিলের উপরে, তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি বিদ্যাসাগরের মুখের উপর। তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে পূর্ণ, ভাবে বিভোর হয়ে মাঝে মাঝে হাসছেন। তিনি 'ক্রমে ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও গভীর ভাবসমাধিতে মগ্ন হইলেন'।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ছেচল্লিশ, আর বিদ্যাসাগরের বাষট্টি। বিদ্যাসাগরের পরনে থান ধুতি, পায়ে চটিজুতো, গায়ে একটি হাতকাটা ফ্লানেলের জামা, গলায় পৈতে। মাথায় চারপাশ কামানো। বাঁধান দাঁত। উন্নত ললাট। মাষ্টারমশায় ছিলেন বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ।

৩। কথামৃত ৩।১।১

৪। নিজের লেখা বইগুলি, তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতযন্ত্র ও সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি ছিল বিদ্যাসাগরের অর্থ-সংগতির প্রধান অবলম্বন। মধুসূদনের ঋণদায় থেকে মুক্ত হবার জন্য বিদ্যাসাগর ছাপাখানার এক-তৃতীয়াংশ বিক্রয় করেছিলেন। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারির কাজ তিনি নিজে দেখাশুনা করতেন না। সেখানে নানাপ্রকারের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বিদ্যাসাগর ডিপজিটারির সত্ব ত্যাগ করবার সংকল্প করেন। তাঁর 'পরমাত্মীয়' 'সুহৃদ' কুরুলপরনিবাসী ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রার্থনাতে তিনি তাঁকে এই ডিপজিটারির সত্বদান করেছিলেন। মাতৃভক্ত ব্রজবাবুর জননী মারা গেলে তাঁকে পরম সান্ত্বনা দিয়ে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর একটি মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছিলেন। ব্রজবাবু চিঠিখানিকে মনে করতেন একটি মূল্যবান উপহার।

৫। তত্ত্বমঞ্জরী, ৫ম বর্ষ, ৭ম সং, পৃঃ ১৬৮

বিদ্যাসাগরের বিদ্যানুরাগ, সর্বজীবে দয়া, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, লোকোপেক্ষার ভাব, মাতৃভক্তি ও মনের বল—এই পাঁচটি গুণ মাষ্টারমশায়ের মূল্যায়নে বিদ্যাসাগর চরিত্রের শ্রেষ্ঠাংশ। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে মাষ্টারমশায় প্রাথমিক মূল্যায়ন করে বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচটি গুণ—জ্ঞান, প্রেমভক্তি, বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও উদারভাব তিনি কখনো অপর কা'রও মধ্যে এই পরিমাণে দেখেন নি।

শুধু মাষ্টারমশায়ের মূল্যায়নে নয়, যে কোন নিরিখে বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ মহামানব। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখেছিলেন: বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।[৬] এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতেন বিদ্যাসাগরকে। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ অতুলনীয়। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব অহেতুকী দয়া, সে intense sympathy বদ্ধজীবের জন্য—এ জগতে আর নাই।[৭] এই দুই মহামানব আজ পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন।

ঠাকুর যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন তার পিছনেই হেলান-দেওয়া বেঞ্চ। তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে বেঞ্চের উপর বসতে যাচ্ছেন, তাঁর দৃষ্টি পড়ে বেঞ্চে-বসা একটি সতেরো-আঠারো বছরের যুবকের উপর। যুবক এসেছিল বিদ্যাসাগরের কাছে লেখাপড়ার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে। ঠাকুর একটু সরে বসেন ও ভাবে বলেন: মা। এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।

ঠাকুর মাঝে মাঝেই ভাবের গভীরে ডুব দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর লোকজন, আত্মীয় বন্ধু সকলে এসে জমায়েত হয়েছেন। একঘর লোক, কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বিদ্যাসাগরকে বলেন: আজ আমার খুব দিন, আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।

উপস্থিত সকলেই হেসে ওঠে।

রসিক বিদ্যাসাগর বলেন: তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: না গো। নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। (সকলে হেসে ওঠে) তুমি ক্ষীরসমুদ্র। (আবার হাসি)।

বিদ্যাসাগর বিনীতভাবে বলেন: তা বলতে পারেন বটে।

বিদ্যাসাগর এবার হুঁকা নিয়ে ধূমপান করতে থাকেন। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলতে চান, বাধা পান। বাধা তাঁর ভিতরকার ভাবের প্লাবন। ভাব সামলাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: তামুক খাব, তামুক খাব।

৬। রবীন্দ্রনাথ: বিদ্যাসাগরচরিত, পৃঃ ১২

৭। পত্রাবলী, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩৯

বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের হুঁকাটি এগিয়ে ধরেন। ঠাকুর বলেন: না কারুর হুঁকোয় খাই নি; তুমি কলকেটা দাও।

বিদ্যাসাগর বলেন: যদি কারুর হুঁকোয় খান না তো কলকেটা বা কেন? আমি নূতন হুঁকো-কলকে আনিয়ে দিচ্ছি।

বিদ্যাসাগরের আদেশে একজন একটি নূতন হুঁকোতে তামাক নিয়ে হাজির হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ধরে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই মুহূর্তে গভীর ভাবস্থ। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি হুঁকোতে টান দেন। বারকয়েক টান দিয়ে আর টানতে পারেন না। তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে, তিনি বলেন: একটু জল খাবো।

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে মহেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেন: কিছু খাবার আনলে উনি খাবেন কি?

মহেন্দ্রনাথ বলেন: আজ্ঞা আছে না।

বিদ্যাসাগর তাঁর একটি দৌহিত্রকে জলমিষ্টি আনতে আদেশ করলেন। কিন্তু তার আনতে বিলম্ব দেখে তিনি নিজে ব্যস্তভাবে অন্দরমহলে যান, একটি রেকাবিতে চারটি মিঠাই ও একগ্লাস জল নিয়ে উপস্থিত হন[৮] এবং বলেন: এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীদের দেখিয়ে বলেন: এদের দাও।

বিদ্যাসাগর প্রত্যুত্তরে বলেন: আপনি আগে গ্রহণ করুন, এদের দিচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য মিষ্টি গ্রহণ করেন, জলপান করেন। হাজরামশায় ও ভবনাথ কিছু মিষ্টি গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রকে দিতে গেলে বিদ্যাসাগর বললেন: ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না।[১০]

অতঃপর কথামৃত-সূত্রে পাই: ঠাকুর একটি ভক্তছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন: এ ছেলেটি বেশ সৎ; আর অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়।' আমরা মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী-সূত্রে জানতে পারি এই 'ছোকরাটি' মাষ্টারমশায় স্বয়ং।

৮। শ্রীম'র আদি রচনাতে এই বিবরণ কিছুটা ভিন্ন। পূর্বে তিনি লিখেছিলেন: বিদ্যাসাগর ভক্তদের বলিলেন, 'বর্ধমান থেকে মিঠাই আসিয়াছে, উনি কি খাবেন?' ভক্তেরা কোন আপত্তি না করাতে তিনি বাড়ীর ভিতর হইতে মিঠাই নিজে আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিলেন। পরমহংসদেব জগন্মাতাকে নিবেদন করিয়া কিছু মুখে দিবার পর বিদ্যাসাগর ভক্তদের খাইতে অনুরোধ করিলেন।' (তত্ত্বমঞ্জরী ৫ম বর্ষ, ৭ম সং, পৃঃ ১৪৮)

৯। 'পরমহংসদেব যে সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া আসন গ্রহণ করেন, সেই সময় বর্ধমান হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন আত্মীয় মধু এক হাঁড়ি খাবার লইয়া আসেন।' (বিদ্যাসাগর-জীবনীকার: বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৪১৭)

১০। আমরা এ-পর্যন্ত ঘটনার ক্রম ও উপাদানের জন্য অনুসরণ করেছি মুখ্যতঃ গুরুদাস বর্মণের লেখা এবং প্রতাপচন্দ্র হাজরার প্রদত্ত বিবরণী, যা পরে ভবনাথ ও মাষ্টারমশায় দেখে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের অন্তরে প্রবেশেচ্ছু শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বিদ্যাসাগরের জীবনবীণার মূল একটি সূত্র আকর্ষণ করেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচর্যায় সাত্ত্বিক কর্মের প্রাধান্য। সবগুলি থেকে ধরা হয়। এরূপ ভূমিকা করে নিয়ে অন্তরদ্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবানলাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।

বিদ্যাসাগর : মহাশয়, কেমন করে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : আজ্ঞে, পটল সিদ্ধ হ'লে ও নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অন্ত দয়া (হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) : কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয় (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ : তুমি তা নও গো ; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

(ক্রমশঃ)

●

॥ ভজন ॥ (রাগ : ভৈরবী)

শ্রীঅমরশঙ্কর ভট্টাচার্য

জীবন জুড়াতে জপ রামকৃষ্ণ মধুনাম,
সুধামাখা সেই নামগানে করিছে শান্তি অবিরাম ॥
বিষয়ের জ্বালা জগত জুড়িয়া ভিলে ভিলে মারে দহিয়া দহিয়া,
সে জ্বালা মিটাতে, চেতনা জাগাতে সেই তো নিত্য শান্তিধাম ॥
যেই রাম, সেই কৃষ্ণ—এক দেহে হল শ্রীরামকৃষ্ণ,
তাপিত চিতে অমৃত ঢালিতে, পুরাতে মোদের মনস্কাম ॥
বিভেদের মাঝে মিলন সাধিতে, সব পথ শেষে পরমে মিলাতে,
অকূল আঁধারে সুপথ দেখাতে জাগ্রত যিনি দিবসযাম ॥

॥ গয়াধামে নরেন্দ্রনাথ ॥

শ্রীপরিমলকান্তি দাস

গয়াধাম বিহার প্রদেশের একটি শহর। ফল্গুনদীর তীরে হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুরা পিতৃপুরুষদের পারলৌকিক ক্রিয়া করতে এখানে আসেন। ভগবান শ্রীশ্রীবিষ্ণুর পদচিহ্ন-রক্ষিত 'বিষ্ণুপাদ মন্দির' গয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এছাড়া, আরও অনেকগুলি দেব-মাহাত্ম্যসমন্বিত স্থান আছে, যেগুলি পৌরাণিক কাহিনীতে মহিমান্বিত।

প্রায় ২,৫০০ (আড়াই হাজার) বছর পূর্বে, গয়া হ'তে প্রায় ছ' মাইল দক্ষিণে উরুবিল্ব গ্রামে (পরে বুদ্ধগয়া) এক বোধিবৃক্ষতলে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভ করেন এবং জগতে বুদ্ধদেব নামে খ্যাত হ'য়ে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী পাঠে জানা যায়, তাঁর জীবনে পরিবর্তন আসে গয়াধামে 'বিষ্ণুপাদ মন্দির' দর্শনের পর। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রূপান্তরিত হন।

আবার এই গয়াধামে পারলৌকিক ক্রিয়া করতে এসে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামনিবাসী দরিদ্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখেন যে স্বয়ং নারায়ণ পার্থিব লীলা ক'রতে তাঁর পুত্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। গয়া হ'তে কামারপুকুর গ্রামে ফিরে আসেন এবং কিছুদিন পরেই একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। পরবর্তীকালে এই পুত্র যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নামে জগতে বিখ্যাত হন।

এইসব কারণে পৌরাণিক কাহিনীর গুরুত্ব ছাড়া, অবতার পুরুষদের স্মৃতি-বিজড়িত গয়াতীর্থ হিন্দুদের কাছে এক পরম পবিত্র স্থান।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বুদ্ধগয়া দর্শনান্তে নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), গুরুভাই কালি (স্বামী অভেদানন্দ) ও তারকের (স্বামী শিবানন্দ) সঙ্গে গয়াতে এক সম্ভ্রান্ত বাঙালী উমেশবাবুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হচ্ছে নরেন্দ্রনাথ ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন্ যোগাযোগ সূত্রে পরিচিত হ'য়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ তখন স্বামী বিবেকানন্দরূপে বিখ্যাত হন নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। প্রেমময় ঠাকুর কথামৃতের অনন্ত ধারা ভক্ত ও জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করছেন। ভাবছেন, ক্ষণস্থায়ী জীবনে অনন্ত সত্যের বাণী আর্ত পৃথিবীতে পরিবেশন করে যাবেন। কিন্তু অনর্গল কথা বলার জন্যই বোধহয় গলরোগ হ'ল। রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক্তার চিকিৎসকের পরামর্শমত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কাশীপুরের উদ্যুক্ত উদ্যানবাটিতে রেখেছেন এবং পর্য্যায়ক্রমে উদ্যানবাটিতে অবস্থান করে ঠাকুরকে সেবা করছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। নরেন্দ্রনাথ প্রবল বৈরাগ্যে উদ্দীপ্ত হ'য়ে বোধিলাভের জন্য বুদ্ধগয়া যাওয়া স্থির করলেন এবং গুরুভাই কালি (স্বামী অভেদানন্দ) ও তারককে (স্বামী শিবানন্দ) সঙ্গে করে হঠাৎ বুদ্ধগয়া চলে গেলেন; কাশীপুর থেকে নৌকাযোগে বালি এবং সেখান হতে রেলযোগে গয়া। গয়াধাম দর্শন করে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হলেন।

মন্দির মধ্যে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের পর তিনজনেই ধ্যান করলেন। পরে মন্দিরের পিছনে বোধিবৃক্ষতলেও ধ্যান করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের এক অপূর্ব জ্যোতিঃ দর্শন হ'য়েছিল। তিন গুরুভাই নিরঞ্জনা নদীতে স্নান সেরে মাধুকরী করে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেন। এইসময় রাত্তে নরেন্দ্রনাথের পেটে যন্ত্রণা হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রার্থনা করায় যন্ত্রণার উপশম হয়। ক'লকাতায় ফিরে আসার পথের না থাকায় মঠের মহান্তের কাছে সাহায্য নিয়ে গয়ায় আসেন। গয়াধামে উমেশবাবু নামে এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে (৩।২৪।১) মাষ্টারমশাই লিখছেন,—"শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কাশীপুরের বাগানে আছেন। আজ শুক্রবার বেলা ৪টা, চৈত্র শুক্লা-পঞ্চমী। ১ই এপ্রিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ।"

• • •

"নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বুদ্ধমূর্তি দর্শন করিয়াছেন এবং সেই মূর্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। যে-বৃক্ষের নীচে বুদ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি নূতন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। কালী বলিলেন,—"একদিন গয়ায় উমেশবাবুর বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ গান গাহিতেছিলেন,—মৃদঙ্গ সঙ্গে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন কথা'য় (পৃঃ ১১২) লিখছেন,—"গয়াধামে বাঙ্গালী ভদ্রলোক উমেশবাবুর বাড়ীতে অতিথি হইলাম। সেখানে সন্ধ্যার পর নরেন্দ্রনাথ আবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজন গান করিল। তথায় অপূর্ব সঙ্গীত পরিবেশনে সকলে মুগ্ধ হইলেন। উমেশবাবু আমাদের বিশেষ যত্ন করিয়া রাত্রে থাকিবার স্থান দিলেন। পরদিন প্রাতে রেলে চড়িয়া আমরা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম ও পরদিন সন্ধ্যার সময় কাশীপুরের বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম।"

উপরিউক্ত দুটি গ্রন্থেই উমেশবাবুর প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে এবং নরেন্দ্রনাথের গুরুভাইদের সাথে ঐ গৃহে পদার্পনের সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে উমেশবাবুর পরিচয়ের মূল সূত্র-সন্ধানে পাঠকেরা অবশ্যই আগ্রহান্বিত। এই প্রবন্ধে ভাগ্যবান উমেশবাবুর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের পরিচয়ের মূল সূত্র প্রকাশের পূর্বে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার (১৮৩৭—১৮৯২) দক্ষিণ ক'লকাতায় ভবানীপুরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান—পিতা রামলাল ও মাতা বামাসুন্দরীর জ্যেষ্ঠপুত্র। জন্ম ও শিক্ষা ক'লকাতায়। শৈশবে উমেশচন্দ্রের মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। সেজন্য পিতা তাঁর শিক্ষালাভের প্রতি যত্নবান ছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আইন পাশ করেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য তিনি ওকালতি সুরু করেন। ধীরে ধীরে প্র্যাকটিস জমে উঠে এবং চারিদিকে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

Sri Umesh Ch. Sarkar,
B.A. B.L. Vakil High Court (Calcutta)
Senior Govt. Pleader, Hony. Magistrate
Municipal Commissioner and
Zaminder, Gaya.

Born— 7th Dec. 1837 } 55 years old.
Demise—7th May 1892 }

শিক্ষিত উমেশচন্দ্র সেই সময় বিদ্বৎ সমাজে এক পরিচিত ব্যক্তি। সেইসময় ব্রাহ্মধর্মের প্রবল প্রভাবে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এবং নব্য বাঙ্গালার যুবকেরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। উমেশচন্দ্রও এই প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ক'রতেন। কোন কোন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে তিনি যুবক নরেন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন এবং তার গান শুনে মুগ্ধ হন। এই প্রসঙ্গে পরিচয় হয়। তবে পরবর্তীকালে আর এক ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। সেই ঘটনার কথা পরে উল্লেখ করছি।

ইংরাজ আমলের সেইকালে ভারতবর্ষ কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল যথা পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি। পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ছিল বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা আসাম প্রভৃতি। সেইসময় বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল বেশী। ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি পেশায় বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। পূর্বাঞ্চলের পাটনা শহরকে উমেশবাবু তাঁর কর্মক্ষেত্ররূপে বেছে নেন। সেখান হ'তে গয়াতেও তিনি যাতায়াত করতেন। ক্রমে পেশায় সুনাম অর্জন ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এইসময় গয়া সহরে সদর-আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিভাবান উকিল উমেশবাবুকে ইংরাজ সরকার

গয়া জেলার সরকারি উকিল হিসাবে মনোনীত করেন। ক্রমশঃ কাজের চাপ বেড়ে যায়। সেই কারণে কর্মক্ষেত্রে বসবাসের জন্য গয়া আদালতের কাছে কিছু জমি ক্রয় করে উমেশবাবু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (সাল গৃহে এখনও উৎকীর্ণ আছে) পাকা বসত বাড়ী ও বাগান তৈরী করেন। বাড়ীটি 'উমেশ লজ' নামে ঐ অঞ্চলে বিখ্যাত। নিজ চেষ্টায় কিছু জমিদারী করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত বিত্তবান বাঙ্গালীরূপে গয়া জেলায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

উমেশবাবুর বাড়ী, গয়াধামে যে বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে ক'লকাতার বাগবাজার-নিবাসী জমিদার শ্রীনন্দ বসু ও শ্রীপশুপতিনাথ বসু মহোদয়গণের কথা জানা যায়। শ্রীনন্দ বসুর গৃহে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই মঙ্গলবার অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্তসহ ঈশ্বরীয় ছবি দর্শন করতে আসেন। এই দর্শনের জন্য ঠাকুর ও তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নন্দ বসুদের আলাপ পরিচয় হয়।

জমিদার শ্রীনন্দ বসু ও শ্রীপশুপতি নাথ বসুদের জমিদারী বঙ্গদেশ ছাড়িয়ে সুদূর বিহার প্রদেশে প্রসারিত হয়েছিল। বিদেশে যেরূপ জমিদারদের Estate Attorney থাকেন, যিনি জমিদারির যাবতীয় আইন সংক্রান্ত ব্যাপার দেখাশোনা করেন, সেইরূপ শ্রীনন্দ বসু ও শ্রীপশুপতিনাথ বসু মহোদয়গণ গয়ার খ্যাতনামা সরকারি উকিল শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার মশাইকে তাঁদের Estate এর উকিল নিযুক্ত করেন। এই কারণে উমেশবাবু বাগবাজারের বসু-পরিবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রয়োজনে বসুগৃহে তাঁর যাতায়াতও ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে শ্রীনন্দ বসু ও শ্রীপশুপতিনাথ বসুর পরিচয় হবার পর উপস্থিত আত্মীয়, প্রতিবেশী ও কর্মচারীদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল এবং উপস্থিত ভক্তেরা প্রয়োজনে

তাদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এই যোগাযোগসূত্রে ভক্তেরা উমেশবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সূত্রে পুনরায় উমেশবাবুর পরিচয় হয়। তেজোদীপ্ত পুরুষসিংহ নরেন্দ্রনাথ প্রথম আলাপে সহজেই সকলের হৃদয় জয় ক'রতেন। উমেশবাবুও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও অপূর্ব সঙ্গীত উমেশবাবুর স্মৃতিপটে ভাস্বর হয়েছিল। এই কারণেই উমেশবাবু গয়াতে তাঁর গৃহে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতিকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ গুরুভাইদের সঙ্গে আতিথ্য গ্রহণ করে আলাপনের পর অপূর্ব সঙ্গীতে এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাঁর সুকণ্ঠের ভক্তিগীতি উপস্থিত অতিথিদের হৃদয় অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল। উমেশবাবুর আন্তরিক আপ্যায়নে নরেন্দ্রনাথ সেই রাত গুরুভাইদের সঙ্গে অতিবাহিত ক'রে পরদিন রেলযোগে ক'লকাতায় রওনা হয়েছিলেন।

গয়ার যে স্থানে উমেশবাবুর বাড়ী ঐ অঞ্চলের নাম 'সিতাবহেশ্বরতলা'। এখানকার প্রাচীন-প্রাচীনারা নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) পদরজঃ পবিত্র গৃহটির কথা জানেন। কিন্তু জানেন না কোন্ যোগাযোগ সূত্রে তিনি ঐ গৃহে পদার্পণ করেছিলেন। স্থানীয় 'শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের' সন্ন্যাসীগণ ও ভক্তবৃন্দ স্বামীজীর জন্মতিথিতে ঐ গৃহের সম্মুখে সমবেত হ'য়ে সেই মহামানবের জীবন ও বাণী অনুধ্যান ক'রে ভক্তিপীঠের মূর্চ্ছনায় ঐ স্থান পরিপ্লাবিত করেন।

গৃহটির পার্শ্ববর্তী রাস্তা 'উমেশচন্দ্র সরকার রোড' ও 'স্বামী বিবেকানন্দ পথ'রূপে নামকরণ করা হয়েছে। 'স্বামী বিবেকানন্দ পথ'টি একটি প্রধান সড়ক, গয়া শহরের কেন্দ্রস্থল চক বাজারে এসে মিশেছে। গৃহটির সম্মুখস্থ পথটি 'রায় শ্যামলাল রোড' এবং গয়া শহরের প্রধান সড়ক, যেটি বুদ্ধগয়া পর্যন্ত চলে গেছে, সেই পথটি 'রায় পশুপতিনাথ বসু রোড' রূপে নামাঙ্কিত হ'য়েছে। এই সকল কারণে বিহারে (বিশেষ করে গয়া জেলায় যেখানে জমিদারি ছিল) বাগবাজারের বসু-পরিবারের প্রতিপত্তির প্রভাব অনুমান করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে অপ্রকাশিত প্রাচীন ঘটনাগুলি আজ প্রায় শতবর্ষ পরেও ভক্তদের রোমাঞ্চিত করে ও আনন্দ দেয়।*

●

* এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয়েছে 'উমেশ চন্দ্র সরকারের জীবিতা বিধবা পৌত্রবধূ শ্রীমতী মালতী মজুমদী সরকারের (৮৪) বিবৃতি থেকে। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, স্বয়ং লেখক ঐ স্থান ও বাড়ী দর্শন করে এসেছেন। —লেখক।

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(পাঁচ)

এবার গ্রীসে ও পাশ্চাত্যের দর্শনজগতের সুন্দর ও সৌন্দর্য-সম্বন্ধে ধারণা ও চিন্তাধারার সৃষ্টি কিভাবে হয়েছিল তার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করি। তারপর ভারতে সুন্দরের ধারণা কিভাবে রসচেতনাকে নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবো। বিশ্বে সৌন্দর্যদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরের সাধনার জন্ম ও বিকাশ কিভাবে হয়েছিল তার একটা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো। সমগ্র পাশ্চাত্যজগতে দার্শনিক প্লেটো-নির্দেশিত সৌন্দর্যের বিচার-বিশ্লেষণকে সৌন্দর্যচেতনার মোটামুটিভাবে আদিপ্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। চিন্তাশীল মনরো বিয়ার্ডস্‌লে (Monroe C. Beardsley : *Encyclopaedia of Philosophy*-গ্রন্থে (Vol. I) বলেছেন : 'In the West, the history of systematic philosophizing about the arts begins with Plato'. শিল্পসৌন্দর্য সমাজের ও সামাজিক মানুষের একটি উপাদান, বরং শ্রেষ্ঠ-উপাদান, কেননা কারুকর্ম ও চারুকলার অনুশীলিত ভাবদীপ্ত রূপই সৌন্দর্যসাধনার পরমসামগ্রী একথা নানাভাবে মনে করতে পারি। গ্রীক-দার্শনিকদের মুকুটমণি প্লেটো এই চারুকলাদৃষ্টির সুবিস্তৃত পরিচয় দিলেও তিনিই কিন্তু প্রথম মানুষ নন, তাঁর পরিণত-চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠারূপে তাঁরও পূর্বে আমরা গ্রীসেরই প্রাচীন চিন্তাশীলদের মধ্যে ডেমোক্রিটাস ও পারমেনাইডসের নামের উল্লেখ করতে পারি। অবশ্য এই সম্পর্কে হোমার ও হেসিঅডের নামেরও উল্লেখ আছে, কেননা পাশ্চাত্যে যখন জেনোফেন ও হেরাক্লিটাস নাস্তিক্যবাদের[১] প্রশ্রয় নিয়ে 'শিব-সুন্দর'-রূপ বিশ্বস্রষ্টার সমালোচনায় মুখর ছিলেন, তখন হোমার ও হেসিঅড শিব-সুন্দর-ঈশ্বরের ধারণাকে নৈতিক-ধারণার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যে চিন্তার ক্ষেত্রে এক আলোড়িত আগরণের দীপ প্রজ্বলিত করেছিলেন। সেজন্য হোমার ও হেসিঅড শিল্পসাধনার দৃষ্টিকেই সমুন্নত করেছিলেন বলা যায়। সে'ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের সঙ্গে সঙ্গে পাইথাগোরাসের অবদানও কম ছিল না। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, পাইথাগোরাস ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভারতের বহু কল্যাণময়ী ধারণায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে গ্রীসের সমাজে তিনি সেগুলির প্রচার করেছিলেন। সেজন্য প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক-চিন্তার গতি ও প্রকৃতির মিল ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে বহুক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

গ্রীসের বিশ্বস্ত দার্শনিক প্লেটোর সময়কে আমরা মোটামুটিভাবে ৩৯৯—৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্ব ব'লে ধরে নিতে পারি। ভারতবর্ষে ধর্ম, দর্শন ও চারুশিল্পচেতনার ক্ষেত্রে তখন সমুন্নত যুগ। তবে দার্শনিক প্লেটোর সুন্দরের ধারণা-সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে মনে করি যে, তিনি চারুকলা বলতে স্থাপত্য, চিত্র, নৃত্য-গীত-নাট্য-কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতির সুচিন্তিত ও পরিণত রূপকেই যে একমাত্র গ্রহণ করেছিলেন একথা ঠিক নয়, বরং তিনি 'ক্রাফ্ট' (craft)-শ্রেণীর সকল-কিছু চারু-

১। Scepticism.

শিল্পকেই গ্রহণ করেছিলেন—যদিও কোন নামে বা রূপে নির্দিষ্ট ক'রে নয়। তাই অধ্যাপক বিয়ার্ডস্‌লে ঠিকই বলেছেন: 'When we speak of Plato's aestheics, we mean his philosophical views about those fine arts that he discusses: visual arts (painting, sculpture, architecture), literary arts (epic, lyric and dramatic poetry), and mixed musical arts (dance and song). Plato does not himself assign them a special name, for him they belong in the more general class of 'craft' (*techne*), which includes all skills in making or doing from woodcraft to statecraft'.

দার্শনিক প্লেটো নৃত্য-গীত-বাদ্য-নাট্য প্রভৃতি চারুকলাসামগ্রীর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেগুলিকে তিনি সাধারণভাবে অনুকৃতি (imitations) বা প্রতীকই (image) বলেছেন তাঁর 'রিপাব্লিক' (*Republic*) প্রভৃতি গ্রন্থে। তবে অনুকৃতি ও আকৃতি বা প্রতীক যেকোন বস্তুকে কিভাবে নির্দেশ করে—তার সঠিক পরিচয় তিনি দেন নি। তবে একথা তিনি বলেছেন যে, ঐসকল অনুকৃতি ও আকৃতি (imitations and forms) সুন্দরের বা সৌন্দর্যের সাধনারই নিয়োজিত। কিন্তু এই সুন্দর শাশ্বত বা চিরস্থায়ী নয়। তিনি বলেছেন ঐ চিরচঞ্চল অশাশ্বত সুন্দরের পিছনে শাশ্বত ও নির্বিকার একটি সনাতন-বস্তু আছে: 'The beauty of concrete thing may change or disappear, may appear to some but not to others (*Republic* 470 A), but behind these temporal embodiments *there is an enternal and absolute form of beauty*'. ঐ নিত্য ও পরিপূর্ণ সুন্দর ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে মনকে স্পর্শ করে এবং এক অনন্ত-স্পন্দন সৃষ্টি ক'রে অনুভূতি আনে অন্তরে এবং ঐ অনুভূতির সাহায্যেই সুন্দরের সত্তা মানুষের কাছে ধরা পড়ে, এবং তখনই সৃষ্টি হয় আনন্দের পুলক ও শিহরণ। এই আনন্দের স্পর্শকে দার্শনিক প্লেটো বলেছেন 'Good',—ভারতীয়-দৃষ্টিতে যাকে বলতে পারি 'সত্যং-শিবং-সুন্দরম্'। শিব কল্যাণস্বরূপ, সেজন্য চিরসুখকর ও শাশ্বত আনন্দদায়ী।

দার্শনিক অ্যারিষ্টোটেল তাঁর 'পোয়েটিকস্' (*Poetics*)-নিবন্ধে বিশেষভাবে সুন্দরের ভাব ও ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর পোয়েটিকস্ কাব্য ও শিল্পকে বোঝার ও জানার জন্য চিন্তার ক্ষেত্রকে বা পরিধিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন: (১) জানা (*theoria*), করা (*praxis*) ও প্রকাশ করা (*poiesis*)। অ্যারিষ্টোটেল 'অনুকৃতি' (imitation) শব্দ ব্যবহার করেছেন দু'ভাবে: (১) দৃশ্য-বস্তুকে অনুকরণ করা সম্ভব রঙের বা বর্ণের ও অঙ্কনের সাহায্য নিয়ে, এবং (২) কাব্যশিল্পের সৌন্দর্যকে বোঝা যায় কাব্যের ছন্দে বা পদ্যারে (verse), গানে (song) ও নৃত্যে (dance)। সুতরাং দার্শনিক অ্যারিষ্টোটেল কাব্যশিল্পকে চিত্রশিল্প থেকে পৃথক বা বিভক্ত করেছেন কথা, সুর ও ছন্দের সাহায্যে। তাছাড়া তিনি নাটকের প্রসঙ্গে বিয়োগ ও মিলনের কথাও বলেছেন—যদিও বিয়োগাত্মক দৃশ্যকে তিনি আনন্দরসসৃষ্টির প্রধান উপায় বলেছেন। মিলনাত্মকের কথা স্বতন্ত্র।

অ্যারিস্টোটেলের পরে গ্রীসে ও পাশ্চাত্যজগতে স্টোয়িক, এপিকিউরিয়ান, স্কেপ্টিক, নিওপ্লেটোবাদের সৃষ্টি হয়—যে সকল বাদে, অভিমতে বা দৃষ্টিতে সুন্দরের ও সৌন্দর্যের জগতে কিছু কিছু নূতন নূতন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সৃষ্টি হয়েছিল। স্টোয়িকরা কাব্যকে ও এপিকিউরিয়ানরা সঙ্গীতকে সাধারণভাবে সুন্দরকে ধরা-ছোঁয়ার উপায় (means) ব'লে স্বীকার করতেন। দার্শনিক প্লটিনাস ও তাঁর অনুবর্তীদের মতবাদের মধ্যে স্বতন্ত্র-চিন্তা ছিল। প্লটিনাস দৃঢ়ভাবে বিশ্বের শিছনে এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তিনটি প্রকল্পে (hypothesis) বিশেষ-ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন: (১) প্রথম প্রকল্প চরমসত্তা—যা বিশ্বচৈচিত্র্যের বা সকল বিকাশের প্রতিষ্ঠা (*foundation*) বলতে পারি; (২) দ্বিতীয় প্রকল্প—সত্যের রূপ বা স্বরূপ বুদ্ধি (*intellect*) বা মন (*nous*), এবং (৩) তৃতীয় প্রকল্প—জীবসত্তা বা আত্মা (all-soul)—যাকে *psyche* বলে গ্রহণ করা যায়। প্লটিনাসের এই তিনটি প্রকল্পের সাহায্যে মানুষ সুন্দররূপ আলোকের (*light*) সন্ধান পেতে পারে। এই 'আলোক' সুসঙ্গত (symmetry) একটি বর্ণ ও সাঙ্গীতিক স্বরের সমন্বিত-রূপ। এর সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিজ্ঞান বা ভাল ও মন্দের মধ্যে বেছে নিয়ে ভাল বা সুন্দর-যা-কিছু তাকে গ্রহণ করার জ্ঞান (moral sense)। এজন্য দার্শনিক প্লটিনাস সুন্দরের আলোচনার সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তিনটি উপায় গ্রহণ করেছেন: প্রথমটি—সঙ্গীতজ্ঞ, দ্বিতীয়টি—প্রেমিক ও তৃতীয়টি—বিচারী-দার্শনিক। মোটকথা প্লটিনাসের মতে এই তিন শ্রেণীর মানুষই যথার্থভাবে সুন্দর কি—তার নির্ণয় করতে সক্ষম হন।

এরপর পাশ্চাত্যে মধ্যযুগের কথা। ঐ যুগে আগাষ্টাইন, টমাস এক্যুইনাস প্রভৃতি মনীষীদের অভ্যুদয় ঘটে। পুনরায় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আবর্তনে নবজাগরণের যুগের সূচনা। এইযুগে ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতির বিকাশে বিচিত্র ধরনের শিল্পীরা পাশ্চাত্যজগতে শিল্পকলার আলোচনায় ও প্রতিফলনে যশস্বী হয়েছিলেন। সুন্দরের নির্দিষ্ট রূপ তখন শিল্পী ও সাধারণ প্রেমিক-মানুষের কাছে সর্বত্রই আদরণীয় ছিল। বিশ্বস্ত শিল্পী ও প্রতিভাধর-পুরুষ লিওনার্ডো-দা-ভিঞ্চি (Leonardo-da-Vinci), এ্যালবার্ট, জিওসেফি জার্লিনো (Gioseffe Zarlino) প্রভৃতির যশসৌরভ ও সমাদর তখন বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ও আদৃত। সুন্দরের বর্ণনা, সাধনা ও অভিব্যক্তিও তখন বিশ্বের সর্বসমাজে পরিব্যাপ্ত ও বিদিত।

পরে দেকার্টে (Descartes) প্রভৃতি কার্টিসান-দার্শনিকদের অভ্যুদয়ে সুন্দরের ব্যঞ্জনা ও বিবরণ বিশেষভাবে বুদ্ধিজীবি মানুষের সমাজে দেখা দিয়েছিল—যদিও একথা সত্য যে, দার্শনিক দেকার্টের (Descartes) দর্শনের আলোচনায় সুন্দর বা সৌন্দর্যের স্থান বিশেষভাবে বিধৃত ছিল না। তবে ঠিক এ' সময়েই জার্মান-দার্শনিক আলেকজাণ্ডার গোটলিব বাউমগার্টেন সৌন্দর্যতত্ত্বের জগতে 'এস্থেটিক্স্' (Aesthetics) এই বিশেষ শব্দটির প্রচলন করেছিলেন। পূর্বেই বলেছি যে, সুন্দরের বা সৌন্দর্যের ঐতিহাসিক আলোচনায় প্রাজ্ঞের বিয়ার্ডস্‌লে (Monroe C. Beardsley) বাউমগার্টেন-সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রাজ্ঞের বাউমগার্টেন (Alexander Gottlieb Baumgarten) সুন্দর বা সৌন্দর্যের নির্দিষ্ট নাম 'এস্থেটিক্স্' প্রথমে আবিষ্কার করেন (অবশ্য পূর্বে একথা উল্লেখ করেছি)। দার্শনিক দেকার্টের (Descartes) *Principles*

of Philosophy এবং দার্শনিক লিব্‌নিজের *Discourse on Metaphysics*-গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত কবিতা বা কাব্য-সম্পর্কে আলোচনাকে ভিত্তি ক'রে : "Who coined the term 'aesthetics', aimed to provide an account of poetry (and indirectly of all arts) as involving a particular form, or level, of cognition—'sensory cognition." তবে জার্মান-দার্শনিক বাউমগার্টেন ইন্দ্রিয়ে প্রতিভাত বা ঐন্দ্রিয়িক-সৌন্দর্যের নির্ধারণ ও বিশ্লেষণকেই প্রধানভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অতীন্দ্রিয়-অপার্থিব-সৌন্দর্যকে তিনি গ্রহণ করেন নি।[২]

●

॥ চতুঃশ্লোকী ভাগবত কথা ॥

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মহারাজ পরীক্ষিতের দেহান্তকাল আসন্ন। সুতরাং কিভাবে তিনি মৃত্যুভয়জনিত দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারেন, এই চিন্তাই তাঁর মনে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। কারুর কোনো সান্ত্বনা বা উপদেশই তাঁর অশান্ত মনকে তৃপ্ত করতে পারছে না। তখন তিনি পরম তত্ত্ববিৎ শুকদেবের শরণাপন্ন হলে তিনি মহারাজকে ব্রহ্মবিদ্যামূলক শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে অনুপ্রাণিত করলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব শ্রীহরি সর্বপ্রথম চারটি শ্লোকে ব্রহ্মার নিকট বিবৃত করেন; সেই হেতু এর অপর নাম চতুঃশ্লোকী ভাগবত। বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি সম্পর্কে মহারাজ পরীক্ষিৎ কতকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরেন—যা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের অন্তর্গত। শুকদেব কর্তৃক সেই প্রশ্নসমূহের জবাব লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই স্কন্ধেরই নবম অধ্যায়ে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্লোক পর্যন্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ যে পাঁচটি প্রশ্নের অবতারণা করেন, তা হচ্ছে—

(১) অলৌকিক পরম পুরুষ বা পরম ব্রহ্মা কে ? তিনি কোথায় এবং কিভাবে অবস্থান করছেন ?

(২) সৃষ্টির আদিতে অজ থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাভিকমল থেকে যাঁর জন্ম, সেই ব্রহ্মাকে অবগত হতে ইচ্ছা করি।

(৩) যে পুরুষ মহৎ-তত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের সৃজন করেছেন, যিনি সকলের অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজমান, সেই পুরুষকে জানতে ইচ্ছে হয়।

(৪) যে পরমপুরুষ সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁর কথা সবিস্তারে বলুন। এবং—

(৫) যাঁর মধ্যে যাবতীয় জীবের সমন্বয় ঘটেছে, সেই পুরুষ সম্পর্কে অবগত হতে ইচ্ছা করি।

২। এ'সম্বন্ধে পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

এই পাঁচটি প্রশ্ন শান্ত, প্রীতি ও ভক্তিরসের দ্যোতক। শ্রীভগবানের স্বরূপপ্রকাশক এই পঞ্চ গুণ জীবকে ভগবান থেকে পৃথক করে। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। এই রসের দু'টি গুণ ; ঈশ্বরে নিষ্ঠা এবং সংসারবাসনাত্যাগ। দেহাবসানের পূর্বে মহারাজ পরীক্ষিতের এই একমাত্র কাম্য। তাই তাঁর ব্যাকুল প্রশ্ন—

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বসিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্তাত্মমায়াং ধায়েন: শেতে সর্বগুহাশয়ঃ ॥ ৯

অর্থাৎ—শ্রীভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারী সকলের অন্তরে বিরাজমান, মায়াশক্তির নিয়ামক, অথচ মায়াসম্বন্ধশূন্য হ'য়ে যে স্থানে অবস্থান করেন, তদ্বিষয়ে আমি জানতে ইচ্ছা করি। কিন্তু এখানেই মহারাজের কৌতূহলী প্রশ্নের শেষ নয়। আরও যে যে প্রশ্ন তিনি তত্ত্ববিৎ শুকদেবের নিকট উপস্থিত করেন, তা হচ্ছে—সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তীকাল এবং কৃত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিসে জানা যায়? স্থূলাভিমানী পিতৃ এবং দেবতাদির আয়ুষ্কাল কত? পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্মকাল ও বৎসরাদি স্থূল কালের প্রবৃত্তি কিভাবে অবগত হওয়া যায়? সত্ত্বাদিগুণের উৎকর্ষ অভিলাষী জীবসমূহের মধ্যে শুভাশুভ কর্মজনিত যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির অনুষ্ঠান কি পরিমাণে কিসের দ্বারা লাভ হতে পারে? পৃথিবী, পাতাল, দিক, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্বত, নদী, সমুদ্র, দ্বীপসমূহ তথা তৎ-তৎ স্থলবাসী জীবসমূহের উৎপত্তি কিরূপে সম্ভব হয়েছে? মানুষের সাধারণ ধর্ম কি? বর্ণাশ্রম নিবন্ধন বিশেষ ধর্ম কি প্রকার? প্রজা-পালনে অধিকারী রাজর্ষিদিগের ধর্ম কি, এবং মানুষের বিপদ্‌কালীন ধর্মই বা কি? প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা কত? তাদের স্বরূপ বা লক্ষণ কি? দেবপূজা অর্থাৎ—শ্রীগোবিন্দ-আরাধনের প্রণালীই বা কি? আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন অষ্টাঙ্গযোগের বিধি কিরূপ? যোগসিদ্ধদের অনিমালঘিমাদি ঐশ্বর্য এবং তাঁদের অর্চিরাদি গতি কিরূপ? যোগীদের লিঙ্গ শরীরের নাশ ঘটে কিভাবে? সর্বজীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কিরূপে হয়? বৈদিক কর্ম এবং স্মার্ত কর্ম, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কাম্য কর্ম এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের স্বরূপ কি? জীবাত্মার বন্ধন ও মুক্তি এবং তার স্বরূপে অবস্থান কি প্রকারে হয়? শ্রীভগবান স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে কিরূপে নানাবিধ লীলা করেন এবং মায়াসম্পর্ক ত্যাগ করে প্রলয়কালে কিরূপে ধর্মকর্মযুক্ত উদাসীনভাবে থাকতে পারেন?

এই সুবিস্তৃত ও সর্বব্যাপী তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা শ্রীগোবিন্দলীলাকথা শ্রবণে উৎসুক মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিৎ ভবভয় হতে পরিত্রাণ পেতে চাইলেন।—

ন মেহসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্নশনাদিভিঃ।
পিবতোহচ্যুতপীযূষং তবাক্যাদ্ধি বিনিঃসৃতম্ ॥ ২৫

প্রীত হয়ে শ্রীশুকদেব মহারাজকে সর্ববেদতুল্য ভাগবত শোনাতে আরম্ভ করলেন।—

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎ প্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৭

শ্রীশুকদেব তত্ত্বজ্ঞানুকূল ও সর্ববেদবেত্তা, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ও শরণাগত। করুণার্দ্রচিত্ত শুকদেব তাঁর প্রশ্নাবলীর ক্রম-অনুসারে যথাযথ উত্তর না দিয়ে বিষয় বা প্রস্তাব অনুযায়ী যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানে উদ্যোগী হলেন। দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে সেই বর্ণনাই নানা শ্লোকে বিধৃত।

বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষ্বস্যা সমাহমিতি মন্যতে ॥ ২
যর্হিবাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ।
রমেতগতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩

অর্থাৎ—'এই সংসার মায়ার দ্বারা উৎপন্ন। বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন মায়ারচিত এই দেহাদিতে আসক্ত জীব বাল্য, যৌবন, দেব ও মনুষ্যরূপে প্রকাশিত হয় এবং তৎ-তৎ দেহে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি বলে অভিমান করে। যখন মায়াবিকার মুক্ত হয়ে জীব কাল ও মায়ার অতীত স্বীয় মহিমামণ্ডিত শ্রীভগবানের চরণসেবায় নিযুক্ত হয়, তখন কাল ও মায়া অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি সম্বন্ধ ছেড়ে অনাসক্তভাবে অবস্থান করে। চৈতন্যরূপী জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে মায়াকৃত ভেদ ছাড়া কোনো তাত্ত্বিক ভেদ নেই। জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই, ব্রহ্মের মায়াবদ্ধ অবস্থার নামই জীব। জীবের দেহ মায়িক, সুতরাং অবিদ্যার কুহকে পূর্ণ; কিন্তু ঈশ্বর-দেহ সচ্চিদানন্দঘন লীলাবিগ্রহ। জীব স্বীয় কর্মবশে মায়িক দেহে কর্মফল ভোগ করে দুঃখ পায়, কিন্তু শ্রীভগবান লীলাকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করবার জন্যে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে লীলা-রসাস্বাদনের মানসে বিভিন্নভাবে ক্রীড়া করেন।

শ্রুতি উল্লেখ করেছেন: ব্রহ্মাই জগতের আদিপুরুষ। তিনি ভক্তিতত্ত্বের উপদেষ্টা; একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই যে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করা যায়, তা তিনিই স্বীয় জীবনে আচরণ ক'রে প্রতিপন্ন ক'রে গিয়েছেন। তিনি শ্রীভগবানের নাভিপদ্ম হতে জন্মগ্রহণ ক'রে অভিমানবশে বুঝতে পারলেন না যে, তিনি কোথায় অবস্থান করেছেন, প্রজাসৃষ্টির অহংও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁকে আবিষ্ট করছিল, এমনি সময় অনন্ত সমুদ্র-গর্ভে তিনি 'তপ' 'তপ' ধ্বনি শুনতে পেলেন। এই 'তপ'ই তপস্যা। অন্তরে তিনি তপস্যায় রত হবার আদেশ পেয়ে তপশ্চর্যায় মনঃসংযোগ করলেন।—

অথাভিধ্যায়তঃ বিশুদ্ধ চেতসঃ
তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদরেণ মনঃ ॥ ৭

এক হাজার বছর কঠোর তপশ্চর্যার পর ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যং এই সপ্তলোক তাঁর চিদাকাশে ভেসে ওঠে। ব্রহ্মার এই তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীভগবান তাঁকে স্বীয় বৈকুণ্ঠধাম দেখালেন। এখানে পৌঁছালে অবিদ্যাপূর্ণ এই সংসারে আর পুনরাবর্তন করতে হয় না। সেই বৈকুণ্ঠে রজঃ বা তমোগুণ নেই, সেখানে সবই আনন্দময়।—

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বং মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।

ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরে—
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥ ১০

বৈকুণ্ঠপতিকে সন্দর্শন ক'রে ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে মগ্ন হলো, শরীর রোমাঞ্চিত হতে লাগলো এবং নয়নযুগল প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ হলো। শ্রীভগবানের চরণকমলে তিনি ভক্তিভরে প্রণিপাত করলেন। তুষ্ট হ'য়ে শ্রীভগবান বললেন : 'হে ব্রহ্মণ! তোমার মঙ্গল হোক। আমার নিকট তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো। আমিই তপস্যারূপে তোমাকে নির্বিকল্পসমাধিতে নিয়ুক্ত করেছিলাম।

সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্যাং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৪

আমি তপস্যার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করি, তপস্যা দ্বারা পালন করি এবং প্রলয়কালে তপস্যার দ্বারা জগৎ ধ্বংস করি। 'তপসোঽহমাত্মা', আমি তপস্যার আত্মা। তুমি যত্ন প্রার্থনা করলে আমি তা পূরণ করবো।

ব্রহ্মা বললেন : 'হে ভগবন। আপনি সর্বভূতের অধিষ্ঠাতা, এবং সকলের বুদ্ধিতে অবস্থিত। অপ্রতিহত নির্মল বুদ্ধি দ্বারা সকলের মনোভাব আপনি অবগত আছেন। তথাপি হে নাথ। আমি প্রার্থনা করি, অরূপী আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ তত্ত্বতঃ যাতে অবগত হতে পারি, আমাকে সেই উপদেশ দান করুন। অর্থাৎ—(১) আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপ কি প্রকার? (২) আপনার মায়া ও যোগমায়া কি প্রকার? (৩) উক্ত উভয়লোকে আপনার লীলা কি প্রকারে সম্পটিত হয়? এবং (৪) আমার অভিষ্ট পুরণার্থ আপনার উপদেশানুসারে কি কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে—যাতে আমি মায়াধীন হয়ে না পড়ি?

এই প্রশ্ন চতুষ্টয় শ্রবণ ক'রে শ্রীহরি (শ্রীভগবান) চারটি শ্লোকে তার উত্তর প্রদান করেন। এই হেতু তা চতুঃশ্লোকী ভাগবত ব'লে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

শ্রীভগবান বললেন—

'যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥' ৩১

'আমার স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ এবং লীলাতত্ত্ব আমার কৃপায় তোমার যথার্থরূপে অনুভব হোক।'

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জীব যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই হয়ে যায়; জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন বোধ হয়। একেই পরাজ্ঞান বলে।

শ্রীভগবান বললেন—

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥' ৩২

'সৃষ্টির পূর্বে আমিই ছিলাম, অন্যকিছুই ছিল না। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের মূল কারণ প্রকৃতিও তখন ছিল না; সৃষ্টির পরেও আমিই আছি, এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ—এও আমি, এবং প্রলয়ান্তে যা অবশিষ্ট থাকবে, সেও আমি। আমিই অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়।'

'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥' ৩৩

'প্রতিবিম্বের যেমন নিজস্ব কোনো সত্তা নেই, প্রকৃত বস্তুর সত্তাতেই তার সত্তার প্রতীতি হয়, অন্ধকার যেমন প্রকৃত বস্তুর আবরক এবং দীপের সাহায্যে তার প্রকাশক, তদ্রূপ আমার আশ্রয় ভিন্ন যে বস্তুর স্বতঃই প্রতীতি বা জ্ঞান হয় না, তাকেই আমার বহিরঙ্গ শক্তি 'মায়া' বলে জানবে।

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ
শ্রদ্ধাবস্থা কৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্যগুণা জীবেন চিত্তজাঃ
ভক্তিযোগেন সন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে।

দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কারক, শ্রদ্ধাবস্থা, কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—যিনি এসকল মানস সৌম্যগুণ জয় করেছেন এবং ভক্তি সহকারে আমাগত প্রাণ হয়ে অবস্থান করেন, তিনিই আমাকে লাভ করেন।'

গীতায়ও শ্রীভগবানের অনুরূপ উক্তি—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥'

অর্থাৎ—ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সর্বদা প্রসন্ন থাকেন, কিছুতেই শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে তাঁর সমদৃষ্টি, ভগবানের প্রতি পরাভক্তি তিনি লাভ ক'রে থাকেন।

(১) প্রাধানিকাঃ স্থূ র্দেহাত্মধর্মা আবিষ্কৃতঃ পুনঃ।
জীবেষু তত্তৎ সম্বন্ধো ভক্তিস্তেন নিবর্ত্যতে ॥
(২) চিজ্জীবমায়া নিত্যাঃ স্যুস্ত্রিপ্রঃ কৃষ্ণস্য শক্তয়ঃ।
তদুদ্ভবশ্চ তাভিঃ স তাভ্যোঽন্যঃ পরমেশ্বরঃ ॥
(৩) কার্যকারণয়োরৈক্যাৎ শক্তি শক্তিমতোরপি।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥
(৪) তত্ত্বানামেব সিদ্ধান্তঃ চতুঃশ্লোক্যাং মীলিতা।
লীলিতা ভবতাদ্ভক্তৈস্তৈরেব ন কিলান্যৈঃ ইতি ॥

কোনো বস্তুর সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে তদ্‌বিপরীত বস্তুরও জ্ঞান থাকা অতীব প্রয়োজন, নতুবা বস্তুজ্ঞানে ভ্রান্তি আসতে পারে। মায়ার স্বরূপ বুঝতে হলে যেমন পরিদৃশ্যমান জগতের অসত্যতা, নশ্বরতা ও এর আশ্রয়ে দুঃখানল প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে ইত্যাদি বুঝতে হয়, তদ্রূপ মায়াতীত জগতের উপলব্ধি দ্বারা এর আশ্রয় গ্রহণ করতে পারলে জীবের দুঃখনিবৃত্তি হয়, এও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। জীব মায়াধীন হ'য়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করে, অসত্যকে সত্য মনে করে, তাই মরনের কুলালচক্রে নিষ্পেষিত হচ্ছে। শ্রীহরি জীবকে ভাবী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য মায়ার স্বরূপ নির্ণয় ক'রে তাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছেন। পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হ'লে

যোগমায়াই তখন জীবকে অধিকার ক'রে বসে, তা তার সিদ্ধির অনুকূল হয়ে দাঁড়ায়। মায়া এবং যোগমায়া অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ; সুতরাং একটিকে জানতে হ'লে অপরটিকে জানাও অপরিহার্য। এই মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে বিবিধ। বিদ্যার দৃষ্টান্ত—'যথা তাসঃ', যেমন প্রদীপের আলোকে সবকিছুই দৃষ্ট হয়; অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—'যথা তমঃ', যেমন অন্ধকারে সবই আচ্ছন্ন থাকে। ভগবান তাই বলছেন—'ভক্ত্যা অহমেকয়া গ্রাহ্যঃ', 'ভক্ত একমাত্র বিদ্যার আশ্রয়ে অনন্যা ভক্তি দ্বারাই আমাকে লাভ করতে পারে।' কারণ

কার্য্যং প্রাধানিকং সত্যং কার্যং অবিদ্যকং মৃষা।
নিত্যং তদ্‌ভক্তিসম্বন্ধমিদং তত্ত্রিতয়াত্মকম্।

অর্থাৎ—প্রধানের বা প্রকৃতির কার্য সত্য, অবিদ্যার কার্য মিথ্যা, এবং বিদ্যার কার্য বা ফল নিত্য ও ভক্তিযুক্ত।

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।

কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং সাংখ্য—এই হচ্ছে পুরুষার্থ; এই চারটি সাধনপথের পাথেয়। শ্রীহরির শরণাগত ভক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় ব্যতীতও ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করে।

ব্রহ্মার প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান পুনরায় বললেন—

'যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।' ৩৪

'দেবমনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি জীবদেহ আকাশাদি পঞ্চমহাভূত দ্বারা নির্মিত, অতএব পঞ্চমহাভূত সৃষ্টির পরে জীবদেহে প্রবেশ করে। জীবদেহ ব্যতীত পৃথকভাবেও আকাশাদি পঞ্চমহাভূত তার কারণরূপে বিদ্যমান থাকায় তাতে অনুপ্রবিষ্টও থাকে। তদ্রূপ আমিও ভূততৌতিক পদার্থ-সমূহে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট থাকি, বিশেষতঃ আমার ভক্তজনের হৃদয়স্বরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকি।'

মহারাজ পরীক্ষিৎ যেখানে শ্রীভগবানসৃষ্ট চতুর্বর্ণ সম্পর্কে প্রশ্নাতুর সেখানে বলা হয়েছে—

'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্তি অবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ইতি।

অর্থাৎ—সৃষ্টির মূল চৈতন্যময় ঈশ্বরের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পদ থেকে শূদ্র গুণানুসারে পৃথক পৃথক চতুর্বর্ণ চতুরাশ্রম সমেত উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে যারা পরমাত্মস্বরূপ ঈশ্বরীয় পুরুষকে ভজনা না ক'রে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তারা স্বস্থান ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়।

'রসো বৈ সঃ'—তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মসূত্রে এই কথা প্রতিপাদিত। তেমনি তিনি 'রসয়তে ইতি রসঃ, রসয়তি ইতি রসঃ', তাঁর অনুপম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি যেমন রসস্বরূপভাবে প্রকাশিত, তেমনি রস আস্বাদনও করছেন তিনি। কিভাবে রস আস্বাদন করছেন?

তিনি 'রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব', রূপে রূপে প্রতিরূপে বিরাজ ক'রে তিনি শান্তরসে, দাস্যরসে, সখ্যরসে, বাৎসল্যরসে ও শৃঙ্গাররসে নিজেকে আস্বাদন করছেন। ব্রহ্মা এইরূপ প্রেমভক্তির প্রভাবেই শ্রীহরির রূপগুণাদি মাধুর্যরস অনুভব করেছিলেন।

তাঁকে পাওয়া যায় কি ক'রে? এখানে উপনিষদের উক্তি স্মর্তব্য, যথা—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ইতি।'

অর্থাৎ—এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন দ্বারা পাওয়া যায় না, মেধা বা বহুবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নের দ্বারাও পাওয়া যায় না; যিনি তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তাঁকে বরণ করেন, তিনিই পরমাত্মাকে লাভ করেন, পরমাত্মাও তখন স্বীয় রূপ ভক্তের নিকট প্রকট করেন। ভক্তির অনুশীলন করতে করতে সাধক এমন এক স্তরে এসে পৌঁছান, যেখানে বহির্জগতের বস্তুর প্রতি মোহ পরিহার করে কেবল শ্রীহরির পাদপদ্মের প্রতি মমত্ব আরোপ করেন; এরই নাম প্রেম—যাকে ভক্তির শেষ স্তর বলা যায়। ব্রহ্মা এতাদৃশ শুদ্ধ-সাধন-ভক্তিলভ্য প্রেমভক্তির প্রভাবেই শ্রীহরির রূপগুণাদি মাধুর্যরস অনুভব করেন। ভক্তির চারটি রূপ, যথা—(ক) কামনাশূন্য ভক্তি শুদ্ধাভক্তি, (খ) স্বর্গাপবর্গাদি বাসনাযুক্ত ভক্তি কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, (গ) মুক্তিবাসনাযুক্ত ভক্তি-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, এবং (ঘ) সিদ্ধিবাসনাযুক্ত ভক্তি যোগমিশ্রা ভক্তি। কিন্তু একমাত্র নিষ্কাম ভক্তিই জীবের সর্বাবস্থায় ও সর্বকালে অনাবিল শান্তির পরিপোষক।

ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান বললেন—

'এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ॥' ৩৬

'হে ব্রহ্মণ! তুমি একাগ্রচিত্তে মৎ-কথিত ভক্তিযোগের সম্যক অনুষ্ঠান করো, তাহলেই কল্পে কল্পে বিবিধ সৃষ্টি করেও কখনো মুগ্ধ হবে না, অর্থাৎ—'আমিই কর্তা'—এই অভিমান বা মোহের বশীভূত হবে না।'

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন: 'মহারাজ! ভগবান শ্রীহরি লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে এই উপদেশ দিয়ে তাঁর দৃষ্টিপথ হতে স্বীয় চতুর্ভুজরূপ অন্তর্হিত করলেন। শ্রীহরির অপার করুণায় ব্রহ্মার মোহ চিরতরে বিদূরিত হলো এবং তিনি পূর্ববৎ জগৎসৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। অনন্তর তদীয় পুত্র ভক্তচূড়ামণি নারদ মারেশ শ্রীহরির কৃপাশক্তি অবগত হবার জন্য পিতা ব্রহ্মাকে নানারূপে পরিচর্যা করে তুষ্ট করতে লাগলেন। হে রাজন! ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ তাঁর পিতাকে শ্রীভগবানের মায়া-বিভূতি সম্পর্কে পরম তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মতো সেই সমুদয় বিষয়ই জানতে চাইলেন—যে-যে বিষয়ে তুমি আমাকে প্রশ্ন করেছ। এইরূপে শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা তাঁর মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে, নারদ মহামুনি বেদব্যাসকে,

পিতা বেদব্যাস আমাকে এবং আমি তোমাকে এই ঋষিসংবাদসমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করতে প্রবৃত্ত হলাম।

'যদুক্তাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদং।
যথাসীত্তদ্বিপাখ্যাস্তে প্রশ্নাশ্চান্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥' ৪৫

তুমি জিজ্ঞেস করেছ, এই বিরাট পুরুষ হতে কিরূপে এই জগতের উৎপত্তি হলো? শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা আমি এই সমুদয় প্রশ্ন এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নের সবিস্তার উত্তর প্রদান করছি।'

পরম ভাগবতপ্রাণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীচরণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য-কৃত চতুঃশ্লোকী ভাগবততত্ত্ব উদ্ধার করে সর্বজনবোধ্যভাবে সংক্ষিপ্তাকারে এখানে উপস্থিত করার অবকাশ পাওয়া গেল। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবমাত্রের যে চিরন্তন কৌতূহলী প্রশ্ন, তারই সমাধানের আকরগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। বেদ ও উপনিষদের সারাংশ হতে ভাগবত সৃষ্টি: 'বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভাগবতী কথা।' ভাগবতকে ভগবানের সাক্ষাৎ বাঙ্ময়ী মূর্তি বলা হয়: 'জ্ঞেয়ঃ বাঙ্ময়ী মূর্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ততে হরেঃ।' দেবর্ষি নারদ মহামুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের যশলীলা কীর্তন করতে বলায় ব্যাসদেব মদ্ভাগবত রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাতে রয়েছে ১২স্কন্ধ, ১৮ হাজার শ্লোক। চতুঃশ্লোকী ভাগবত তারই দ্বিতীয় স্কন্ধের অষ্টম ও নবম অধ্যায়—যা মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক পরমতত্ত্ব জিজ্ঞাসার উত্থাপন ও শ্রীশুকদেব কর্তৃক তার নিরসন। পূর্ণাঙ্গ ভাগবতই তিনি মহারাজকে শ্রবণ করান। এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ পরমতত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবমাত্রেরই প্রতীকরূপে গ্রহণীয়। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশুকদেব-কথিত চতুর্বর্ণপ্রমুখ নানা উদাহরণসহ পরম ভাগবততত্ত্ব আমাদের চিরন্তন তত্ত্বানুসন্ধিৎসারই অনন্ত অবদান। এই বিশ্বোৎপত্তিকারিণী মায়া বাহ্যতঃ অতি রমণীয়া হলেও অন্তর্চক্ষুদ্বারা বিচার ক'রে দেখলে স্পষ্টতঃ অসার প্রতিপন্ন হবে। সুতরাং শ্রীগোবিন্দচরণই একমাত্র সারবস্তু, আর যাকিছু সবই অসার। ভবতন্ত্রবন্ধন থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথই হচ্ছে একান্ত ভাগবৎভক্তি। এই ভক্তিই প্রেমের পুষ্পে পুষ্পিত হ'য়ে চিরবাঞ্ছিত চির আশ্রয় পরমাত্মার শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে নির্বাণ লাভ করে।

'কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌবিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥' (ভাঃ ১০/২৯/১৫)

ভক্তিশাস্ত্রের এতবড় উপাদান ভারত ভিন্ন আর কোথায় সম্ভব?

●

॥ রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ॥

[১]

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মানুষ হিসাবে আমরা সবাই সাধারণ এবং অসাধারণ—দুই-ই একসঙ্গে। জীবনযাপনে, পরিবেশের অনুবর্তনে, সুখদুঃখের অনুষঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই আমরা খুব আলাদা নই। কিন্তু বিশেষ কোন উপলব্ধির মুহূর্তে, তেমন কোন দ্রষ্টা ও স্রষ্টার মর্মলোকে এই তৃণরোমাঞ্চিত বনরাজিনীলা পৃথিবীর নিয়ত বিস্ময়ের মতোই প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বের বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'র অবাকবন্দীতেই তার সাধারণত্বের সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ। বাস্তবিক 'সাধারণ' বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে অসাধারণকে পাওয়াই শিল্প বা সাহিত্যের অন্যতম সার্থকতা। কিন্তু অসামান্যেরা তো সত্যিই আছেন আমাদেরই মধ্যে। জ্ঞানে কর্মে রচনায় নানাভাবে তাঁরা আমাদের মানসমুক্তির জন্যে বহু ঊর্ধ্বে আহ্বান করে চলেছেন। তেমন অসাধারণদের মধ্যে অসাধারণতম একজন রবীন্দ্রনাথ।

বিশেষণপ্রয়োগে কোনো মহত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ বললে যা বোঝায়, শ্রেষ্ঠতম বললে তার চেয়ে বেশি কিছু ব্যাকরণসঙ্গতভাবে বোঝানোর কথা নয়। তবু উপনিষদের ঋষি 'শ্রেষ্ঠতম' বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন, আর সেই আর্ষপ্রয়োগ অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। তুলনায় যার সীমা পাই না, তাকে মানুষ ঐভাবেই ইঙ্গিতে বোঝাতে চায়। সর্বদিকে জীবনের এমন পূর্ণতাপ্রয়াস সবদেশে সবযুগের ইতিহাসেই বিরল। আরো বিরল প্রতিভার এমন আমৃত্যু সজীবতা, যে সজীবতায় সারাজীবনের বাণীব্রত রবীন্দ্রনাথ আগুনের পরশমণিতে পূর্ণ করে রেখেছিলেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্য রবীন্দ্রপ্রতিভার মাধ্যমে কত জন্ম কত জন্মান্তর পার হয়ে এসেছে সেকথা ইতিহাসের দিক থেকে ভেবে দেখলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

জীবনশিল্পের এই বিপুলতম কীর্তির দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তার অন্তরালের পটভূমিটি কেমন করে নানা ভাবনা-কল্পনার উপাদানে গড়ে উঠেছিল সেকথা জানতে উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক। সৌভাগ্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথ নিজেও নানাভাবে সেই আত্ম-পরিচয় উপস্থাপিত করেছেন তাঁর চিঠিপত্রে, প্রবন্ধে, কবিতায় বা আলাপচারীতে। তিনি নিজেকে যতটা প্রকাশ করতে পেরেছেন এবিষয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী রহস্যই অপ্রকাশিত থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথের যথাযথ ব্যাখ্যাতা ও বোদ্ধা আর এক রবীন্দ্রনাথই হতে পারেন। কিন্তু 'লাখে ন মিলল এক' —সেই প্রতিভা যখন এই মুহূর্তেই আমাদের সামনে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কবির সেই মনোভূমিকে আমাদের নিজের মতো করে উপলব্ধির প্রয়োজন আছে বৈকি।

বছর কয়েক আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যকেন্দ্রে উদ্‌যাপিত রবীন্দ্র-অনুধ্যানের আয়োজনের প্রথম দিনটিতে 'রবীন্দ্রজীবনদর্শন'-প্রসঙ্গে দু'জন বিশিষ্ট বক্তা মনোজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। ঋষি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রমানসের কল্পনাচারী ও বস্তু-সচেতন দুটি সত্তাকেই পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রজীবনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভূমিকা না থাকায়

দিকটিও তাঁর বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছিল। অপরপক্ষে যে উদার মানবতাবোধ রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাণধর্ম তার সমাদর আজকের এদেশী পাঠকের চেয়ে যে সোভিয়েট রাশিয়ায় বেশী দেখা যায়, সে বিষয়েও তিনি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রবীন্দ্রজীবনবোধের অখণ্ডতার সত্যটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একালের রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক কর্মযোগীরা যদি রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র কল্পনাবিহারী মনে ক'রে দূরে রাখেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী মানবকল্যাণের বিচিত্র আয়োজন ও নিরন্তর প্রচেষ্টার সত্যকে অস্বীকার করা হবে মাত্র। অপরপক্ষে রবীন্দ্রকল্পনালোকের মাধুর্য ও সৌন্দর্য যাঁরা কেবল সাম্প্রতিক সাহিত্যচর্চার মানদণ্ডে বিচার করতে যাবেন, তাঁরাও কবির অন্তরতম সত্তার পরিচয় না পেয়েই তাঁর সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হবেন। বস্তুত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নানা সাহিত্যাদর্শ ও জীবনাদর্শের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে সংগ্রাম ও স্বীকরণে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য ও সর্বজনীনতা—এই দুই দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকৃতি আজ আমাদের অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে।

একথা সত্য যে প্রত্যক্ষ-রাজনীতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক আরো বেশী ঘটতে পারতো। কিন্তু যা ঘটেনি, তার দ্বারা তাঁর প্রভাবের মূল্য অস্বীকার করা যায় না। প্রথম যুগের সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলী থেকে তাঁর শেষজীবনের 'সভ্যতার সঙ্কট' অবধি এমন স্বদেশ ও বিশ্বসচেতন কবি আধুনিক যুগেও ক'জনকে বলা চলে? আর লেখনীর সংগ্রামই যদি সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হয়ে থাকে, তাহলে কবিতায়, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে চিরসংগ্রামী রবীন্দ্রনাথ আমাদের বেশীরভাগ বিপ্লবপন্থী নেতার চাইতে জাতীয়জীবনে অনেক বেশী প্রভাবশালী। নির্দিষ্ট মতবাদের গণ্ডীতে আবদ্ধ না হওয়ার ফলেই আজ তিনি সর্ব-মতবাদের বিপ্লবীদের বাণীমন্ত্রের স্রষ্টা। এককালে যাঁরা রাজনীতিমূলক সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নিরাসনব্যবস্থার অগ্রসর ছিলেন, আজ তাঁরাই রবীন্দ্রানুরাগী হয়েছেন রবীন্দ্র-মনীষার অবোধ-আকর্ষণে।

এদেশে বা বিদেশে যেখানেই রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্র-অনুরাগ ক্রমবর্ধমান, সেখানেই আমাদের প্রণামের যোগ। কিন্তু রবীন্দ্র-রচনার অন্তর্লীন যে ভারতীয়তা, যে ভারতীয়তার আধারেই তাঁর বিশ্ববোধ বিকশিত, তা কি রাশিয়া বা আমেরিকা অথবা অন্যকোনো দেশের মানুষের পক্ষে সঠিক উপলব্ধি সম্ভব? আসলে এ দেশের সাহিত্যে রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপক আয়োজনের প্রবৃত্তি চলেছে মাত্র, তবু প্রতি বছরই যে রবীন্দ্র-অনুধ্যানের কোন না কোন একটি দিক নিয়ে এক বা একাধিক উচ্চমানের আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে দিকটি বিশেষ লক্ষণীয়। এখন অবধি ভারতবাসীর থেকে রবীন্দ্রনাথকে সামগ্রিকভাবে বেশী উপলব্ধি করেছেন, তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এক দেশের কবি আর একদেশে সমাদৃত হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

এই প্রসঙ্গেই বলা চলে যে, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্র-আলোচনার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন বিগত কয়েক বছরের গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর মাধ্যমে। দর্শনের

বিস্তৃত পটভূমি তাঁর মননকে সমৃদ্ধ করেছে এবং ভাষাগত নৈপুণ্যে সেই মননকে তিনি সার্থকভাবে রূপায়িত করেছেন। 'রবীন্দ্রজীবনদর্শন'-প্রসঙ্গে উক্ত সভায় তাঁর আলোচনাটি তথ্য, যুক্তি, বিশ্লেষণের সমন্বয়ে নানাদিক থেকেই শ্রোতাদের চিন্তাধারাকে সঞ্জীবিত করেছিল।

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমি বিচার করে 'নৈবেদ্য' কাব্যের পূর্ববর্তী যুগ, 'নৈবেদ্য' থেকে 'বলাকা'র যুগ, 'বলাকা' থেকে 'শিশু-তীর্থ' রচনা অবধি এবং তারপরে শেষ লেখা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিস্তারে রোমান্টিক ও উপনিষদাশ্রিত জীবনচেতনা থেকে কবি যে শেষ অবধি য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের মানবিকতাবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেকথাটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে অধ্যাপক রায় সেদিন উপস্থাপিত করেছিলেন। ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদ ও রেনেসাঁসের মানবতাবাদ রবীন্দ্রজীবনদর্শনের স্তর-পরম্পরা হিসাবে এক্ষেত্রে বিশ্লেষিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রমানসে ভারতীয় ঐতিহ্যের পটভূমিতে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধযুগ, কালিদাস, জয়দেব, বৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যযুগের ভারতীয় সাধুসন্তদের সাহিত্য প্রভৃতির নিরবচ্ছিন্ন ধারাটি মনে রাখলে তাঁর অনুভূতি-সমৃদ্ধির এক বিশাল ইতিহাস আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তবু ভারতীয় ঐতিহ্যের দু-একটি দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত নীরবতাও কম লক্ষণীয় নয়।

রবীন্দ্রপূর্ব সাহিত্যিকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বেদ উপনিষদের তুলনায় পুরাণ-সাহিত্যকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তার কারণ বোধহয় কেবলমাত্র সাকার-নিরাকার বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। পুরাণ মূলতঃ ইতিহাস বলেই বঙ্কিমের ভারত-ঐতিহ্য অনুসন্ধান পুরাণকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল, এবং তার ফলেই কৃষ্ণচরিত্রের আবিষ্কার। পুরাণ কাহিনীর সৌন্দর্য ও মহত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথও নানা স্থলেই তাঁর সাহিত্যে অনবদ্যরূপ দিয়েছেন, তবু পুরাণচর্চায় জাতীয় ঐতিহ্যের দিকটি তাঁর মননে স্বল্প সমাদৃত।

পুরাণের ভক্তিবাদ বা উপনিষদের রবীন্দ্র-আদর্শের ব্যাখ্যায় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আদর্শ—দুটিই সাধনার ক্ষেত্রে অনুভূতিসাপেক্ষ—সুতরাং এর মধ্যে যুক্তিবিচারে কোন্‌টি বেশী গ্রাহ্য সে তর্ক বেশীদূর নিয়ে যাওয়া যায় না। হয়তো রবীন্দ্রকাব্যে বা নাটকে রূপ-অরূপের দ্বন্দ্বনিহিত সমস্যা এই পৌরাণিক মননের জগৎকে গ্রহণ করলে অন্যভাবেও সমাধান খুঁজে পেত।

রবীন্দ্রমননের ক্ষেত্রে আর একটি অসহযোগ শাক্তসাধনা ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে। প্রথম জীবনে দু-একটি কালী-বিষয়ক কবিতা বা গান লিখলেও ('হরহৃদে-কালিকা' কবিতাটি অচলিত সংগ্রহে দ্রষ্টব্য) 'বাল্মীকি প্রতিভা' বা 'বিসর্জন' নাটক, 'বাতায়নিকের পত্র' বা 'শক্তিপূজা' প্রবন্ধ—এগুলির মাধ্যমে কালীকল্পনার বা শক্তি ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিকর্ষণ তাঁর নিজস্ব রুচি ও জীবনদর্শনের প্রকাশ। কিন্তু কালী-কল্পনায় বৈত মূর্তিকল্পনা থেকে অদ্বৈতচেতনার উত্তরণের যে সত্যকে আমাদের শ্রদ্ধ সাধকেরা ধ্যানে ও মননে উপলব্ধি করেছিলেন, যার ফলে, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বা রামকৃষ্ণের মতো সাধকদের অভ্যুদয়, সে সাধনার অন্তর্নিহিত জীবনসত্যের নির্মোহ উপলব্ধির দিকটিও সমান চিন্তনীয়। দুঃখ, মৃত্যু, বিচ্ছেদ—এমনি নানা রূপে রসে অনন্তসত্য মানব-অন্তরে প্রতিভাত। সেই সমগ্র জীবনবোধের দিক থেকে বাঙালীর

জাতীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপা মাতৃউপাসনার সত্যটি আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকেই উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শাক্ত উপাসনার সঙ্গে স্বার্থবুদ্ধির সহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অবশ্যই স্বীকার্য। এবং ও-জাতীয় 'ধর্মে'র অপব্যবহার সব সাধনার ধ্বজাধারীদের মধ্যেই কিছু না কিছু চোখে পড়বে। রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের প্রসঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের ইতিমূলক প্রভাবের দিকটি যখন আমরা স্মরণ করি, তখন একথাও স্মরণীয় কোন কোন প্রভাবের ক্ষেত্র রবীন্দ্রমানসে অনুপস্থিত বা কম উপস্থিত। রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব ও জীবনদর্শন অনুধাবনে এ দুই সত্যের কোনোটিই কম প্রয়োজনীয় নয়।

রবীন্দ্রমানসের বিকাশ-ইতিহাসের প্রথম পর্যায়টি উপনিষদ নিশ্চয়ই। তবে প্রথমদিকে তা বিশেষভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নির্বাচিত উপনিষদের অংশ। মন্ত্রদীক্ষার গুরু রবীন্দ্রনাথ এ-জীবনে করেননি বলেই জানি, কিন্তু জীবন থেকে জীবনে মহামন্ত্র সঞ্চারের গুরু নিশ্চয়ই তাঁর পিতৃদেব। কিশোর বয়সে মহর্ষির সঙ্গে বোলপুর এবং হিমালয় যাত্রার মাধ্যমে বালকবয়সে পাওয়া গায়ত্রীমন্ত্র অনন্ত সম্ভাবনায় অগ্রসর। 'নৈবেদ্য' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে পিতৃদেব ও ভারতবর্ষ এক হয়ে গেছে—এ কাব্য তো আর কাউকে উৎসর্গ করা যেতো না। 'নৈবেদ্য' থেকে 'বলাকা'র সৃষ্টিকাল অবধি রবীন্দ্রমানসের ভারতপথিকসত্তা উপনিষদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে সুফী, বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয় প্রভাবেও অনুপ্রাণিত। বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ও নিবেদিতার কর্ম ও মননপ্রয়াস—এ দুয়ের দ্বারা সমগ্র দেশে যে মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তার দ্বারাও এ-যুগের রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় প্রভাবিত। এক মহাজীবন থেকে আর এক মহাজীবনের উপলব্ধিতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য 'গোরা'র আবির্ভাব।

কিন্তু রোমান্টিক ভাবনাজগৎ ও উপনিষদের ধ্যানলোক—এ দুয়ের পাশাপাশি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের কর্মময় জীবনকাহিনী। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অক্লান্তকর্মী। সেইসঙ্গে জমিদারী দেখাশুনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রতিভার আর এক প্রকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম পর্বে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশভাগ যেমন স্মরণীয়, তেমনি মনে রাখা দরকার শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের গঠন-পরিকল্পনায় তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টিপাত। এই নিরন্তর কর্মপ্রয়াসের যোগসাধন তাঁর জীবন-দর্শনকে এক সচল পরিণতির পথে নিয়ে গেছে, যে পরিণাম শেষঅবধি সর্বমানবের চৈতন্যসমুদ্রে আপন সার্থকতায় পরিব্যাপ্ত।

●

॥ যোগদর্শনের সার্বজনীনতা ॥

অধ্যাপক—শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

সুপ্রাচীনকাল হতে আধ্যাত্মিক সাধনার লীলাভূমি ভারতবর্ষে যোগবিধি প্রচলিত রয়েছে। বস্তুস্বরূপের যথার্থ-উপলব্ধির জন্য যোগের প্রয়োজনীয়তা ভারতীয়-অধ্যাত্মশাস্ত্রে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিককাল হতে আরম্ভ করে পরবর্তীকাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক-তত্ত্ববিকাশের উপযোগী বিভিন্ন মতাবলম্বীরে নানাদৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু সকলেই আনুষ্ঠানিক যোগপদ্ধতিকে চরম-তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপযোগী বলে মেনে নিয়েছে। এতেই বুঝা যায় যে যোগবিধির সার্থকতা সর্বতোভাবে স্বীকার্য।

যদিও যোগের আনুষ্ঠানিক ক্রমের মধ্যে পদ্ধতিগত কিছু কিছু পার্থক্য বিভিন্নশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়, তাহলেও যোগানুষ্ঠান ব্যতীত চরমসার্থকতা সাধকের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়—এ' বিষয়ে মতভেদ নেই। যোগের বিভিন্ন দিক নানাশাস্ত্রেই আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে পাতঞ্জল যোগদর্শন প্রধানতঃ যোগের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, যোগের চরম ফল এবং যোগের লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। যোগের এই আলোচনার মধ্যেই একান্ত আবশ্যক হিসাবে দার্শনিক তত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। সুতরাং পাতঞ্জল যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গযোগ এবং তার ফল মুখ্য প্রতিপাদ্য হলেও দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা অত্যন্ত আবশ্যক বলেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঐ জন্যই যোগদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—দার্শনিক রীতিতে পদার্থতত্ত্বের মৌলিক বিশ্লেষণ এবং অষ্টাঙ্গযোগের সর্বাঙ্গীন আলোচনা। আগেই বলা হয়েছে যে অষ্টাঙ্গযোগ প্রতিপাদন করাই এ' দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তার অনুকূলরূপেই প্রসঙ্গতঃ দার্শনিক-তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে।

সাংখ্যদর্শনের পদার্থতত্ত্ব পাতঞ্জলদর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ মহর্ষি কপিল যে পদ্ধতিতে জাগতিকতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন—পাতঞ্জলদর্শনের রচয়িতা মহাযোগী পতঞ্জলি ঋষিও নিজের বক্তব্য বর্ণনা করার উদ্দেশে কপিল সাংখ্যমতই গ্রহণ করেছেন। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হতে পারে—পাতঞ্জলদর্শন সাংখ্যসম্মত পদার্থতত্ত্ব গ্রহণ ক'রে নিজের বক্তব্য প্রতিপাদন করার ফলে যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের মতই একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক দার্শনিক মতবাদরূপে গৃহীত হতে পারে। তা হলে সাংখ্যমতের বিরুদ্ধবাদী অন্যান্য দার্শনিকগণ পাতঞ্জলসম্মত যোগবিধি মেনে নেবেন কি-না। কারণ দার্শনিক তত্ত্ব এবং আনুষ্ঠানিক যোগনিরূপণ—এই উভয় মিলেই সম্পূর্ণ যোগদর্শন। তার মধ্যে যদি দার্শনিক মত গ্রহণ করা না হয়—তা হলে ফলতঃ যোগদর্শনের মতটি বর্জনীয় হয়ে পড়ে। কোনও একটি দার্শনিকসম্মত সিদ্ধান্তের আংশিক গ্রহণ এবং আংশিক বর্জন—এটা যুক্তিসিদ্ধ নয়। কারণ তা হলে অর্ধজরতী ন্যায়ের প্রসঙ্গ হয়।*

---

* অর্ধজরতী-ন্যায় একটি দোষ। কোনও একটি সামগ্রিকবস্তুর অর্ধেক অংশ নেব, অপর অর্ধাংশ ফেলে দেব—এরকম হলেই দার্শনিক পরিভাষায় তাকে অর্ধজরতীন্যায় বলে। এর দৃষ্টান্ত হল—একটি বৃদ্ধার সামগ্রের অংশ কেটে রান্না করা হবে—আর অর্ধাংশ ছিন্ন পাড়ার জন্য রাখা হবে—এটি যেমন অসম্ভব, তেমনি একটি সামগ্রিকমতের আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জনও অসম্ভব।

এটি একটি দোষ। অতএব ভারতীয়-আধ্যাত্মিক পথের দিশারী পতঞ্জলি ঋষি আধ্যাত্মিক চরম-লক্ষ্যে পৌঁছাবার যে চাবিকাঠি ঠিক করে দিয়েছেন তা' সকলের মতে গ্রাহ্য না হলে অন্যান্য দার্শনিক রীতি-অনুসারে সাধনার চরমসিদ্ধি লাভ করা সম্ভব কী না—ইহা একটি বিরাট প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য বলা হয়েছে যে যোগদর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য অষ্টাঙ্গ যোগ এবং তার ফল। এই অষ্টাঙ্গ যোগ নির্ধারণের অবসরে বৈরাগ্যের কথা বলা হয়েছে। কারণ বৈরাগ্য না হলে বিষয়াসক্তি হতে চিত্তকে ফেরানো যায় না। চিত্ত বিষয়-বিমুখ না হলে যোগের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ইহলৌকিক বা পারলৌকিক ভোগ্য বিষয়ের যথার্থ-স্বরূপের উপলব্ধি না হলে ভোগের অসারতা ঠিক ঠিক জানা যায় না। ভোগ্য বিষয়ের অসারতা না জানলে সেই বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় হয় না। এইজন্যই বিষয়ের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য দার্শনিক রীতিতে পদার্থের স্বরূপ বিচার ক'রে প্রকৃত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। সুতরাং যোগের প্রধান সহায়ক বৈরাগ্যের জন্য পদার্থতত্ত্বের প্রকৃতমর্ম জানা দরকার। এখানেই দার্শনিক রীতির আবশ্যকতা আছে। সুতরাং যে কোনও একটি দার্শনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পদার্থ-তত্ত্ব আলোচনা করা যেতে পারে। পতঞ্জলি ঋষি প্রাচীনতম হিসাবে এখানে কাপিলসাংখ্যমত গ্রহণ করেছেন। এতে বুঝা যায় কাপিলসাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠা বা প্রাধান্য প্রতিপাদন করা যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। সাঙ্গ যোগবিধি প্রতিপাদন করাই যোগশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক রূপে একটি দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার প্রয়োজন হওয়ায় সাংখ্যদর্শনের মত উল্লেখ করা হয়েছে। সাংখ্যদর্শনের মত গ্রহণ না ক'রে অন্য যে কোনও দার্শনিক মত গ্রহণ করলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারত। অতএব দার্শনিক মত এখানে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নহে। বৈরাগ্যের জন্য যে কোনও দার্শনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেই যোগবিধি প্রতিপাদন করা সম্ভব। অতএব যোগ-বিধি গ্রহণ করলেও যোগশাস্ত্রের গৃহীত দার্শনিক মত মেনে নিতেই হবে—ইহা বলা যায় না। এইজন্যই দেখা যায়—ন্যায়সূত্রকার গৌতম সাংখ্যমতের বিরুদ্ধবাদী হয়েও সাঙ্গ যোগবিধি মেনে নিয়েছেন (ন্যায়দর্শন—চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় আহ্নিক দ্রষ্টব্য)।

বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে সূত্রকার যোগদর্শনের মতবাদ খণ্ডনের জন্য একটি সূত্র করেছেন—"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (বেদান্তদর্শন, ২য় অধ্যায়। প্রথমপাদ, তৃতীয় সূত্র)। তার পূর্বেই সূত্রকার সাংখ্যমত খণ্ডন করে এসেছেন। সুতরাং সেখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠেছে যে—দার্শনিক দিক থেকে সাংখ্য এবং যোগদর্শন সমমতাবলম্বী হওয়ায় সাংখ্য-দর্শনের মতখণ্ডনের দ্বারাই ফলতঃ যোগদর্শনের মতবাদও খণ্ডিত হয়। সুতরাং যোগদর্শনের মতবাদ খণ্ডনের জন্য পৃথক সূত্র করা হল কেন? এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আচার্য শংকর বলেছেন—এই সূত্র একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যই করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যটি এই যে যোগবিধি তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপযোগী—শ্রুতিতেও এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে—"সমাগ্-দর্শনাত্মাপায়ো হি যোগঃ বেদেবিহিতঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহদারণ্যক ২।৪।৫, ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্—শ্বেতাশ্বতর ২।৮—ইত্যাদিনা চ আসনাদিকল্পনাপুরঃসরং যত্নপ্রকর্ষং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে। (শঙ্করভাষ্য ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩)। এখানে শংকরাচার্য

শ্রুতিপ্রমাণ উল্লেখ করে অষ্টাঙ্গ যোগ যে শ্রুতিসম্মত তা' স্পষ্টভাবে বলেছেন। সুতরাং সাঙ্গযোগবিধি তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপায় হিসাবে সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু যোগশাস্ত্রে সাংখ্যদর্শনের পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার ফলে মনে হতে পারে যে সাংখ্য মতবাদ ব্রহ্মসূত্রকার খণ্ডন করেছেন বলে সাংখ্যমতানুবর্তী যোগদর্শনের মতবাদও ব্রহ্মসূত্রকার স্বীকার করেন না। অর্থাৎ সাঙ্গযোগবিধি যে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের উপযোগী—ব্রহ্মসূত্রকার এটাও অস্বীকার করেন। স্বাভাবিকভাবেই এই আশংকা হতে পারে। অথচ শ্রৌতদার্শনিকের পক্ষে শ্রুতিসম্মত সাঙ্গযোগ মেনে নিতেই হবে। আশংকা যাতে না হয়—তার জন্যেই এখানে পৃথক্‌সূত্র করা হয়েছে। এই সূত্রের দ্বারা এটাই বলা হয়েছে যে যোগশাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য সাঙ্গযোগ এখানে খণ্ডন করা হয় নি। কিন্তু যে-দার্শনিক মতবাদ অবলম্বন করে যোগশাস্ত্রের বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই দার্শনিক মত এখানে স্বীকৃত হয় নি। এইজন্যই পৃথক সূত্র রচনা করে যোগশাস্ত্রের দার্শনিক মতবাদেরই খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু সাঙ্গযোগ স্বীকার করা হয়েছে। সহজ কথায় বলা যায় যোগশাস্ত্রের দার্শনিক দিক স্বীকার না করলেও তার ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক যোগবিধি স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং সাঙ্গযোগবিধি সমস্ত অধ্যাত্মসাধনায় রত মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্বতোভাবে গ্রাহ্য। অতএব বলা যায়, যোগশাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় সাঙ্গযোগ এবং তার ফল সম্বন্ধে সমস্ত দার্শনিকগণ একমত।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামী অভেদানন্দের সহিত ভান্‌হাগান্ পৃথকভাবে পরিচয় করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কথোপকথনের পর ভানহাগান নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। পুনরায় বৈকালে ভান্‌হাগান স্বামী অভেদানন্দকে সঙ্গে লইয়া সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহারা দুইজনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, একজন লোক রাজপথের উপর ছয় ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দূরবীণ-যন্ত্র মুখে দিয়া শনিগ্রহের ও অপরাপর উপগ্রহের উপর স্থির লক্ষ্য রাখিয়া সকল পথচারীকে তাহা দেখিতে অনুরোধ করিতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামী অভেদানন্দ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই লোকটির নিকট যাইয়া তাহার দূরবীণে চক্ষু স্থাপন করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন শনিগ্রহ ও তাহার একাদশ উপগ্রহগুলি জ্যোতির্ময় সৌরমণ্ডলের বৃত্তরেখায় চতুর্দিকে বেগে ভ্রমণ করিতেছে। তিনি দেখিতে দেখিতে বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন লোকশিক্ষার জন্য এই অভিনব উপায় অবশ্যই আদরণীয়। তিনি তাহাতে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু সেই পরিমাণে নিরানন্দও হইয়াছিলেন, কারণ তিনি চিন্তা করিলেন

একটি দেশকে উন্নত করিয়া কতপ্রকার উপায়ে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পথে অগ্রসর করানো যায়। অজানা এবং অজ্ঞাত বস্তু ও রহস্যকে জানাবার কতপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করা সম্ভবপর। সেইজন্য আমেরিকার মতো দেশ কতদূর উন্নত হইয়াছে এই সকল কথা চিন্তা করিয়া স্বামী অভেদানন্দ নিজের দেশ ভারতবর্ষ যে বহুদিক দিয়া কত অনগ্রসর ও অনুন্নত তাহা চিন্তা করিলেন। তিনি ভারতের অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া নিদারুণ মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, এইভাবে সকলে মিলিয়া সকল কাজে সাহায্য করিতে পারিলে তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব হইতে পারে।

স্বামী অভেদানন্দ তাহারপর সেণ্ট্রাল-পার্কে চিড়িয়াখানা দেখিতে গমন করেন। তিনি ভাবিলেন নূতন দেশে আসিয়া সেই দেশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রথম প্রয়োজন। চিড়িয়াখানায় যাইয়া উত্তর-মেরুর শ্বেত ভাল্লুক দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি দেখেন জেনারেল গ্রাণ্টের প্রতিমূর্তি। জেনারেল গ্রাণ্ট আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রিভারসাইড-সাইডে জেনারেল গ্রাণ্টের মর্মরমূর্তি তাঁহার অন্তরে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহা ছাড়া সাধারণ সহজ-সরল শিশুর ন্যায় সকল-কিছু দেখিতে ও জানিতে স্বামী অভেদানন্দ ভালবাসিতেন। তাঁহার আচার্যদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগকে সর্বদা শিক্ষা দিতেন—"সকল-কিছু নিজের চক্ষে দেখ্‌বি ও শুন্‌বি, তবেই মেনে নিবি"। তাঁহার সন্তানরাও তাই যেখানেই গিয়াছেন সেইস্থানের সকল-কিছু দেখিতে ও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। স্বামী অভেদানন্দ কাঁচের পাত্রে রক্ষিত সামুদ্রিক মৎস্য ও জীবজন্তু দেখিতে নৌকা করিয়া হাড্‌সন্-নদী অতিক্রম করিয়া ঐ অনুষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন নব-আবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ ও ইলেকট্রোস্কোপ—যে যন্ত্র সেই প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তিনি দূরবীনের সাহায্যে চন্দ্রগ্রহ দেখিতে দেখিতে তাহাতে অবস্থিত পর্বত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন একজন লোক চার্ট দেখিয়া চন্দ্রে অবস্থিত উপত্যকা ও নাম বলিয়া দিতেছে। উহা তখন প্রথম আবিষ্কার, সুতরাং আশ্চর্য হইবারই কথা। গ্রেন আইলাণ্ডে মিঃ গৌরিনের বিখ্যাত ফলোদ্যান, ফুলের বাগান, মিউজিয়াম প্রভৃতি দেখিয়া শেষে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার জীবনোৎসর্গকারী বীর সৈনিকের মর্মরমূর্তি এবং অন্যান্য বহু দর্শনীয় বস্তু দর্শন করিয়াছিলেন। আলোকের পার্শ্বে অন্ধকার, কল্যাণ-সুন্দরের পার্শ্বে অকল্যাণসূচক বহু নিদর্শনই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং চিন্তা করিয়াছিলেন যে, পরিবর্তনশীল জগতের মানুষ পরিবর্তনকেই ভালোবাসে। কিন্তু এ'কথাও ঠিক যে, পরিবর্তনের পার্শ্বে অনুসন্ধিৎসু মানুষ অপরিবর্তন ও চিরশাশ্বত কোন বস্তুর সন্ধান পাইবার জন্যও চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টা করা কিছু নূতন নয় বরং স্বাভাবিকই এই নিয়ম।

●

॥ শিক্ষা-গুরু : উপনিষদে ॥

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

জীবনে শিক্ষার গুরুত্বকে সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষণীয় বিষয় অনেক। একই গুরুর পক্ষে বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়াও সম্ভব নয়। ঐহিক শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষককেই শিক্ষা-গুরু বলা হয়। তেমনই আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য লোকে অধ্যাত্মরাজ্যের গুরুকেই বরণ করে থাকেন। এইভাবেই দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু-করণের নিয়ম চলে আসছে।

কিন্তু জীবনের পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে এই গুরুকরণ একজন ব্যক্তিবিশেষেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাই দেখা যায়, দীক্ষা হয়তো বিশেষ একজন গুরুই দিয়ে থাকেন, কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে গুরু ব্যক্তি-বিশেষে সীমিত থাকে না। শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যাপকতা বেশী বলেই জীবনে বহু শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন হয়। শাস্ত্রেও একথাটা স্বীকার করা হয়েছে :

মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

—মধুলোভী মধুকর যেমন ফুল থেকে ফুলে বিচরণ ক'রে মধু আহরণ করে, জ্ঞানলোভী শিষ্যও তেমনই জ্ঞান-সংগ্রহের উদ্দেশে বহু গুরু গ্রহণ করতে পারেন।

এখানে শিক্ষা-গুরু যে একটি ব্যক্তিই হবেন, তার মানে নেই। বিশ্ব, বিশ্ব-প্রকৃতি, পৃথিবীর জীব-জন্তু-মানুষ বা বস্তুবিশেষ গুরুস্থানীয় হতে পারে। সংসার বিরাট শিক্ষাগার। সংসারের প্রতিটি বস্তুর কাছেই কিছু-না-কিছু শিক্ষণীয় আছে। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার সমুচ্চয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা অধিগত হয়। কাজেই, বিপুল বিশ্বে শিক্ষাগুরুর সংখ্যা অসংখ্যেয়।

শিক্ষাগুরুর বিষয় নিয়ে আমাদের শাস্ত্রে-পুরাণে-সাহিত্যে প্রচুর কাহিনী ছড়ানো রয়েছে। কাহিনীগুলি যেমন মনোজ্ঞ, তেমনই শিক্ষাপ্রদ। এই সকল কাহিনীতে এইটেই বোঝানো হয়েছে, ব্যক্তির বিকাশে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্য অল্প নয়। উদার চোখ মেলে বিশ্বের দিকে তাকালে, বিশ্বের প্রতি বস্তু থেকেই শিক্ষা নেবার সুযোগ রয়েছে। যে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় আধ্যাত্মিক বোধ-বিকাশের বাধা বলে মনে করা হয়, শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ থাকলে, সেই বিষয়গুলোও শিক্ষার অনুকূলে হয়ে উঠতে পারে। মানুষ চিরকাল শিশু, এই বোধটি থাকলে জড় ও চৈতন্য, ইতর প্রাণী ও অবজ্ঞেয় পদার্থ—সকলের কাছ থেকেই কোন-না-কোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। পরম তত্ত্ব সত্য, বৃহৎ ও পূর্ণ; এই সত্যে, বৃহত্বে ও পূর্ণতায় বিধৃত নিখিলবিশ্বসৃষ্টি। অংশেও সেই সত্য ও পূর্ণতার অবস্থান রয়েছে। আকাশের ন্যায় আয়ত চক্ষু বিস্তার করে দেখলে তার সন্ধান পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল-সত্যকামের কাহিনী সকলেরই জানা আছে। জাবাল-সত্যকাম গোত্রহীন হলেও সত্যের জোরে হারিদ্রুম গৌতমের শিষ্যত্ব পেয়েছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ গৌতম তাকে সমিধ্ আহরণ করতে বলেছিলেন। গুরুগৃহে অবস্থানকালে এইটেই সেকালে ছিল শিষ্যের কৃত্য। শিষ্যদের গাভীর পরিচর্যাও করতে হ'ত। সত্যকাম এই শিষ্যকৃত্য

করতে করতে ঋষভ, অগ্নি, হংস ও মদ্গু (জলচর পাখী)—এদের কাছ থেকে ব্রহ্ম বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

গৌতম সত্যকামকে উপনীত ক'রে, চারশ' ক্ষীণ ও দুর্বল গাভীর পরিচর্যার ভার দিয়েছিলেন। সত্যকাম বলেছিলেন, এই গাভীর সংখ্যা সহস্র পূর্ণ না হলে তিনি গুরুগৃহে ফিরছেন না। বহুদিন বাইরে থেকে সত্যকাম নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করলেন। ক্ষীণকায় দুর্বল গোধন তাঁর পরিচর্যায় সুস্থ ও সবল হল এবং কালক্রমে তাদের সংখ্যা হাজারে দাঁড়াল। তখন গো-প্রধান বৃষ (ঋষভ) তাঁকে বললেন, হে সোম্য, এখন আমাদের গৃহে নিয়ে চল। ঋষভ তাঁকে এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মের 'দিক্‌কলা' সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ব্রহ্মের দিক্‌কলা সম্বন্ধীয় চতুষ্পাদ যিনি জানেন, তিনি ইহলোকে প্রকাশবান হন এবং পরলোকের জ্যোতির্ময় লোক-সকলও জয় করেন। সত্যকাম ঋষভের উপদেশ পেয়ে জ্ঞানলাভ করলেন।

ঋষভ সত্যকামকে বলেছিলেন, অগ্নিও তাঁকে ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ দেবেন। দূরের পথ। গোধন নিয়ে ফিরতে ফিরতে পথে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সত্যকাম গাভীগুলিকে থামিয়ে সেইখানেই···তাঁদের বেঁধে রেখে সন্ধ্যাকালীন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে পূর্বমুখী হয়ে বসলেন। অগ্নি তখন ব্রহ্মের পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্র-কথা সম্পর্কে অনুশাসন দিলেন। ব্রহ্ম যে অনন্ত, অগ্নির উপদেশের এইটেই ছিল বক্তব্য। সত্যকাম এই উপদেশ লাভ করে ব্রহ্মের অনন্তত্ব অনুধাবন করলেন। ফেরার পথে হংসও তাঁকে উপদেশ দিলেন। হংস তাঁকে জানালেন জ্যোতির্ব্রহ্ম-তত্ত্ব। ব্রহ্মের এই জ্যোতি অংশরূপে প্রকাশিত হচ্ছে অগ্নিতে, সূর্যে, চন্দ্রে ও বিদ্যুতে। যিনি এই জ্যোতিতত্ত্ব জানেন, তিনিও জ্যোতিষ্মান্ হন। সত্যকামকে চতুর্থ উপদেশ দিলেন মদ্গু। মদ্গু বললেন, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনেও অংশরূপে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি দেহতত্ত্বও জানেন। সত্যকাম এইভাবে ইতর প্রাণীদের কাছে শিক্ষা পেয়ে ব্রহ্মজ্ঞের মত দীপ্তি পেতে লাগলেন এবং গুরুগৃহে এসে গুরু গৌতমকে বন্দনা করলেন। গুরু তাঁকে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, একি! তুমি ব্রহ্মবিদের মতো দীপ্তি পাচ্ছ। কে তোমাকে উপদেশ দিয়েছেন? সত্যকাম বললেন, হে ভগবন্, আমি মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে উপদেশ পেয়েছি, এইবার আপনি আমাকে উপদেশ দিন। সত্যকামের কথা শুনে গুরুও তাঁকে সেই একই বিদ্যা দান করলেন।

এখানে দেখা যাচ্ছে, সত্যকামের দীক্ষাগুরু এক হলেও শিক্ষাগুরু চারজন—ঋষভ, অগ্নি, হংস ও মদ্গু। এঁরা সকলেই মনুষ্যেতর প্রাণী। পরম সত্য ছড়িয়ে আছে বিশ্বময়। মানুষ যদি 'সত্যকাম' হয়, তাহলে এই সত্যকে সে লাভ করতে পারে বিশ্বের যে-কোন পদার্থ থেকে। সত্যকামের শিষ্য উপকোশলও আত্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন অগ্নির কাছ থেকে। সে বিদ্যার সার কথা—

"যথা ব কং তথেব খং যথেব খং তথেব কমিতি"

—যাকে 'ক' বলা হয়, তাই 'খ', যা 'খ', তাই 'ক'। ক-ও পরম ব্রহ্ম, খ-ও পরম ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিদের কাছে আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তুল্যমূল্য। ইতর প্রাণী থেকেও কেমন করে

সত্য শিক্ষা করা যায়, তার আর একটি কৌতুককর কাহিনী করা হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদের ১/১২ খণ্ডে। বক দাল্‌ভ্য নামে এক ঋষি বেদজ্ঞান লাভের জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন। পথে তিনি একটি শ্বেতকুকুর দেখতে পেলেন ; অন্যান্য কুকুর তার কাছে এসে বলছে, হে পূজনীয়, আমাদের জন্য অন্ন-আহরণ গান করুন। শ্বেত কুকুর বলল, প্রভাতে তোমরা আমার কাছে এসো। পরদিন উষাকালে কুকুরেরা শ্বেত কুকুরটির কাছে এল। শ্বেত কুকুরের নির্দেশে, কুকুরেরা সমবেত হয়ে শ্বেত কুকুরকে বেষ্টন করে 'হিংকার' উচ্চারণ করতে লাগল। সে হিংকারের মর্মার্থ— আমরা ভোজন করব, আমরা পান করব ; দেবতা বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা আমাদের জন্য অন্ন আহরণ করুন। বকদাল্‌ভ্য এই দৃষ্টান্ত থেকে উদ্গীথ সামের মর্মসত্য বুঝতে পেরেছিলেন এবং কালক্রমে তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদের উদ্গাতা হয়ে তাঁদের কাম্য লাভার্থ উদ্গীথ গান করেছিলেন।

কোন-কোন পণ্ডিত ছান্দোগ্য উপনিষদের এই কাহিনীকে কাম্য কর্মের ব্যঙ্গাত্মক চিত্র বলে উল্লেখ করেছেন ; কেউ আবার মনে করেছেন, কুকুররূপী ইতর প্রাণী প্রাচীন কোন জনগোষ্ঠীর প্রতীক। যাঁরা যাইহোক, ইতর প্রাণী বা প্রকৃতির বৃক্ষ-লতা-জল যে মানুষের শিক্ষক হতে পারে, উপনিষদের এই সকল কথা তারই স্মারক। জীবন-গঠনে, জীবনের পূর্ণ বিকাশে, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ঘটাবার জন্য জ্ঞানের বিষয় ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বভুবনের সর্বত্র। পৃথিবী ও প্রকৃতি তাঁদের বরদ হস্তে জ্ঞানের সুধাপাত্র নিয়ে প্রত্যক্ষ দাঁড়িয়ে আছেন মানুষের সামনে। তাঁরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু। আগ্রহী শিক্ষার্থী এই গুরুকে সহজেই বরণ ক'রে, তাঁদের দাক্ষিণ্যে পূর্ণ হতে পারেন।

●

॥ প্রতীক্ষা ॥

শ্রীঅমরশঙ্কর ভট্টাচার্য

বেঠিক পথের গোলক-ধাঁধাঁয় অনেক ঘুরে ঘুরে
ক্লান্ত পথিক দাঁড়িয়েছি আজ তোমার আঙিনায়।
বুঝেছি এবার—সব অঙ্কের হিসাব মেলেনা খুঁজে
পাটীগণিতের নির্ধারিত উত্তর-মালায়।

ভুলের মাশুল অনেক দিয়েছি ব্যর্থ জীবন-ভরে,
দীর্ণ হয়েছে অন্তর তাই পুঞ্জিত বেদনায় ;
তুমিই দয়াল দয়া করে দীপ জ্বালিয়েছ চেতনায়
অহঙ্কারের মোহান্ধকার দিয়েছ গো দূর করে।

শেষ হয়ে গেছে যুক্তির তূণে শাণিত অস্ত্র যত।
সদম্ভাস্ফার আত্মপ্রসাদ-মোহ নিয়ে ভুলে-থাকা—
সে-রাতের শেষে দাঁড়িয়েছি এসে আকুল প্রত্যাশায়
চির-শান্তির দুয়ারে তোমার ভিখারীর মতো একা।

মনে ছিল এই ভ্রান্ত চেতনা—জপ ধ্যান যোগ বিনা
হয়তো তোমার শুভাশিস্ প্রভু কোনোদিন মিলিবে না।
বুঝেছি আজকে—কিছুই করার সাধ্য আমার নাই,
তাইতো তোমার করুণার তরে রয়েছি প্রতীক্ষায়।

॥ শাক্ত মহাজনগীতি : ইচ্ছাময়ী মা ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

শাক্তপদাবলীর বালালীলা, আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি, মনোদীক্ষা প্রভৃতি বিভাগের মতো একটি বিভাগ 'ইচ্ছাময়ী মা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র রায় সম্পাদিত শাক্তপদাবলী চয়নে 'ইচ্ছাময়ী মা'-পর্যায়ের আয়তন অতীব সীমিত। মাত্র চারিটি পদ এই অংশে সঙ্কলিত হইয়াছে। একটি রামপ্রসাদের, একটি রসিক চন্দ্র রায়ের, একটি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর, অন্যটি অজ্ঞাত কোন পদকর্তার। যে পদটি দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর সেই পদটি বিষয়ে সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র রায় লিখিতেছেন, 'সঙ্গীত সন্দর্ভ'-নামক পুস্তকে এই গানটি কুমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু সাধারণের নিকটে ইহা রামদুলালের গান বলিয়াই পরিচিত।

ভক্ত-শাক্তকবিগণের অভিমত এই যে জগতের সমস্ত কার্যই শক্তি-দেবতার ইচ্ছাক্রমে সংসাধিত হইতেছে। সে ইচ্ছা অনধিগম্য, অবোধ্য বলিয়া মানুষের নিকট প্রতীত হয়। এই ভাবধারা যে পদসমূহে প্রকাশিত তাহা 'ইচ্ছাময়ী মা'-তে সংকলিত হইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা' 'অন্তর্যামী' প্রভৃতি কবিতায় জীবন-দেবতা অন্তর্যামীর সর্বাতিগ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিয়া সেই ইচ্ছানুসারে তিনি পরিচালিত হইয়াছেন—জানাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট যিনি জীবন-দেবতা অন্তর্যামী, শাক্তপদকারগণের নিকট তিনি শক্তি-দেবতা শ্যামা-তারা।

রামপ্রসাদ সেন-বিরচিত পদটি রূপকাশ্রয়ী। তাহার আরম্ভভাগ বিষয়-বস্তুর সঙ্কেত দ্যোতিত করে।

'শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি
ভব সংসারে বাজারের মাঝে।'

এই ঘুড়ি উড়ানো অর্থে জীবজগৎকে তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মায়ামোহ-আকর্ষণের মধ্যে ফেলিয়া পরিচালনা করা। রামপ্রসাদ পদটির শেষাংশে লিখিতেছেন—

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি।
ভবসংসার সমুদ্রপারে পড়বে গিয়ে তাড়াতাড়ি॥

ভক্তির দক্ষিণায় এই বিষয়াসক্তির ঘুড়ি ভবসংসার-সমুদ্রের পরপারে উড়িয়া পড়িয়া যাইবে, ভক্তকে আর কষ্ট পাইতে হইবে না।

পদরচয়িতা রসিকচন্দ্র রায়ের পদে 'ইচ্ছাময়ী' কথাটি উল্লিখিত আছে। তারা ইচ্ছাময়ী যাঁহাকে যেমন ইচ্ছা তাঁহাকে তেমন করান। কাহাকে ডুবাইয়া দেন, কাহাকে বা পারে লইয়া যান। কালকেতু শ্রীমন্ত প্রভৃতি ভাগ্যবানের দল তারার অনুকূল ইচ্ছায় উদ্ধার লাভ করিয়াছেন।

ইচ্ছাময়ী তারা গো তোর ইচ্ছা কে বুঝিতে পারে।
যখন যারে ইচ্ছা কর, হয় ডুবাও নয় লে যাও পারে॥

একবার মুখে দুর্গা ব'লে কালকেতু তোর চরণ পেলে।
কেউ বা যোগ-সমাধি-ফলে পাচ্ছনা দেখা যুগান্তরে॥
শ্রীমন্তে কমলবনে দেখা দিয়া যাও শ্মশানে।
আবার দয়া ক'রে পরক্ষণে চরণে রেখেছ তারে॥

কবি ইহা অনুভব করিয়াই জীবনের শেষদিনে ইচ্ছাময়ীর চরণতলে শয্যা পাতিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, 'শ্রীচরণে দিব তব জীবনের শেষ বাসরে।'

দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর পদে ইচ্ছাময়ী-তারার সমুল্লেখ রহিয়াছে। তিনিই কেবল অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। ইচ্ছাক্রমে মদমত্ত হস্তী পঙ্কে আড়াইয়া পড়ে, চলচ্ছক্তি-রহিত পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, কেহ ইন্দ্রত্ব পায়, কেহ হয় অধোগামী।

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি।
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি॥

পদটির জনপ্রিয়তা অসাধারণ। অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি অলঙ্কারও উজ্জ্বল। এই পদটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার মতো হিন্দুগণের পরমানন্দ সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণমাধবের কৃপাভিক্ষা-স্তব :

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥

কলিতে কালী ও কৃষ্ণে ভেদ নাই। 'কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ কালী কলৌ গোপাল-কালিকা' এবং 'সর্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং দুর্গাবিদ্যাত্মী দেবতা'। আবার যিনিই কালী, তিনিই দুর্গা।

উপরের 'সকলি তোমারই ইচ্ছা' পদটির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িবার জন্য রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'-কাব্যে নিবদ্ধ 'অন্তর্যামী' কবিতা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিলাম :

অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
বলিতে ছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা, আপন জনারে
শুনাতে ছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত।
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে
গড়িলে মনের মতো॥

অজ্ঞাত পদকারের রচনায়ও 'ইচ্ছাময়ী' সম্বোধন দেখি। শক্তি-দেবতার মায়াতে জগতের সকলেই মোহিত, সারা জগৎ তাঁহাতে বর্তমান—

জগত তোমাতে তোমারি মায়াতে
মোহিত জগত জন।
রবি-শশী-তারা আজ্ঞাকারী তারা
সদা নিয়ম করে পালন।

পদটির শেষ পদচতুষ্টয়ে কবির বক্তব্যের স্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়—

ইচ্ছাময়ী, তব ইচ্ছায় সব হয়
কিছুই জানিনা মা তব মহিমায়
তুমি নিয়ে যাও যে পথে আমি যাই মা সে পথে
মোহে অন্ধ অনুক্ষণ।

শাক্তমহাজনগণ-বিরচিত অন্যান্য-বিষয়ক গীতিসমূহের মতো 'ইচ্ছাময়ী মা'-বিষয়ক পদবৃন্দও সহৃদয় ভক্তসমূহের আনন্দবিধানে সমর্থ। শক্তি-দেবতার প্রতি ভক্তিনিবদ্ধ কবি-অন্তর ইহাতেও পূর্ণ প্রকাশিত। সমানধর্মা পাঠকসঙ্ঘ এই মহাজনগণের মতো সর্বশক্তিময়ী তারাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পরম নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইতে পারিবে।

●

॥ গান ॥

শ্রীশান্তশীল দাশ

যারে যারে ডাকি তোরে,
তবু মা, তুই দিসনে সাড়া ;
কেমনতরো মা, তুই তবে,
ঝরাস্ শুধুই নয়নধারা।
'পাষাণী তুই' সবাই বলে,
গলিস্ যে তুই নয়ন জলে ;
আমার যে মা, আর কিছু নাই,
দুই নয়নে অশ্রু ছাড়া।

ডাকার মত হয় না ডাকা,
কেবল আমি কেঁদে মরি,
অবুঝ এ মন বোঝে নাকো,
অভিমানে হৃদয় ভরি।
অজানা তোর কিছুই তো নয়,
তবে কেন হয় না নিদয় ;
দিন কেটে যায় একটি ক'রে,
এবার এসে সামনে দাঁড়া।

॥ ক্লাসিক্, রোম্যান্টিক্ ও মিষ্টিক্ ভাবধারার বৈশিষ্ট্য ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

ক্লাসিক্, রোম্যান্টিক্ ও মিষ্টিক্ ভাবধারা কবি-কল্পনার তিনটি বিশিষ্ট ভঙ্গী। জার্মান কবি (Heinrich Heine) হেন্‌রী হাইনে ক্লাসিক্যাল রচনাকে মূর্তিশিল্প ও রোম্যান্টিক্ রচনাকে চিত্রকলার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। কোনও একটি মূর্তি রচনার থাকে একটা পরিষ্কার আয়তন, তাহার কোনটাই বাঁধা নয়, অপরিস্ফুট নয়, চারিদিক হইতে স্পর্শ করিয়া অনুভব করা যায়। অথচ চিত্রে থাকে বিষয়াতিরিক্ত বহু অর্থের ব্যঞ্জনা; তাহার পট-ভূমিকায় দৃশ্য-সন্নিবেশ ভাব ও অর্থকে বহুদূর প্রসারিত করিয়া দেয়। তাছাড়া তাহাতে থাকে আলো ও ছায়ার খেলা—চোখের ধাঁধা—ধরা-ছোঁয়ার কিছুই নাই। সুতরাং দেখা যায় নিয়ম সংযমের অনুবর্তী হওয়ার যে ভাব তাহাই ক্লাসিক্যাল্ রচনা; অন্যদিকে আপনার স্বাধীন অনুভূতি, বাসনা ও প্রেরণার সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে সত্যানুভূতির চেষ্টা; যহ তর্ক-বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চিরাচরিত প্রথা বা সংস্কারের উপর আস্থা স্থাপন না করিয়া প্রাণ যাহা চায় তাহাকেই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা, সামাজিক সুখ-সুবিধা, প্রয়োজন ইত্যাদির বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মস্তিষ্ক নহে—হৃদয়ের আলোকে যাহাকে সত্যরূপে দর্শন ও প্রতীতি করিয়াছি, তাহাকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা—ইহাই রোম্যান্টিক্ ভাব নামে পরিচিত। এ্যাবারক্রম্বের মতে ক্লাসিক্ ধর্ম হইল অটুট স্বাস্থ্য; আর রোম্যান্টিক্ ধর্ম হইল ব্যাধি। যে ব্যাধি মানুষের মনের ভিতরে আনে মাতালের মত একটা নেশা—একটা উন্মাদনা।

ক্লাসিক্ কল্পনা আদিম মানব-সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। রোম্যান্টিক্ কবি-কল্পনা পরিণত যুগের সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। যুগের পরিবর্তনে, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার বিবর্তনে, মানুষের শক্তি-রুচির রূপান্তরে ক্লাসিক্-কাব্যাদর্শ ক্রমশঃ রোম্যান্টিক্ কাব্যাদর্শে বিবর্তিত হইয়াছে। মানুষের দৃষ্টি যখন বহির্লোক হইতে অন্তর্লোকে গিয়াছে, সহজ, সরল, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার উপর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাগুলি যখন ব্যাপকতর জীবন-জিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে, মানুষের সমাজ-জীবনের অখণ্ডতা-বন্ধন যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অধিকারের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে, তখনই সাহিত্যের ইতিহাসে রোম্যান্টিকতার সূত্রপাত। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসই ক্লাসিক্ ও রোম্যান্টিক্ কবি-কল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আনিয়াছে।

ক্লাসিক্-কল্পনার প্রথম বৈশিষ্ট্য—সরলতা ও প্রত্যক্ষতা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—ইহার গৌরব সমুন্নতি এবং তৃতীয় বৈশিষ্ট্য—গঠননীতি। পূর্বেই বলা হইয়াছে ক্লাসিক্‌নীতি স্থাপত্যধর্মী। রোম্যান্টিক-কাব্য চিত্রধর্মী। রোম্যান্টিক্ কিছু বলে ভাষায়, কিছু বলে আভাসে। ক্লাসিকের গতি নির্বিশেষ হইতে সবিশেষ—রোম্যান্টিক্ কাব্যের অবলম্বন সূক্ষ্ম-ব্যঞ্জনাশক্তি, ক্লাসিক্ কাব্যের অবলম্বন বাচ্যার্থের ধ্বনি-গৌরব। প্রথমটির উদ্দেশ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি, দ্বিতীয়টির উদাত্ত গাম্ভীর্য-সৃষ্টি। বাংলা কাব্যে ক্লাসিক্ ধারার অনুবর্তন দেখা গিয়াছিল একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের

"মেঘনাদবধকাব্যে"। যেমন রাবণের শোক বর্ণনায় যে সংযম ও সংহতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ক্লাসিক্-কাব্যের উপযুক্ত :

এহেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি—
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরল শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে।

মহাকাব্যই মনে হয় ক্লাসিক্ কাব্যের প্রাচীনতম ধারা। আর গীতিকাব্যই রোম্যাণ্টিক্ কল্পনার বৈশিষ্ট্য। ক্লাসিক্-কবি যুগেরই সৃষ্টি—রোম্যানটিক্-কবি যুগস্রষ্টা। সৌন্দর্যের সহিত অজানা-বিস্ময়ের যোগাই রোম্যাণ্টিকতার প্রাণ-বস্তু। বিহারীলাল চক্রবর্তীর মধ্যেই এই অনুভব বাংলা সাহিত্যে আমরা প্রথমে বিশেষভাবে দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথে যার পূর্ণ পরিণতি।

বিশ্ব গেছে কান্তি আছে
অনুভবে আসে না ;
• • • •
তেমনি এ' বিশ্ব থেকে—কান্তি খানি দূরে রেখে
চাও বিশ্বপানে চাও কিছু কি দেখিতে পাও ?

(সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি রোম্যাণ্টিক্ কবির চরম লক্ষণ :

সেই মধু মুখ ; সেই মৃদু হাসি সেই সুধা-ভরা আঁখি
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল চিরদিন দিল ফাঁকি।

বাংলা-কাব্যে ক্লাসিকের উদাহরণ 'মেঘনাদবধকাব্য' ছাড়া অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন মধুসূদনের ক্লাসিক্ ভাবধারার অনুগামী হইলেও কাব্য-বিচারে তাঁহাদের সে স্বীকৃতি মেলে নাই।

মিষ্টিক্ ভাবধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে এইটুকুই বলা যায় যে, রোম্যাণ্টিক্ মনই রহস্যের অতলে আরও একটু ডুবিয়া মিষ্টিক্ হইয়া উঠে। আমাদের ভিতরে বুদ্ধির আলো ব্যতীত হৃদয়েরও একটা আলো আছে—তাহা সূর্যালোকের মত স্পষ্ট ও প্রখর নহে, চন্দ্রালোকের ন্যায় অস্পষ্ট, স্নিগ্ধ ও কমনীয়। চিনি, চিনি করিয়াও চিনিতে পারিতেছি না—মনের এই স্তরে জাগে রোম্যাণ্টিকতা। সমস্ত বিশ্বটাই যেন একটা আবছায়ার ঢাকা, ঘোঁয়াটে, অস্পষ্ট, কিন্তু চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আছে সীমাহীন রহস্য—অমোঘ তাহার আকর্ষণ—যিনি এইখানে আসিয়াই থামিয়া যান তিনিই রোম্যাণ্টিকধর্মী। কিন্তু মানুষের মন প্রায় এখানে থামিতে চায় না। সে চলিতে চায় আরও একটি অধিক সত্যের দিকে যাহার অনুভব বুদ্ধির আলোতে নয়—হৃদয়ের আলোতে। একটিতে অন্বেষণ—অপরটিতে প্রাপ্তি। এই প্রাপ্তি-যোগই মিষ্টিক্ কবির চরম লক্ষ্য। বিহারীলালের 'সাধের আসনে' এর উদাহরণ পাই চমৎকার :

কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের সাধনে।

রবীন্দ্রনাথে পাই আরও পরিপূর্ণ রূপ। সৃষ্টির অন্তর্নিহিত দেবীর অনুসন্ধান করিতে করিতে কবি আরও অগ্রসর হইয়াছেন 'জীবন দেবতা'র সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে। একদিকে 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র রোম্যান্টিক্ কবি-মনের চরম বিকাশ :

আর কতদূরে লয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?
বল কোন পারে ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।

অপর দিকে 'চিত্রা' কাব্যে—'চিত্রা' রূপে কবির প্রাপ্তিযোগে দেখা দিয়াছে তাঁহার আরাধিতা—মানসরূপিণী :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।

• • • •

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি তরু করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

সংক্ষেপে এটিই ক্লাসিক্, রোম্যান্টিক্ ও মিষ্টিক্ কবি-কল্পনার ভাবধারার বৈশিষ্ট্য।

●

॥ গান ॥

শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস

কে বলেছে রামকৃষ্ণ বামে
সে কি গিরিরাজ সুতা
আদরিণি উমে।

সে কি গো লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠবাসিনী,
সে কি গো যাদবের আয়ান-ঘরণী,
সে কি গো সীতা জনমদুঃখিনী
এসেছে সারদা নামে॥

হয়েছে কৈলাস দক্ষিণেশ্বর,
পতি রামকৃষ্ণ মহাযোগীবর,
শিব ও শক্তি হয়ে একেশ্বর
এসেছে ধরাধামে॥

ক্ষুদিরাম আর রামচন্দ্র ঘরে
জন্ম নিয়ে তারা কত লীলা ক'রে
গেছে মহাতীর্থ কামারপুকুরে
আর অন্নরামবাটি গ্রামে।

। দুঃখী শ্যামদাসের 'গোবিন্দমঙ্গল' প্রসঙ্গে ।

ডক্টর ত্রিপুরা বসু

মধ্যযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব যে এক যুগান্তকারী ঘটনা—একথা আর নতুন করে বলার মত নয়। তাঁর আবির্ভাব এবং মর্তলীলা বাংলা তথা পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক জীবনকে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল—তা বিশ্বের আর কোন জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে সম্ভব হয়েছিল কিনা জানি না। প্রয়াত ঐতিহাসিক প্রবর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় বলতে হয়, "চৈতন্যদেব স্বয়ং বাংলা ভাষায় কিছু না লিখিলেও তিনি বাংলাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।···ষোড়শ শতাব্দী হইতে বাংলাসাহিত্যে যে সৃষ্টির বান ডাকিয়াছিল চৈতন্যদেবই তাহার প্রধান কারণ। এই কারণে সাহিত্যস্রষ্টা না হইয়াও চৈতন্যদেব বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত অনুযায়ী চৈতন্যদেব নিমাইরূপে ভাগীরথীতীরবর্তী নবদ্বীপ নগরে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পূর্বপুরুষগণ উড়িষ্যার যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন। উড়িষ্যার সূর্যবংশীয় রাজা কপিলেশ্বরদেবের অত্যাচারের ভয়ে তাঁরা পূর্বতন বাসস্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস অবলম্বন করে চৈতন্যদেব কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে শান্তিপুর, বর্ধমান-কাঞ্চননগর, আমুয়া, কাচনি, বেতড়, ফুলীনগ্রাম, কাশীপুর ও হাজীপুর হয়ে মেদিনীপুর যান। ওখান থেকে নারায়ণগড়, জলেশ্বর, দাতন, আমরদা, বাঁশদা, রামচন্দ্রপুর, রেমুনা, ভদ্রক ও যাজপুর হয়ে পুরী গমন করেন।

এরপর থেকে উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের যেন বন্যা প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ রাঢ়ভূমির শালমহুয়া পরিশোভিত এই অরণ্যময় এলাকায় চৈতন্যদেব এবং তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম যে কি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা ঐ সময়কার মেদিনীপুরের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসটির দিকে তাকালেই অনুভব করা যায়। এ' অঞ্চল তখন উড়িষ্যার রাজ্যভুক্ত। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭—১৫৩৯ খ্রীঃ) চৈতন্যের মর্তলীলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাইহোক, ঐ সময়ই সীমান্ত মেদিনীপুরে বৈষ্ণবসাধক শ্যামানন্দ বা দুঃখী কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবধর্ম প্রচার এবং 'অদ্বৈত তত্ত্ব', 'উপাসনা সারসংগ্রহ', 'বৃন্দাবন পরিক্রমা' রচনা করেন। কবি ও সাধক গোপীজনবল্লভ দাস রচনা করেন 'রসিকমঙ্গল'। পদকর্তা বাসুদেব ঘোষ ও কানুরাম দাস রচনা করেন বৈষ্ণব পদাবলী। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সনাতন চক্রবর্তী সমগ্র ভাগবত অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেই রচিত হয় বৈষ্ণবসাধক ও কবি দুঃখী শ্যামদাসের অমর কাব্য "গোবিন্দমঙ্গল"। ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুসরণে সমগ্র কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কাব্য। বিভিন্ন উৎস থেকে কবি দুঃখী শ্যামের জীবন ও সাধনা সম্পর্কে যা জানা গেছে, তা হল—

বৈষ্ণবসাধক শ্যামদাস ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ যে পরিবারে মেদিনীপুর জেলার তাৎকালিক 'বেদারকুণ্ডা পরগণার (মেদিনীপুর শহর থেকে ষোল মাইল পূর্বে) হরিহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীমুখ। মাতা ভবানী। কাব্যে তিনি বলেছেন—

"শ্রীমুখ জনমদাতা সুমতি ভবানী মাতা
যাঁর পুণ্যে নিরন্তর ভজু ।"

অন্যত্র একাধিকবার ভণিতায় বলেছেন—

"গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমধুসূদন রস গায়।"

সম্ভবতঃ পরিণত বয়সেই কবি এ কাব্য রচনা করে থাকবেন। চৈতন্যপ্রসাদে ধন্য কায়স্থকুলসম্ভূত শ্যামদাস অনেকের মন্ত্রগুরু হন। তাঁর বংশধরেরাও বহুদিন এ রীতির প্রচলন রেখেছিলেন। 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' লেখক স্বর্গত যোগেশ বসু লিখেছেন, তিনি মেদিনীপুর জেলার নানাস্থানে 'গোবিন্দ মঙ্গল' কাব্য গান করে বেড়াতেন। ফলে তিনি একাধিক সম্ভ্রান্ত জমিদারের অনুগ্রহ লাভ করেন। ঐসব জমিদারের কাছ থেকে তিনি কিছু কিছু নিষ্কর ভূমিও বৃত্তিস্বরূপ লাভ করেছিলেন। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানিকে তিনি নিত্য পূজা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরাও সে রীতি বহুদিন অক্ষুণ্ণ রাখেন। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির জন্য লাখেরাজ ভূমির সনন্দ দেওয়া হয়। দুঃখী শ্যামের এক বংশধর গৌরাঙ্গ অধিকারী এক সনন্দ পান। তাতে কোন দেবতার নাম ছিল না। কেবল দেবসেবার কথা ছিল। পরে জমিদারী সেরেস্তার ঐ দেবতার নাম 'গোবিন্দজী' রাখা হয়। কিন্তু ঐ নামে কোন বিগ্রহ বা শিলার সন্ধান কবির পরিবারে দেখা যায় নি। মনে হয় কবির 'গোবিন্দমঙ্গল' কাব্যখানির পাণ্ডুলিপিই সেই দেবতা। স্বর্গত যোগেশ বসু লিখেছেন, "শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদে···কায়স্থ দুঃখী শ্যাম অনেকের মন্ত্রদাতাগুরু হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বংশধরেরা সেই সকল শিষ্যবংশের দীক্ষামন্ত্র দান ইত্যাদি গুরুকার্য করিয়া আসিতেছেন। এই দীক্ষাদান কার্য এই বংশে প্রোথিত হইলে সেই কার্যানুযোধক 'অধিকারী' বিশেষণটিও তাঁহাদের উপাধিতে পরিণত হইয়াছে।" কবির বংশের রীতি, কনিষ্ঠ সন্তানই মাত্র জীবিত থেকে বংশরক্ষা করে এসেছেন। সর্বনিম্ন ছয় পুরুষের নাম—

৺দ্বারকানাথ অধিকারী, ৺আত্মারাম অধিকারী,
৺গৌরাঙ্গচরণ অধিকারী, ৺রামকানাই অধিকারী,
৺বিনোদমোহন অধিকারী, ৺সীতানাথ অধিকারী।

৺গৌরাঙ্গ অধিকারীর প্রাপ্ত, ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে লিখিত সনদে বলা আছে "এইসব জমি সন দেওয়ানির পূর্ব হইতে ইহাদের দখলে আছে।" ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজদের দেওয়ানী লাভ হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে অর্থাৎ দ্বারকানাথের পাঁচ পুরুষ আগে হলে দুঃখী শ্যাম তারও প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কবির কাব্যের কোন পুঁথিতেই কাব্য-রচনার কাল সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। তাই এ কাব্যের যথাযথ রচনাকাল সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা দুষ্কর।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে রচিত মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের' পথটিও দুঃখী শ্যামকে অনেকাংশে অনুপ্রাণিত করেছিল মনে হয়। 'গোবিন্দমঙ্গলে' কৃষ্ণলীলার পূর্ণাঙ্গ চিত্রই অঙ্কিত আছে।

ভাগবতের অনুবাদরীতি অনুযায়ী সমগ্র কাব্যটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ :— কৃষ্ণের জন্মপালা, 'কৃষ্ণের নন্দালয় যাত্রা', 'নন্দোৎসব', 'পূতনাবধ', 'তৃণাবর্তবধ', 'নবনীহরণ',

'গোবৎস চরান', 'বকাসুর বধ', 'অঘাসুর বধ', 'ব্রহ্মার গোবৎস হরণ', 'ব্রহ্মার স্তব', 'তাল ভক্ষণ', 'ধেনুক বধ', বিনতাকৃত প্রপঞ্চ, 'গরুড়ের জন্ম', 'গজকচ্ছপের যুদ্ধ', 'অমৃতহারণ গরুড়ের সহিত দেবতাদের রণ', 'কালীয়দমন', 'প্রলম্বাসুর বধ', 'বস্ত্রহরণ', 'নন্দের গঙ্গাস্নানে গমন', 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড', 'রাস', 'অজগর বধ', 'অরিষ্ট অসুর বধ', 'অক্রুর আগমন', 'রজক বধ', কুব্জার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ', 'কুব্জার নিমন্ত্রণে রাজাগণের আগমন', 'কুবলয়ের যুদ্ধ', 'কংস বধ', 'কংসের নারীর ক্রন্দন', 'গুরু-দক্ষিণা', 'শঙ্খাসুর বধ', 'কৃষ্ণ-কুব্জা', অক্রুরের বাটী গমন', 'উদ্ধবসংবাদ', 'জরাসিন্ধুর যুদ্ধ', 'কালযবন যুদ্ধ', 'রেবতীর বিবাহ', 'রুক্মিণীহরণ', 'যযাতির উপাখ্যান', 'কচ উপাখ্যান', 'কামদেবের জন্ম', 'মণিহরণ', 'সত্যভামার বিবাহ', শতধনু বধ', 'কালিন্দীর বিবাহ', 'মিত্রবিন্দার বিবাহ', 'নরকরাজার মৃত্যু', 'পারিজাত হরণ', 'সুদামা চরিত্র', উষাহরণ', 'রাজসূয় যজ্ঞ', 'শিশুপাল বধ', 'লক্ষ্মণাহরণ', 'প্রভাসতীর্থ', 'সুভদ্রাহরণ', 'যদুবংশ যাত্রা', 'পাণ্ডবের স্বর্গারোহন'। অনুচ্ছেদগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বিভিন্ন পুরাণ ও সংস্কৃত মহাকাব্যের যে সমস্ত স্থানে কৃষ্ণকথা আছে তা সংগ্রহ করার জন্যে ঐসব গ্রন্থগুলি তাঁকে নিবিড়ভাবে অনুসরণ করতে হয়েছিল। তবেই তিনি সমগ্র কৃষ্ণকথা এক কাব্যের আধারে পরিবেশন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মর্তভূমিতে দৈত্যরূপ কংসের অত্যাচার ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। তাই তাপিত লাঞ্ছিত মর্তবাসীকে সেই অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার করতে স্বর্গে দেবতাদের আলোচনাসভায় মর্তে কৃষ্ণরূপে নারায়ণের অবতীর্ণ হবার পৌরাণিক কাহিনী দিয়েই দুঃশীলাম তাঁর কাব্যের শুরু করেছেন—ভাগবতের প্রথানুসারে। তাপিত মর্তজনের দুঃখে কাতর ক্ষিতি ব্রহ্মার সকাশে উপস্থিত হয়েছেন—

সহিতে না পারি ভর কাঁপে ধিতি থরহর
মায়াতে সুরভিরূপ ধরে।
অবনী ভাবিল মনে পায় পাব কোনস্থানে
গেলা দেবী ব্রহ্মার গোচরে॥
... ...

দেবতাদের পরিকল্পনানুযায়ী দৈবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তানের প্রতি কংসের ভীতিও কম নেই।

"তেজময় গর্ভ দেখি দৈবকী উদরে।
দুই মাস হইল গর্ভ জানি অনুচরে॥
কংসেরে কহিল গিয়া ত্বরিত গমনে।
দৈবকী অষ্টমগর্ভ শুনহে রাজনে।
... ...
দৈবকীর গর্ভ নহে কংসের মরণ।
গর্ভ দেখি প্রাণ কাঁপে শুন বন্ধুগণ॥"

কারাগারে জন্মের পর কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেব চলে যান নন্দের আলয়ে—

"কোলে লৈলা বসু বালারূপী নারায়ণ ॥
চৌকি প্রহরী সব নিদ্রায় মোহিত।
কপাট খসিল কৃষ্ণ দেখিয়া বিদিত ॥
ঘোর অন্ধকার বৃষ্টি করে মেঘ মালে।
বিজুরী পড়য়ে পথ বসুদেব চলে ॥
গোবিন্দ তিতিবে হেন অনন্ত দেখিয়া।
বসুর উপর যায় ফণা আচ্ছাদিয়া ॥"

'কৃষ্ণের নামকরণ'-পর্বে বাঙালী হিন্দুপরিবারের অতি পরিচিত লৌকিক অনুষ্ঠানের কথা স্মরণীয়। এই পর্বের শেষাংশের বর্ণনা নিম্নরূপ :

"শুনিঞা নন্দের বাণী অনুমতি দিল মুনি
আন দেখি কুমার তোমার।
আমার বচন ধর লৌকিক আচার কর
তবে নাম রাখিব দুঁহার ॥
মুনির বচন পেয়া নন্দ আনন্দিত হয়া
দুই শিশু আনি বিদ্যমান।
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা
শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥"

গোবৎস চরানোর সময় দুঃখী শ্যাম শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—

"শুভকরি বান্ধে চূড়া সুচাচর কেশে।
প্রফুল্ল মালতী আভা শোভে চারিপাশে ॥
শিখিপুচ্ছ শোভা করে চূড়ার উপরে।
অলকা তিলক চান্দ অতি দীপ্ত করে ॥
... ...

'নন্দের গঙ্গাস্নানে গমন'-অংশে হিন্দুর ধর্মাচরণ ও গঙ্গাস্নান পদ্ধতির কথা বিবৃত। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' মতো এতেও 'দানখণ্ড' ও নৌকাখণ্ডের' সাবলীল বর্ণনা লক্ষণীয়। সখাসঙ্গে ক্রীড়ারত কৃষ্ণ। তখনই পকসখীর সঙ্গে রাধা চলেছে যমুনায়—

"বৃকভানুরাজ সুতা রাধা ঠাকুরাণী।
রূপে গুণে অনুপম ধন্য শিরোমণি ॥
রাইরূপ মনোহর ত্রিভে নাহি সীমা।
বেদ ভেদে বিধি যার না জানে মহিমা ॥
... ...
যমুনার জল লয়া গৃহে গেল রাই।
রাধারূপ দেখি কাঁদে কাতর কানাঞি ॥"

মথুরার হাটে দুধের পশরা নিয়ে যাত্রাকালে গোপীদের সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন মরমী কবি—

"পশরা সাজন করি যত ব্রজনারী।
আরশি ধরিয়া করে নানা বেশ করি॥
কবরী উপরে পরে কুসুমের গাতা।
বামে টানি বান্ধে গোপী অপরূপ শোভা॥
সিন্দুর তিলক পরে চন্দনের ফোঁটা।
রবিশশী গিলে রাহু অপরূপ ছটা॥
... ...

এদিকে কদম্বের তলে ছলনাময় কৃষ্ণ লক্ষ্য করেন গোপীদের মধ্যে রাধাকে। এধারে গোপীদের যমুনানদী অতিক্রম করে ওপারে মথুরার হাটে পশরা নিয়ে যেতে হবে। এ' হেন সময়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব রাধার সামনেই—

"আইস সুন্দরী রাধা শুন মোর বাণী।
কিসের পশরা মাথে কোথারে সাজনি॥"
রাধা বলে, "শুন কানু নন্দের নন্দন দিনোদিয়া।
মথুরা যাইব বিকে গোরস লইয়া॥"
কৃষ্ণ বলেন, "শুন রাধে পথে মোর মহাদান লাগে।
পশরা রাখিয়া তুমে যৈস মোর আগে॥
শুনিঞা সুন্দরী রাধে কহে শ্যাম আগে।"

রাধা সেই 'মহাদানের' রহস্যভেদ করতে পারে না। তাই বলে—

"ব্রজবধূ কৈল বিধি ঘৃত ঘোল দুগ্ধ দধি
বিকি লয়্যা যাই মধুপুরে।
ইথে কিবা দান চাহ সোদর ভাগিনা লহ
পথ ছাড় নন্দের কুমারে॥
দধি দুগ্ধ যত চাহ আপনার সুখে খাও
নবনী ও যত ক্ষীর ছানা।
নাথর দানের নাম শুন হে সুন্দর শ্যাম
তরুমূলে না করিহ থানা॥"

এরপর কাহিনী চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে এক আশ্চর্য নাটকীয়তাকে পাথেয় করে।

কাব্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ছাড়াও, কৃষ্ণের লীলা যেখানে যা ঘটেছে তা সবই আছে। এককথায় কৃষ্ণকাহিনীর সামগ্রীক অংশটিকেই দুঃখী শ্যাম 'গোবিন্দমঙ্গলে' ষোলআনাই পরিবেশন করেছেন বলা যেতে পারে। কাব্যের একেবারে শেষাংশে কবির বৈষ্ণবজনোচিত বিনয় নিম্নভাবে প্রকাশিত—

"শ্রীগুরু বৈষ্ণবে যার ভকতিবে বিশ্বাস।
সে প্রাণী অবশ্য হবে গোবিন্দের দাস॥

দুঃখীশ্যাম দাস বলে আমি অল্পমতি।
যে বা পড় শুন এই গোবিন্দের গীতি॥
দোষ ক্ষমা করিবে বৈষ্ণব গুরুজন।
কৃপা কর কৃষ্ণগুণে রহু মোর মন॥
ভরসা করিয়া গুরু চরণ যুগল।
পুস্তক হইল পূর্ণ গোবিন্দমঙ্গল॥"

"গোবিন্দমঙ্গল" কাব্যের প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করে শ্রীঈশান চন্দ্র বসু ১৮০৮ শকাব্দে বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। পরিচিতি পত্রে "শ্রীমদ্ভাগবতার্থ সংকলনপূর্বক ৺দুঃখীশ্যাম দাস বিরচিত শ্রীঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক প্রুফপাঠ নির্বাচনপূর্বক বঙ্গবাসীর নিমিত্ত প্রকাশিত।" মুদ্রিত সেই গ্রন্থখানির 'বিজ্ঞাপনে' বলা হয়, "লোকহিতচিকীর্ষু ভগবান বেদব্যাস বেদের নির্যাসরূপ তত্ত্বমহৌষধকে কৃষ্ণলীলামৃতরসে মিশ্রিত করিয়া ভবরোগগ্রস্ত জনগণের অতি সুখসেব্য ও উপাদেয় করিয়া দিয়াছেন। পরন্তু তাহা সংস্কৃত ভাষার কঠিনতর আবরণে আবৃত থাকাতে সর্বসাধারণ লোকে তাহা সেবন করিতে পারে নাই। যখন সংস্কৃত চর্চা ক্রমশঃ খর্ব এবং বাংলা হিন্দি প্রভৃতি ভাষা উন্নতিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন ঋষি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থসকলের ঐ সকল স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ হইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে দীনভক্ত দুঃখীশ্যাম দাস প্রাদুর্ভূত হইলেন।"

বহুদিন যাবৎ অপ্রাপ্ত এই মহামূল্যবান পুথীর কৃষ্ণকথা তথা ধর্মকাব্যটির একটি মার্জিত ও যথাযথ সংস্করণ অবিলম্বে মানুষের হাতে পুনরায় তুলে দেওয়া দরকার।

●

॥ ভুল ॥

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

আকাশ-প্রদীপ জেলে
ভেবেছিলেম—এবার তুমি এলে,
বহুদিন আর রাতের ওপার থেকে!
যখন ডেকে ডেকে
সুর হারালো কণ্ঠ আমার
গান হলো যে সারা,—
অস্তে গেল সন্ধ্যা-রাতের তারা।

রাতের বুকে তন্দ্রা এলো;
আমার সে প্রদীপে—
আলোর শিখা কখোন গেল নিভে।

মধ্য-রাতে তন্দ্রা গেল টুটে,
দেখতে পেলেম ঝড় এসেছে ছুটে,
দুই হাতে তার বজ্রদাহন,
উড়ায় লুটে-পুটে
অট্টহাসি হেসে!
তখন ভয়ে কেঁপেছিলেম
চিনতে নারি কে সে।

এখন সকাল বেলা,—
তাকিয়ে দেখি তোমার খুশী-খেলা
ধুলোয় ভরা আমার আঙিনাতে,—
যাদের দূরে সরিয়েছিলেম
তাদের তুমি এনেছ আজ সাথে॥

বিদ্যাচর্চায় বাঙালী মণীষী ও তাঁদের প্রথম শিক্ষাগুরু

শ্রীরাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী

কীর্তিমান বাঙালী মণীষীরা অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সমস্যাসঙ্কুল, দারিদ্র্যময় পরিবেশে তাঁদের বাল্য ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়েছিল। নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করেও তাঁরা জীবনগঠনের মহতী প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন,—দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্বিকার থেকে স্বকীয় প্রতিভার উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। জীবনের এক একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করার মানসে তাঁদের অনলস শ্রম এবং অসীম ধৈর্য ও মনোবল সত্যিই বিস্ময়কর।

বাল্যকাল থেকেই মণীষীদের জীবন বিশেষ বৈশিষ্ট্যভার ভরা। অল্প বয়সে তাঁদের অনেকেরই প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। হাতেখড়ির পর, প্রথম শিক্ষাগুরুর কাছে যখন তাঁরা বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেছিলেন, তখনই তাঁদের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তার অল্পবিস্তর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁদের অনন্যচিত্ত শিক্ষকেরা কেবল শিক্ষা-দীক্ষায় সুযোগ্য ছিলেন না, ছাত্রের চরিত্র গঠনের কাজেও যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। আচার্যদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং বাসবৈচিত্র্য উল্লেখ্য উৎকর্ষের আকর ছিল। বহুদর্শী মণীষীদের জীবনে এই গুণগ্রাহী আচার্যগণের প্রভাব ও প্রেরণার মধু স্বাদ নিরবধি হয়ে আছে। সেখানে কোথাও নেই এতটুকু আবিলতা, আছে শুধু ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতার অনাবিল প্রকাশ এবং জ্ঞান-নিরঞ্জিত ভক্তির সুস্নিগ্ধ জ্যোতি।

মণীষীরা অনেকেই জীবনে বিভিন্ন ভাষা ও শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। অনেকেরই এই বুৎপত্তি ছিল সুগভীর। ভাষা ও শাস্ত্র আয়ত্তকালে তাঁদের বয়সের তেমন কোন নির্দিষ্ট সময়কাল ছিল না। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সেও তাঁরা তরুণ পড়ুয়াদের মত বিদ্যা অনুশীলনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। খনীর মতই ছিল তাঁদের ঐকান্তিকতা। তাই বিদ্যাধনে সিদ্ধকাম হতে দীর্ঘ সময় লাগেনি।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের গার্হস্থ্য নাম, বিশ্বম্ভর,—ডাক নাম নিমাই। তাঁর জীবনীই বাংলা ভাষার প্রথম জীবনী-গ্রন্থ। নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে মহাপ্রভুর জন্ম। অসাধারণ প্রতিভা, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং অশেষ গুণগরিমা তাঁকে দেবতার গৌরবে ভূষিত করেছিল। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বহুমুখী। বাল্যকাল থেকেই বিশ্বম্ভর ছিলেন একজন কৃতী ছাত্র। তাঁর মেধা ও বিদ্যোৎসাহ ছিল নির্বাধ। সেইসঙ্গে দুরন্তপনারও অন্ত ছিল না। বালক বিশ্বম্ভরের বিদ্যোৎসাহ এবং দুরন্তপনার একটি সজীব চিত্র বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্য ভাগবত'-গ্রন্থে বাণীবদ্ধ করেছেন :

'আর পথে ধরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাথেতে মোহন পুথি যেন শশধর॥
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চলাকে লাগিল যেন চারিদিকে ভূঙ্গে॥
জননী বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
তৈল দেহ মোরে, যাই সিনান করিতে॥'

বিদ্যালয়-প্রত্যাগত বালক বিশ্বম্ভরের এই চিত্রটী স্বল্প রেখায় অঙ্কিত হলেও এর মধ্যে তথ্য এবং শিল্পরস দুইই বিদ্যমান।

নিতান্ত অল্পবয়সেই নিমাই সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য এবং দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ব্যাকরণ শিক্ষার প্রথম শিক্ষাগুরু হলেন, পণ্ডিত গঙ্গাদাস; কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন বিষ্ণু পণ্ডিত এবং সুদর্শন পণ্ডিতের কাছে। ঐ আচার্য্যেরা তৎকালীনযুগে নবদ্বীপধামে সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ছাত্র গৌরাঙ্গের প্রথম শিক্ষাগুরু হিসাবে তাঁদের গর্বের সীমা ছিল না। অল্পবয়স্ক ছাত্রটির মেধা এবং বুদ্ধিমত্তার চমক তাঁদের সকলকে বিস্মিত করেছিল।

'অন্নদামঙ্গল'-এর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের আদি নিবাস ছিল, বর্দ্ধমান—ভুরসুট পরগণার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। বর্তমানে এই গ্রামটি হাওড়া জেলার অধীন। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ। প্রতিপত্তিশালী জমিদার-পরিবারে জন্ম হলেও বালক ভারতচন্দ্র সর্বপ্রকার সুখ-ঐশ্বর্য্য হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ জমিদারী সংক্রান্ত বিবাদ-বিসংবাদের ফলে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। সুতরাং ভারতচন্দ্রকে অতি দুরবস্থার মধ্যে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতে হয়। কবির বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর; ঐ বয়সেই পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে তাঁকে জীবিকা অন্বেষণে অন্যত্র পাড়ি দিতে হয়। অতঃপর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে উপনীত হয়ে কবি নতুন করে তাঁর ছাত্রজীবন শুরু করেন। সেখানে এক বিত্তশালী পরিবারে অবস্থান করে তিনি ফার্সি ভাষা অনুশীলনে উৎসাহিত হন। এই বিত্তশালী পুরুষটির নাম, রামচন্দ্র মুন্সী। অল্পদিনের মধ্যেই কবি ফার্সি ভাষায় প্রশংসনীয় বুৎপত্তি অর্জন করেন। ফার্সি ছিল সে-যুগের রাজ-ভাষা। ভারতচন্দ্রের ফার্সি-ভাষা চর্চার আদি গুরু হলেন, রামচন্দ্র মুন্সী। ছাত্রের অসামান্য প্রতিভা লক্ষ্য করে শিক্ষাগুরু সেদিন কম বিস্মিত হন নি। একজন চতুর্দশ বয়স্ক বালকের লেখা প্রথম রচনা পড়ে বিগলিত-প্রাণ রামচন্দ্র তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রটিকে ভবিষ্যতের এক সার্থক রস-বিদগ্ধ কবিরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কিশোর কবির সেই প্রাথমিক রচনাটি এখানে তুলে ধরছি:

'সেলাম হামারা পাঁড়ে দুপমে তোম্ কাহে খাঁড়ে,
সেরেসান দেখে বড়ে মেরে বাৎ ঘর তো।...

উত্তরকালে কবিত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারস্বরূপ ভারতচন্দ্র, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজার সভাকবিরূপে অবস্থানকালে তাঁর সুবিখ্যাত কাব্য 'অন্নদামঙ্গল' রচিত হয়।

বাংলা গদ্য-রচনা এবং নতুন সমাজ-চেতনার অন্যতম পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে এক সংস্কারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-পরিবারে এই মনীষীর জন্ম। বিদ্যোৎসাহী ছাত্র হিসাবে রামমোহনের যথেষ্ট সুনাম ছিল। অল্প বয়সে আরবী ও ফার্সি ভাষা আয়ত্ত ক'রে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন ও আরবী, ফার্সি বইপত্তর পড়েই তাঁর মনে একেশ্বরবাদের আদর্শ গড়ে ওঠে এবং অল্প বয়সেই হিন্দু ধর্মের অহিতকর আচার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। একেশ্বরবাদের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা ক'রে তিনি সমাজ ও

পরিবারের বিরাগভাজন হন। তারপর এই মনীষী পরিবারবর্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। জ্ঞানস্পৃহা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞান-সাধনার মধ্যেই তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস প্রবুদ্ধ হয়েছিল। দীর্ঘকাল নানা স্থানে অবস্থান ক'রে রামমোহন সর্ববিদ্যা মন্থন করেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বয়সের কোন নির্দিষ্ট সময়কাল ছিল না। প্রায় সমস্ত জীবন দুর্লভ জ্ঞানান্বেষণের মধ্যে অতিবাহিত হয়।

রামমোহন সংস্কৃত শিখেছিলেন নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের কাছে। এই আচার্যই তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার আদি গুরু। নন্দকুমার প্রথম জীবনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে তন্ত্রসাধনা করে হরিহরানন্দ নাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। বাইশ বছর বয়সে রামমোহন প্রথম ইংরাজী-ভাষা অনুশীলনে ব্রত হন। এই ভাষার শিক্ষাগুরু ছিলেন জন ডিগবী। ডিগবী সাহেব তখন রঙ্গপুরের জেলা-কালেক্টার। রামমোহন সেই সময় তাঁর অধীনে দেওয়ান অর্থাৎ রাজস্ব-আদায়বিভাগের প্রধান দেশীয়-কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ডিগবী সাহেবের মত উদার, মহাপ্রাণ পুরুষ তৎকালে খুব কমই ছিল। রামমোহনের ইংরাজী ভাষার বুৎপত্তি অর্জনে এই মহাপ্রাণ ইংরাজের অবদান অপরিসীম।

মহাপ্রাণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম মেদিনীপুর বীরসিংহের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে। কঠোর দারিদ্র্য এবং চরম দুরবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে তিনি সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন। ফলে, তাঁর উপাধি হয়েছিল, 'বিদ্যাসাগর'। বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবন শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায়। ঐ পাঠশালার পণ্ডিতমশাই ছিলেন স্বরূপচন্দ্র দাস। স্বরূপচন্দ্রের কাছেই বিদ্যাসাগরের বিদ্যাশিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি। তিনি প্রথম সংস্কৃতপাঠ শুরু করেন পণ্ডিত গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের কাছে। এই ভাষায় তাঁর অপরাপর শিক্ষাগুরু হলেন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

ঈশ্বরচন্দ্র কর্মজীবনে প্রবেশ ক'রে অন্যান্য ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথম ফার্সি-ভাষা শিক্ষা করেছিলেন, আমিউদ্দীন নামে এক মৌলভির কাছে। তাঁর ইংরাজী শিক্ষার আদি গুরু হলেন, জয়কৃষ্ণ সরকার। সেইসময় জয় মাষ্টার (জয়কৃষ্ণ সরকার) এবং গঙ্গানারায়ণ নামে দু'জন বিখ্যাত ইংরাজী-শিক্ষক বর্তমান ছিলেন। অনেকের মতে বিদ্যাসাগর প্রথম ইংরাজী ভাষা অনুশীলন করেছিলেন কলকাতার তালতলা নিবাসী সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। পরে অবশ্য রাজনারায়ণ বসু এবং নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে কিছুদিন শিক্ষালাভ করেছিলেন।

সুপণ্ডিত হরপ্রসাদ একদা বাংলাসাহিত্যে বাস্তব তথ্যচিত্র-বর্ণনায় সাফল্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বাংলাভাষায় রচিত প্রাচীনতম যে গ্রন্থখানির পরিচয় আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, তার নাম 'চর্য্যাচর্য্য বিনিশ্চয়'। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ নেপালের রাজদরবার গ্রন্থশালা থেকে ঐ পুথিখানি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন—'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গলাভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'।

এক অতি সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারে হরপ্রসাদের জন্ম। নানা সমস্যা এবং অসুবিধার মধ্যে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। সেযুগে একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। সংস্কৃত-চর্চা তিনি প্রথম শুরু করেছিলেন ভাটপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়রাম ন্যায়পঞ্চাননের কাছে। পণ্ডিতপ্রবর জয়রামের সাগ্রহচর্যা এবং অনুপ্রেরণা ভাষা-শিল্পী হরপ্রসাদের ভাষাজ্ঞানানুশীলনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উপন্যাসকলাকে আধুনিক জীবনের শিল্পরূপে গড়ে তুলতে এই মনীষীর অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই বাংলা রোমান্সের সৃষ্টিকর্তা। বাঙালীর নবজাগ্রত জীবন-চেতনার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ তাঁরই সাহিত্যে প্রথম শিল্পরূপ পেয়েছে।

ছাত্রজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভাবান ছাত্ররূপে পরিচিত ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন একদিনে ইংরাজী নামতা রপ্ত করেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক তেমনি একদিনে বাংলা বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন শুরু হয় স্বগ্রামে অর্থাৎ নৈহাটীর অন্তর্গত কাঁঠাল পাড়ায়। শ্রীরাম শিরোমনি (ন্যায়বাগীশ পূর্ণচন্দ্র) নামে এক খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন তাঁর আদি শিক্ষাগুরু। এই খ্যাতনামা পণ্ডিতের কাছে বঙ্কিম প্রথম সংস্কৃত ও বাংলাভাষা শিক্ষালাভ করেন। বঙ্কিমের ইংরাজী ভাষার অক্ষর-পরিচয় সম্পন্ন হয় একজন গৃহশিক্ষকের কাছে। সেই গৃহশিক্ষকের নাম রামপ্রাণ সরকার। ছাত্রজীবনে বঙ্কিমচন্দ্রকে আর একজন শিক্ষক যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি সেযুগের বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি। এই পণ্ডিতমশাই ছাত্র বঙ্কিমকে সর্বপ্রথম শিক্ষা দিয়েছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ এবং আদর্শ চরিত্র। এই মন্ত্র বঙ্কিমকে উত্তরকালে 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিশোর বঙ্কিম তর্কচূড়ামণির অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছেই তিনি প্রথম মহাভারত পাঠ শুরু করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিম কিছুসময় পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টিড সাহেব তাঁকে ইংরাজী পড়াতেন। ইংরাজ শিক্ষকের অধীনে তাঁর পঠন-পাঠন সার্থক হয়েছিল।

বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন উজ্জ্বল্যে ভরপুর। ছাত্রজীবনে বহুমুখী কৃতিত্ব তাঁকে একটা গৌরবময় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক তিনিই।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গার্হস্থ্য নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। গদাধরের ছাত্রজীবন খুবই সীমিত। ছাত্রজীবন শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়। গ্রামের জমিদার লাহা বাবুদের বাড়ির সামনে চওড়া নাট-মণ্ডপে সেই পাঠশালা বসত। বিদ্যামন্দিরের ব্যয়ভার বহন করতেন জমিদারমশাই স্বয়ং। বালক গদাধরের প্রথম অক্ষর-পরিচয় হয় পাঠশালার গুরুমশাই যদুনাথ সরকারের কাছে। কিছুকাল পর যদুনাথ অবসর গ্রহণ করলে, রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামে এক নতুন গুরুমশাই ঐ পাঠশালার আধ্যক্ষতার গ্রহণ করেন। গদাধর তাঁর কাছেও কিছু-

সময় পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। ছাত্রজীবন বেশীকাল স্থায়ী না হলেও, ছাত্র হিসাবে গদাধর কোন সময় অমনোযোগী ছিলেন না। একমাত্র অঙ্ক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁর পাঠাগ্রহ এবং পঠন-নিষ্ঠার সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। বালক-ছাত্রটির উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। অল্পবয়সে শিক্ষাচর্চার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল তাঁর এবং সেই ঐকান্তিক অনুরাগ তাঁকে অপূর্ব রস-স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছিল। এই বিশুদ্ধ রসপ্রাণময়তা একদিন লোকত্তর ভক্তিরসের উৎস হয়ে পরমারাধ্যা মহাশক্তির পাদপদ্মে পরমাবিষ্ট হয়েছিল। গদাধর ছিলেন শিল্পী-স্বভাবিত। ভাবুকের ধ্যানতন্ময়তা এবং দৈবী-মহিমার ভাবদ্যোতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। মাত্র একবার শুনেই পালাগান, পুরাণকথা, সংকীর্তন ইত্যাদির হুবহু শব্দরূপ অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলতেন। অল্প বয়সে পটুয়াদের সাহায্যে মৃণ্ময় মূর্তি এবং চিত্র অঙ্কনে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বালক গদাধরের নিষ্ঠাপূত চরিত্র ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় লক্ষ্য ক'রে সেদিন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল।

ধনীর দুলাল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ। বাল্যকালেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। কবির ছাত্র-জীবন শুরু হয় গৃহাঙ্গণে—সুযোগ্য গৃহশিক্ষকের আত্যন্তিক তত্ত্বাবধানে। তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাঁকুড়া নিবাসী এই আচার্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গুরুমশাই ছিলেন। মাধব পণ্ডিত নামে সেযুগে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। কবির প্রথম ইংরাজী অক্ষর-পরিচয় হয় রাখালদাস দত্তের কাছে। ইনিও ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষকরূপে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন। পরে কবির ইংরাজী শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অঘোরবাবু সেইসময় মেডিকাল কলেজের ছাত্র ছিলেন। উত্তরকালে তিনি একজন খ্যাতিমান চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিজ্ঞান-পাঠের গুরুমশাই হলেন সীতানাথ ঘোষ। সীতানাথ সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানসাধক ছিলেন। কবি প্রথম সংস্কৃতপাঠ শুরু করেন পণ্ডিত হেরম্ব তত্ত্বরত্নের কাছে। এই শিক্ষাগুরুর কাছে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ব্যাসদেবের ব্যাকরণ-সূত্রাদি রপ্ত করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার আদিগুরু, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে বিষ্ণুপদ একসময় প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। ব্রাহ্মসাধকদের কাছে তাঁর সুললিত কণ্ঠসঙ্গীত ছিল অতি প্রিয় ও সুশ্রুত। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত সঙ্গীতসাধক যদুভট্টের কাছে কিছুকাল সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। ছাত্র রবীন্দ্রনাথের পরম নিষ্ঠা, অসামান্য মেধা, এবং বিস্ময়কর প্রতিভা লক্ষ্য ক'রে শিক্ষকেরা সকলেই তাঁকে ভবিষ্যতের যুগপ্রতিভূরূপে নিশ্চিত-বাণী উচ্চারিত করেছিলেন।

বাঙালী মনীষীদের ছাত্রজীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অবস্থান করেও শিক্ষাদীক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে সৃজনভূমিতে পদক্ষেপ করেছিলেন। আপাতিক দুঃখ, কষ্ট, অভাব, যন্ত্রণা ইত্যাদি কোনটাকেই তাঁরা বিশেষ দৃষ্টিতে

অবলোকন করেন নি, বরং কঠিন সমস্যাগুলির সঙ্গে সমান মিতালি ক'রে এবং সমস্ত বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ ক'রে তাঁরা অভিষ্টপথে যাত্রা করেছিলেন। সেই পদযাত্রার পূর্বসূরীদের আদর্শ-বাণীকে পাথেয় ক'রে অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে নিজেদের প্রতিভাকে লালন করেছিলেন। তাই আজও তাঁরা লোকহৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে মহামর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত—চিরবন্দিত।

●

।। ভূত আর ভয়ের দেশ—ভুটানে ।।

শ্রীবিশ্বজিৎ দাস

শীত এসে গেল। বাজার ছেয়ে গিয়েছে ভুটানী সোয়েটারে। এই সোয়েটারের দৌলতে ভুটান নামটা আমাদের কাছে পরিচিত হলেও সে-দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের সচরাচর ঘটে না।

ভুটান নাকি Land of Thunder dragon অর্থাৎ বজ্রদানবের বিহারভূমি। নানা রকম ভূত আর ভয়ের বিচিত্র সব ধারণা আজও সেখানে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। ভুটিয়ারা বিশ্বাস করেন ঐ দেশের মাটিতেই ঝড় আর বজ্রের সহমিলনেই তাদের উৎপত্তি। আর তাই ভুটিয়াদের আদি নাম ড্রাকপা বা বজ্রমানুষ।

গবেষকরা অবশ্য মনে করেন যে ভুটিয়া আর কুচবিহারের টেকু উপজাতি এরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। সতেরশ' সালের বা ঐ সময়ের কাছাকাছি কোন এক সময়ে এক তিব্বতী বাহিনী জয় করে নেয় ভুটিয়াদের দেশ। বিজয়ী তিব্বতীরা বিপুল সংখ্যায় থেকে যায় সেখানেই; তাদের সঙ্গে স্থানীয় আদীবাসীদের বৈবাহিক সংমিশ্রণের ফলেই জন্ম হয় আজকের ভুটিয়া জাতির।

আর একদল গবেষক বলেন যে চেঙ্গিজ খাঁ তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে হিমালয়ের পথে ভারত আক্রমণ করতে এসে এই অলঙ্ঘ্য পর্বত-প্রাচীরের সামনে থমকে দাঁড়ান। তারপর উত্তর ও মধ্য ভুটান ত্যাগ করে তাদের অনেকেই আর মঙ্গোলিয়ায় ফিরে যায় নি। ভুটিয়ারা যে মঙ্গোলীয় সে কথা নিঃসন্দেহে সত্য; তবে তিব্বতী সংমিশ্রণ রয়েছে। হঠাৎ পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ কোঁকড়ানো বাবরি চুল আর শক্ত-পোক্ত দীর্ঘ চেহারা মিশ্র উৎপত্তিরই পরিচায়ক।

এই কিছু বছর আগে পর্যন্তও এই ভুটানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অনিশ্চিত আর অশান্ত। তিব্বতের মত ভুটানেও যাজক পুরোহিত সম্প্রদায়ই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। দলাইলামার মত ধর্মরাজাও ছিলেন, যিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সেই ধর্মরাজা পুনর্জন্মও গ্রহণ করতেন। এক সময় এক ধর্মরাজার অকাল মৃত্যু ঘটে আর নির্ধারিত চিহ্ন-বিশিষ্ট কোন উত্তরাধিকারীর সন্ধান না মেলায় অদ্ভুতভাবেই ধর্মরাজা-পদের বিলোপ ঘটে।

আসলে পাহাড়-ঘেরা এই অতি দুর্গম দেশের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। লিখিত অবস্থায় কিছুই প্রায় নেই। আর রাজ্যটিও হিমালয়ের এত গহন কন্দরে যে সেখান থেকে কোন সংবাদই বাইরে আসতো না। যোগাযোগের ব্যবস্থাও কিছুই প্রায় ছিল না। চারটি প্রদেশে বিভক্ত এই রাজ্যের প্রাদেশিক শাসকেরাও নিরন্তর ক্ষমতার দ্বন্দ্বেই মেতে থাকতেন। দেশের নানা স্থানেই তাই গড়ে উঠেছে জং বা দুর্গ। গত শতকের শেষের দিকে এই প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের একজন অন্য তিনজনকে পরাজিত করে নিজেকে সমগ্র ভূটানের রাজা বলে ঘোষণা করেন। ১৯১০ সালে ভারতের বৃটিশ সরকার আর ভূটান সরকার এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। সেই সন্ধিই ১৯৪৯ সালে মেনে নিয়েছেন ভারত সরকার। দেশের আভ্যন্তরীণ লড়াই গিয়েছে থেমে। ভারতের অনুরাজ্যের অধিবাসী হয়ে ভূটিয়ারা বেশ সুখেই আছে। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ইত্যাদিও অনেক ভালো হয়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে দৈনিক তিনখানা বাস ভূটানের ফুনশোলিং শহর পর্যন্ত যাতায়াত করে —সকাল সাড়ে সাতটায়, দুপুর আড়াইটেয় আর সাড়ে তিনটেয়। সকাল-সকালই রওনা হয়েছি; কি জানি, নতুন দেশ, থাকবার কি আয়োজন কিছুই জানা নেই; তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া ভালো।

ভারতসীমান্তে ভূটানের প্রথম শহর ফুনশোলিং। এপারে জলপাইগুড়ি জেলার জয়গাঁ ওপারে ভূটানের ফুনশোলিং; একেবারে লাগোয়া। উত্তরবঙ্গের আরও বিভিন্ন জায়গা থেকে জয়গাঁ পর্যন্ত বাস-সার্ভিস রয়েছে; তবে সেক্ষেত্রে ভূটার কোথাও হেঁটে পার হতে হয়; তবে তা কোন অসুবিধের ব্যাপার নয়। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে ভূটানে ঢুকলেই তোর্সা নদীর তীরে ঝকমকে পরিষ্কার ছোট শহর ফুনশোলিং।

চার-পাঁচটা হোটেল রয়েছে। ঘর পাওয়াও সহজ; ভাড়াও এমন কিছু বেশী নয়। তবে জলের অভাব রয়েছে। শহরের বিভিন্ন অংশে গাড়ীতে করে জল নিয়ে যাওয়া হয়— এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি।

ফুনশোলিং-এ যাওয়ার খরচটা আমাদের কাছে একটু বেশী মনে হওয়ায় তোলা পেরিয়ে চলে এলাম ভারতে। জয়গাঁয়ে ছোটখাটো হোটেল প্রচুর রয়েছে। তারই একটায় মনের সুখে কষি ডুবিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়া গেল।

এর পরেই ছুটলাম India House-এ ঝিম্পু যাবার permit সংগ্রহ করতে। কোলকাতায় ভূটান সংক্রান্ত খবরাখবর পাওয়া যায় 1, Ballygunge Circular Road-এ Trivoli Court-এর State Trading Corporation of Bhutan-এ; তাঁরা আমায় বলেছিলেন permit পাওয়াটা ঝামেলার কোন ব্যাপার নয়; কিন্তু অনেকের কাছেই শুনেছি তাঁরা প্রবেশানুমতি না পেয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। যাই হোক্ আমাদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন। আমাদের Identity Card-এর দৌলতে permit পেতে কোনও অসুবিধে হ'লো না। তবে 'পারো' যাবার অনুমতি মিললো না; কেবলমাত্র 'ঝিম্পু'।

সারা দিনে তিনটি মাত্র বাস থিম্পু যায়—সকাল সাড়ে সাতটায়, সাড়ে আটটায় আর সাড়ে নটায়। দীর্ঘ ১৮০ কিলোমিটার পাহাড়ী পথ। বুকিং কাউন্টারে এসে দেখি এখানে লাইন দেওয়াটাই বেআইনী। স্থানীয় লোকেরা লাইন দিতে অভ্যস্ত নয়। যে যেখান দিয়ে পারলো হুড়মুড় করে হাত ঢুকিয়ে দিল কাউন্টারের মধ্যে; প্রতিবাদ না করাই ভালো। কারণ ভুটিয়ারা বিশ্বাস করে বাহুবলেই সব তর্কের নিষ্পত্তি।

উদ্বেগ-রজনী পোহাবার পরের দিন সকালে যখন মালপত্র নিয়ে বাসের মাথায় উঠলাম তখন চক্ষু চড়কগাছ। সুটকেস রাখবো কোথায়? "স্থান নাই, স্থান নাই ছোট এ তরী"; সোনার ধানের বদলে বস্তাভর্তি গরুর মাংসেই সব ভরে গিয়েছে। তবে ভুটিয়ারা কিন্তু পরম বৌদ্ধ; ওরা হিংসা একদম পছন্দ করে না; গরু খায় কিন্তু মারে না কক্ষনো। এসব মাংস চালান আসছে জলপাইগুড়ি থেকে। আর থিম্পুতে গিয়ে তাদের এই পরম বৌদ্ধত্ব নিয়ে শুনেছি এক অদ্ভুত গল্প। এরা নাকি গরুকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে পাহাড়ের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যায় যেখান থেকে পড়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকে না। গরু পড়ে যায়; মরেও যায়। তারপর তার মাংসে মহানন্দে ভোজ শুরু হয়। অহিংস বৌদ্ধরা নিজেদের হাতে তো গরুটিকে মারে নি।

বাস চলতে শুরু করেছে। ভুটানী কথাবার্তার বাতাস সরগরম। বাঙালী বলতে আমরা মামাভাগ্নে আর উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজের রসায়নের বিভাগীয় প্রধান ও তাঁর পরিবার।

আঁকাবাঁকা পিচঢালা পাহাড়ী পথে আজ বাস স্বচ্ছন্দে ছুটে চলেছে। দুপাশে দীর্ঘ পাইন আর ফারের অরণ্য। কিন্তু কিছু বছর আগে পর্যন্ত এ পথে আসতে হোতো ভুটিয়া গরু বা পাহাড়ী খচ্চরের পিঠে। ৯ ঘন্টার পথ অতিক্রান্ত হোতো ৯ দিনে। মাঝে মাঝে রাস্তার অবস্থা এখনও বেশ খারাপ; সেখানে কাজ করছে বিভিন্ন ভারতীয় কোম্পানী।

এক সময় চড়াই-উৎরাই শেষ করে বাস এসে পৌঁছয় সমতল রাস্তায়। থিম্পু যতই এগিয়ে আসছে ততই চারপাশ ভরে উঠছে বেগুনী রঙের ফুলে। শুধু ফুল আর ফুল; পুরো উপত্যকাটা যেন বেগুনে রঙের পোষাকে সেজেছে। সেই সাথে আছে আমাদের পরিচিত হলুদ গাঁদা।

ভয় ছিল থিম্পুতে থাকার ব্যবস্থা কি হবে সেই নিয়ে। কারণ ছোট শহর, হোটেলও কম; তার ওপর সেটা দশেরা উৎসবের সময়। তবু খুঁজি তো নিতেই হয়। তবে ঘর মিলে গেল। ব্যবস্থা মন্দ নয়; আর হোটেলে থাকবোই বা কতক্ষণ? কেবল তো রাত্রি যাপন; তারপর পায়ে হেঁটে চষে ফেলো সারা শহরটিকে।

ছোট্ট শহর। ঝকঝকে পরিষ্কার রাস্তাঘাট; চওড়া ফুটপাথ; চমৎকার কারুকাজ করা কাঠের সারি সারি দোকান আর বাড়ী। রাস্তায় ঝকমকে টোয়াটো গাড়ী। ভারতীয় গাড়ীও রয়েছে দু'একটা। আর রয়েছে লোডশেডিং।

ভূটিয়াদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো। বিরাট একটা ভোম্বা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—দেখে মনে হয় কোন কাজ নেই। এই ভোম্বাগুলোর নাম যদু। নামে বেশ সুন্দর হলেও গন্ধে কিন্তু ভূত পালাবে। স্নানও এরা করে না বড় একটা; যদিও এমন কিছু ঠাণ্ডা নয়।

দুপুরের দিকে ডংএ এলাম। ডং অর্থে দুর্গ। ভীষণ শক্ত-পোক্ত চেহারা। তারই দোতলার বিরাট প্রাঙ্গণে বসেছিল মুখোশ-নাচের আসর। নাচ আর বাজনা। ভৌতিক আর আধিদৈবিক কল্পনা মিশেই এইসব নাচের সৃষ্টি; মুখোশ কাল্পনিক অপদেবতার প্রতীক। ঝড়, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, দাবানল এইসব নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই এরা আধিভৌতিক শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছে।

যে-কোন উৎসব বা ধর্মাচরণের অঙ্গ এই মুখোশনৃত্য। ভূটানে এখন যে ধর্ম সাধারণ-ভাবে প্রচলিত তার নাম দুক্‌পা-কাজুপা বৌদ্ধমত। এর সৃষ্টি হয়েছে আদি ধর্ম 'বন' আর তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম এ-দুয়ের সংমিশ্রণে। 'বন' পুরোহিতকে বলা হয় 'পাউ'। তিনি একাধারে যাদুকর, জ্যোতিষী এবং ওঝা। এঁরাও উপস্থিত ছিলেন এই নাচে।

দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই নাচের পোষাক আর মুখোশ বেশ রংচঙে হলেও নৃত্যভঙ্গী একই রকম; তার সাথে শিঙা আর ড্রাম বেজে চলে একই একঘেয়ে সুরে।

শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে তীর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। এটাই ভূটিয়াদের জাতীয় খেলা। গাড়ীর ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা যেতে পারিনি সেখানে।

আর কিছুই প্রায় দর্শনীয় নেই থিম্পুতে। কিন্তু আছে এক বিচিত্র দেশ দেখার আনন্দ —যে-দেশ ভূত আর ভয়ের; যে-দেশ ছেয়ে রয়েছে এমন বিচিত্র ফুলের ভারে। আর মানুষকে দেখা। সে-ও তো বড় কম দেখা নয়।

●

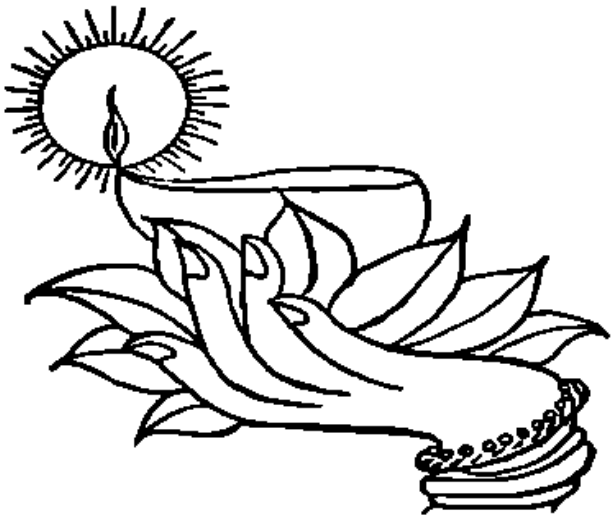

॥ পিকাসো-র শিল্পীজীবনের আর এক অধ্যায় ॥

শ্রীদিবাকর সেনরায়

পিকাসো তাঁর প্যারিসের ষ্টুডিয়োতে অভ্যাগত বন্ধুবান্ধবদের একটি জিনিষ প্রায়ই দেখাতেন। সেটি হলো তাঁর দুটো হাতের একজোড়া ব্রোঞ্জনির্মিত মডেল। এর তাৎপর্য অনুমান করা চলে এভাবে : পিকাসো সম্ভবতঃ বলতে চাইতেন—'ভাখো, শিল্পীর একজোড়া হাতের কি মহিমা ; কতো বিচিত্র অঙ্গন্ত সৃষ্টিই না সম্ভব হয়েছে এই হাতের সাহায্যে !'

সৃষ্টির বৈচিত্র্যে এবং বিপুলতায় পিকাসো যে অতুলনীয়—এ সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। এই শতকের চিত্রকলার ইতিহাসে পিকাসো-র বিস্ময়কর প্রতিভা যেমন অবিস্মরণীয় ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে, তেমনিই অপর আর একটি শিল্পমাধ্যম সিরামিক্স্‌এও তাঁর অনন্যসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে।

অনেকটা আকস্মিকভাবেই পিকাসো সিরামিক্স্ মাধ্যমটির প্রতি আকৃষ্ট হন। উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের একটি দিন। দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত হবার ইচ্ছেয় পিকাসো এসেছেন প্যারিস থেকে কিছুটা দূরে শিল্পীবন্ধু লা পিয়ের কোটএর বাগানবাড়িতে। হেমন্তের সেই দিনটি হয়তো কেটে যেতে পারতো শিল্পীবন্ধুর নিভৃত বাগানবাড়ির ষ্টুডিয়োর শান্ত নৈঃশব্দের মাঝে ; কিংবা এক পা দু'পা করে পিকাসো চলে যেতে পারতেন অনতিদূরে সমুদ্রবেলায়—যেখানে সোনালী বালুশয্যার ওপরে হেমন্ত-আকাশের গাঢ়নীল আর সমুদ্রের সবুজাভ নীল রঙ-এর দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চলতো। এর কোনোটাই কিন্তু ঘটলো না। মনে হয়, অবচেতনের কোনো এক অমোঘ নির্দেশে হেমন্তের সেই শান্ত অপরাহ্নে অলস চরণে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে পিকাসো এসে উপস্থিত হলেন একটি বাড়ির সামনে—যেখানে তখন চলছিলো শিল্পিত সিরামিক্সএর একটি প্রদর্শনী। অনুমান করা যায়, কোনো শিল্পীবন্ধুর কাছে প্রদর্শনীটির কথা আগেই শুনেছিলেন পিকাসো। কারণ প্রদর্শনীটি সুরু হবার

কয়েকদিনের মধ্যেই শিল্পী এবং শিল্পরসিক মহলে প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত নিদর্শনগুলোর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো।

প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত সিরামিক্‌স্‌গুলোর স্রষ্টা নিকটবর্তী ভ্যালরিস্ পল্লীর কয়েকজন সিরামিকশিল্পী। এঁরা পুরুষানুক্রমে ভ্যালরিস্-এ বসবাস করছিলেন। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তার অগ্রবর্তী সময়ে—অর্থাৎ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বছরগুলোতে ভ্যালরিস্‌এর শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য পরিবেশে সিরামিকশিল্পীদের কাজকর্ম বিশেষ ব্যাহত হয়নি। সিরামিক তৈরীর উপযোগী মাটি ভ্যালরিস্‌এই সহজলভ্য ছিলো, তাছাড়া সিরামিক সেঁকবার জন্যে যে-জ্বালানী কাঠের দরকার—সে-জ্বালানী কাঠও সংগ্রহ করা চলতো অদূরবর্তী পাইন গাছের জঙ্গল থেকে। একটি জিনিষের অভাব সেসময়ে ভ্যালরিস্‌এর সিরামিকশিল্পীরা বোধ করছিলেন; সে-জিনিষটির নাম লেড্ অক্সাইড্। নিম্ন গলনাঙ্কের গ্লেজ—অর্থাৎ, সিরামিকএর ওপর যে-অত্যন্ত চিক্কন কাঁচীয় প্রলেপটি লাগাতে হতো—সেটি তৈরী করতে হলে লেড্ অক্সাইড্ ছিলো অপরিহার্য। লেড্ অক্সাইড্‌এর অভাবে ওই সময়ে ফ্রান্সের সিরামিকশিল্পীদের যেমন একদিকে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তেমনই অন্য দিকে বিকল্প আবিষ্কারের চেষ্টায় তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা এবং পরীক্ষানিরীক্ষার বৈজ্ঞানিক মনোভাবও বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো। এর ফলে গ্লেজএ লেড্ অক্সাইড্‌এর বদলে টিন্ অক্সাইড্, বোরাক্স এবং আর্সেনিকও ব্যবহার ক্রমশঃ প্রচলিত হলো।

উল্লিখিত প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয়ে পিকাসো অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে শিল্পিত সিরামিক্‌স্‌এর নিদর্শনগুলো দেখলেন। শুধু দেখেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, হাত বুলিয়ে অনুভব করলেন বিভিন্ন সিরামিকএর গড়ন এবং জমির বুনোট (texture)। সিরামিক্‌স্‌গুলো হাতে তুলে নিয়ে যেমন ওগুলোর ওজন সম্বন্ধে আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন, তেমনই কোনো কোনোটির গায়ে আঙুলের মৃদু আঘাত করে শুনতে পেলেন মধুর অথচ ক্ষীণ ধ্বনিতরঙ্গ। এভাবে দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণের মাধ্যমে এক অনাস্বাদিত রসলোকে পৌঁছে গেলেন পিকাসো। তাঁর শিল্পীসত্তার এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়ে গেলো।

কিছুদিনের মধ্যেই ভ্যালরিস্‌এ গিয়ে হাজির হলেন পিকাসো। সিরামিকশিল্পীদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে গোড়া থেকে শেষ অবধি তাদের কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন মাটি নিয়ে নিজেই বসে গেলেন সিরামিক তৈরী করতে।

পিকাসো-র সিরামিক সৃষ্টির অধ্যায়টিকে মোটামুটিভাবে তিনটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে—অর্থাৎ গোড়ার দিকে পিকাসো সাধারণতঃ সিরামিক-থালাই চিত্রিত কিংবা অলংকৃত করতেন। মনে রাখতে হবে, পিকাসো মূলতঃ ছিলেন চিত্রশিল্পী এবং ক্যানভাস্‌এর সমতল জমিতে চিত্রাঙ্কনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সেজন্য স্বভাবতঃই তিনি গোড়ার দিকে থালার সমতল জমিকেই বেছে নিয়েছিলেন চিত্রাঙ্কনের জন্যে। এ সময়েই পিকাসো পরিচিত হলেন বিভিন্ন সিরামিক-রঙ ও গ্লেজএর সঙ্গে। যথাযথ উত্তাপে ভাটিতে সেঁকবার পরই যে কেবলমাত্র সিরামিক-রঙএর আকাঙ্ক্ষিত শেড্ (shade) পাওয়া সম্ভব হতে পারে—হাতে

কলসে কাজ করে এ-তথ্য আবিষ্কার করে সিরামিক-রত সম্পর্কে এক নতুন অভিজ্ঞতা পিকাসো লাভ করলেন।

দ্বিতীয় পর্বে সিরামিকস্‌এর বিভিন্ন গড়নের ত্রিমাত্রিক গঠনে আকৃষ্ট হয়ে পরিণত বয়সে নবীন শিক্ষার্থীর মতো ভ্যালরিস্‌-এ কুমোরের চাক (potters' wheel) এর সামনে বসলেন পিকাসো। চাকএর ঘূর্ণায়মান গতিতে নমনীয় মাটিতে মহান শিল্পীর হাতে সৃষ্টি হলো বিচিত্র এবং বিভিন্ন গড়নের অসংখ্য সিরামিকপাত্র। চাকএ তৈরী বর্তুলাকৃতি কোনো কোনো পাত্রের গড়নকে পরিবর্তিত করে ভারসাম্যতার এক নতুন মহিমা সৃষ্টি করলেন।

ভাস্কর্য অথবা স্থাপত্যের গঠনরীতিকে অবলম্বন করে অত্যন্ত দ্রুত অঙ্গুলিচালনা করে যেসব সিরামিকস্‌ পিকাসো তৈরী করেছিলেন—সেগুলোকে পিকাসোর সিরামিক সৃষ্টিসম্ভারের তৃতীয় অথবা চূড়ান্ত পর্বের সৃষ্টি নামে অভিহিত করা চলে। এই পর্বে রচিত হয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক সিরামিক-ভাস্কর্য এবং মানুষ ও পশুপাখির সাদৃশ্যযুক্ত বিভিন্ন গড়নের ভাস্কর্যসদৃশ সিরামিকস্‌।

সিরামিকস্‌ সৃষ্টির অধ্যায় প্রসঙ্গে শিল্পকলার ক্ষেত্রে পিকাসোর অবদানের কথা বলতে হলে একথাই বলতে হয় যে, এই মহান শিল্পী চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে চিত্রকলার ভাস্কর্যতাকে মুক্ত করেছিলেন বহুযুগ-প্রচলিত প্রথাগত রূপবন্ধ, পরিপ্রেক্ষিত এবং বিন্যাসের বন্ধন থেকে। প্রথাগত সিরামিকস্‌এর ভাস্কর্যসদৃশ ত্রিমাত্রিক জমাট গড়নের যে-সীমান্বিত রূপবন্ধন—সেই রূপবন্ধনও ভেঙে দিলেন পিকাসো। মহান শিল্পীসত্তার স্পর্শে তাঁর সৃষ্ট সিরামিকগুলো প্রথাগত রূপবন্ধনমুক্ত হয়ে অসীম অরূপলোকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলো।

●

॥ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র ॥
শ্রীযুক্ত অমিয় রঞ্জন চৌধুরী মহাশয়কে লিখিত

(১)

দার্জিলিঙ্
২১-৫-১৯৩৭

স্নেহের অমিয় রঞ্জন,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি নিয়মিতভাবে দুই বেলা নিষ্ঠার সহিত জপ, ধ্যান ও প্রার্থনা করিবে। তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন হইয়া তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া দিবেন।

বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী—
অভেদানন্দ

(২)

দার্জিলিঙ্
৮-৬-১৯৩৭

স্নেহের অমিয় রঞ্জন,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। তুমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিত্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে এবং যথাসাধ্য জপ ধ্যান করিবে। তিনি নিশ্চয়ই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী—
অভেদানন্দ

(৩)

দার্জিলিঙ্
২৮-৬-১৯৩৭

স্নেহের অমিয় রঞ্জন,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। মনস্থির করা অত্যন্ত কঠিন। নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিবে। জপের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি চিন্তা করিবে। অন্য চিন্তা মনে উঠিলে তাড়াইয়া দিবে।

আমার পুস্তক "আত্মবিকাশ", "ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম" ইত্যাদি পাঠ করিবে। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী—
অভেদানন্দ

(৩)

দার্জিলিঙ্
১৪-৮-১৯৩৭

স্নেহের অমিয় রঞ্জন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। বর্তমানে আমার শরীর অসুস্থ। সেইজন্য চাঁদাইলে যাওয়া কোনমতে হইতে পারে না।

যাহারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ৺শারদীয়া পূজার সময় কলিকাতায় বেদান্ত সমিতি ভবনে আসিতে বলিবে। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী—
অভেদানন্দ

(৪)

দার্জিলিঙ্
২৫-৮-১৯৩৭

স্নেহের অমিয় রঞ্জন,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। জপ করিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি হৃদয়ে স্থাপন করিয়া চিন্তা করিবে। এবং যাহাতে তাঁহার মূর্তি স্থায়ী থাকে এবং মন স্থির হয় তাহাই প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কৃপা হইলে মন অন্তর্মুখী হইবে।

বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে। এখন এখানে দিবারাত্র বৃষ্টিপাত হইতেছে। আমি প্রায় তিন সপ্তাহ পরে কলিকাতায় যাইব। এবার আমার জন্মতিথিপূজা ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর হইবে। তখন আমি কলিকাতায় থাকিব। আশ্রমের সমস্ত কুশল। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী—
অভেদানন্দ

(৬)

দার্জিলিঙ্
১৩-৯-১৯৩৭

স্নেহের অমিয় রঞ্জন,

তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া প্রীত হইয়াছি। বর্তমানে আমার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভাল আছে এবং আশ্রমের সমস্ত কুশল। আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইবার মানস করিয়াছি। সকলই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাধীন। তুমি যাহা ব্যাকুলতার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবে তিনি তাহা তোমাকে দিবেন। হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। অধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভাকাঙ্খী—
অভেদানন্দ

- মধুসূদন রচনাবলী একখণ্ডে ইংরেজিসহ সমগ্র রচনা [৩২·৫০]
- রমেশ রচনাবলী একখণ্ডে সমগ্র উপন্যাস (৬টি) [২৫·০০]
- দীনবন্ধু রচনাবলী একখণ্ডে সমগ্র রচনা [২৫·০০]
- বঙ্কিম রচনাবলী প্রথম খণ্ড সমগ্র উপন্যাস (১৪টি) [৩০·০০]
  দ্বিতীয় খণ্ডে সাহিত্য অংশ।
  [যন্ত্রস্থ]
- গিরিশ রচনাবলী পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা [প্রতি খণ্ড ২৫·০০]
- তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ তিন খণ্ডে সমগ্র ছোটগল্প [প্রতি খণ্ড ৪০·০০]
- বৈষ্ণব পদাবলী প্রায় চার হাজার পদের আকর গ্রন্থ [৭৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৭০০০০৯

অবতার লীলার অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য মূলগ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রী-ম কথিত

(৫ম খণ্ডে সমাপ্ত) মূল্য : প্রতি সেট : কাপড় ৭০ টাকা, বোর্ড ৬০ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর, তাঁর অমৃত-কথার **ভাণ্ডারী**, তাঁর "**আবিষ্ট**" ভাগবতকার হলেন **শ্রী-ম** (৺মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। "কথামৃত" শুনিয়া **শ্রীশ্রীমা** বলেন শ্রীম'কে—"তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন"। **স্বামীজী** উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, "...এখন বুঝিলাম...এই মহান ও বিশাল কাজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনীষী **Romain Rolland** বলেন, Sri M's work is of Stenographic exactitude. মনীষী **A. Huxley** বলেন, Sri M's work is Unique in the World's literature of biography ইত্যাদি।

প্রকাশক : শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)

১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০০ ০০৬। ফোন : ৩২-১৭৫১।

Phone : 24-2207, 08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৪২-৬৩৫৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

(মিত্রা সিনেমার পাশে)

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণু-র

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

উৎসব

প্রাণবন্ত হোক আনন্দ-সম্প্রীতির পরিবেশে সকলের অংশগ্রহণে···সম্পদ ছড়িয়ে পড়ুক সমাজের সর্বস্তরে সকলে মিলে ভাগ ক'রে ভোগ করায়।

★

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ১৭. আর এন মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

রেজিঃ অফিস : ৭, বেন্ড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১

IN MEMORY OF

Shri Nitai Chandra Roy

Days of Darkness Often Come
Tears of Silence Often Flow—
Your Memory Is Fresh
In My Heart,
Though You Left Me So Suddenly,
Two Years Ago.

By
Sefali N. Roy

শরৎ এল। ঘরে ঘরে ছুটির নিমন্ত্রণ
পৌঁছে দিল আকাশের লঘুপক্ষ মেঘ।
ফুলের সৌরভে আমোদিত বাতাবরণ।
আসুন। বেরিয়ে পড়ি। ক্লান্ত কোলাহল
থেকে অনেক দূরে প্রকৃতির প্রচ্ছায়
বিজনতায়। সাদর অভ্যর্থনায়
প্রতীক্ষা-চঞ্চল সিন্ধু। স্থির পর্বত।
আর, মন্দিরার মৃদুতানে মূর্ছিত মন্দির।
আপনার এই নিমন্ত্রণের
সানন্দ সঙ্গী আমরাও।

আপনাদের নিরন্তর সেবায় রতী
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

PHONE : 77-1259

With Best Compliments of :—

SUSANTA DAS & BROS.

Manufacturers of :

Dies, Punches, Press Jobs, Valve

WASHER SPRING.

Electrical & Mechanical Parts ETC.

3, BANERJI PARA ROAD,
SURSUNA
CALCUTTA-700 061

With Best Compliments From :

J.K. STEEL (A Division of J.K. Synthetics Ltd.)
7, COUNCIL HOUSE STREET,
CALCUTTA-700 001.

TELEGRAM : 'BALINGHOOP'
TETEPHONE : 23-6181 (7 Lines)

- JUTE BALING HOOPS
- BOX STRAPPINGS
- COLD ROLLED STRIPS
- CABLE TAPES
- HIGH CARBON WIRES & STRANDS
- MILD STEEL WIRES
- WIRE ROPE SLINGS
- STEEL WIRE ROPES

With Best Compliments of :

EAST END ENTERPRISES

Manufacturers & Dealers of :

TEA CHEST AND COMPONENTS
10, GORA CHAND ROAD,
Calcutta-700 014

Phone : { Office : 55-6621
Factory : 55-1861

With the best Compliments of :—

LEONARD CARD-BOARD BOX FACTORY (P) LTD.

Art Printing Card-Board Makers
Corrugated Board & Box
Manufacturers

Office :
29A, Aurobinda Sarani
Calcutta-700 005

Factory :
1-1, Galiff Street,
Calcutta-700 003

পশ্চিমবঙ্গে
মাঝারী ও বড় শিল্পস্থাপনের পরিকল্পনা থাকলে
আমাদের কাছে আসুন

নতুন শিল্পস্থাপন (যার যন্ত্রাংশ বাবদ বিনিয়োগ ২০ লক্ষ টাকার বেশী।) অথবা বর্তমান শিল্পের সম্প্রসারণ যাই করতে চান, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাকে নানা ভাবে সাহায্য করতে পারি।

শিল্প নির্বাচন থেকে শুরু করে উৎসাহবর্ধক নানারকম সরকারী অনুদান এবং মেয়াদী ঋণ আমরা দিতে তো পারবই এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপনেও সহায়তা করব।

শিল্পোন্নয়নে সহায়তার নির্ভরযোগ্য নাম

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন পর্ষৎ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

টেলিফোন : ২২-৮৩৮৫ (৫টি লাইন)

টেলেক্স : ০২১-৭৫৫৮-বি-আই-ডি-সি-ইন

With the Compliments of :

BATLIBOI & COMPANY LTD.

Machinery Division

26, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700 001

Telephone : 23-8831/4
Telex : 021-7289
Cable : BATLIBOICO

Hydraulic Pumping Stations : Airconditioning & Refrigeration : Industrial Machinery : Environmental Engineering Agricultural Equipment : Diesel & Electrical Pumpsets Instrumentation : Power Engineering : Diesel Generating Sets : Hand Tools : Material Handling : Construction Equipment : Industrial Raw Materials : Exports.

Registered Office :
P. O. Box 190A
V. B. GANDHI MARG, FORT
BOMBAY-400 023

With Best Compliments from :—

MGF

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED
(ESTD. 1930)

Space Donated By :—

S. PATRA

RAMCHANDRAPUR, JOKA,

24-PARGANAS.

Space Donated by .—

PHONE : 33-2110

ASSAM WOOD DISTRIBUTOR

34/2, BEADON STREET,

CALCUTTA-700 006

Space Donated by :—

RAMDUTT-SHYAM SUNDAR

TIMBER MERCHANTS

67/26, STRAND ROAD,

CALCUTTA-700 006

Gram : "DAYLIGHT"

Phone { Office : 23-2677, 22-3753
Resi. : 43-3237, 44-1008
Godown : 34-9654

INDIAN TRANSPORT CORPORATION

5 & 6, FANCY LANE, (4th Floor) CALCUTTA-700 001

(PREMIER ROAD CARRIERS & CONTRACTORS)

You must not tolerate the troubles of the supply of :

AIR, LIGHT, WATER & MIKE

Contact :

THE MISCO

129, Raja Dinendra Street, Calcutta—700 004

PHONE : 55-4843

SPACE DONATED BY :

NORTH 24-PARGANAS CEMENT DEALERS ASSOCIATION

14, K. K. MITRA ROAD,

P. O. BARASAT, 24-PARGANAS

Regd. No. S/27132

With Best Compliments of :—

BRITISH ELECTRICAL & PUMPS PRIVATE LTD.

4, B. B. D. BAG EAST,
CALCUTTA-700 001

Gram :	Telex :	Phones :
'BHOWMKAL'	021-2426	22-7826, 27, 28 & 23-8714

Phone : 55-4096

TARU ELECTRIC STORES

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS AND CONTRACTORS.

Office & Workshop :

17/1, BHIM GHOSH LANE, CALCUTTA-700 006

DIFFERENT TYPES OF OIL ENGINE, DYNAMO, ELECTRIC MOTOR, PUMP, FAN, ETC.
ARE AVAILABLE ON HIRE AND REPAIRING DONE AT MODERATE RATES.
WE ALSO SUPPLY EVERY TYPE OF ELECTRICAL INSTALLATION.
HOUSE-WIRING IS OUR SPECIALITY. TRIAL REQUESTED.

Phone : 36-1207

THE ARTISAN

107/A, B. B. GANGULI STREET,
CALCUTTA-700 012

DESIGNERS, BLOCK-MAKERS & COLOUR PRINTERS

Phone : 26-7168

With Best Compliments of :—

CHATTERJEE BROTHERS

NO. 7, POLLOCK STREET, CALCUTTA-1

DEALERS IN PHILIPS LAMP AND RADIO
DISTRIBUTOR OF VENUS WATER HEATER &
ALL KINDS OF ELECTRICAL GOODS.

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি. ৬

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৫৩২

যশোহর কোম্প ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুত কারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড টিফনী ও "JECY" ব্রাণ্ড
পলিথিন পাইপস ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা

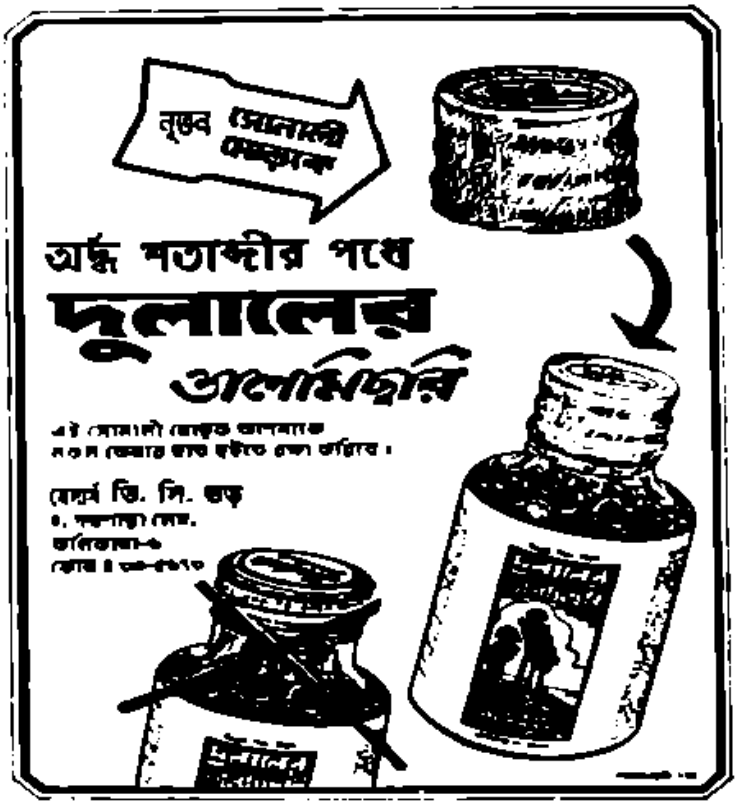

With best Compliments from :

Phone : 55-8339

GUINEA MUSEUM

GUINEA GOLD, JEWELLERY ORNAMENTS
& REAL STONE DEALERS

81, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-700004

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে

বাত বেদনায় অব্যর্থ

৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

With Compliments of :

Phone : 35-4576
35-7511
35-2648

Santosh Biscuit Company (Pvt.) Ltd.

"SANTOSH BHAVAN"
179, Munichtala Main Road,
CALCUTTA-700 054

হারমোনিয়ম কিনতে হলে
"ডোয়ার্কিনের" কিনবেন

ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স লিঃ

৮/২, এসপ্লেনেড, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯
উহাই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

Phone : 33-1609

With Compliments of :

CHANDRA KANTA MANNA & CO. (PRIVATE) LTD.

★

IRON & HARDWARE MERCHANTS

Govt. Controlled Stockists for Iron and Steel

20, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
CALCUTTA-700 007

"সর্বদাই জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি না থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবো।' যা খুশী কর না কেন, যেভাবে খুশী চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে।"—শ্রীশ্রীমা

পূর্ণিমা চক্র

॥ শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্য ॥

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম. এ, ডি. ফিল.—**মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প** ২২·০০
[পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ]
ডক্টর দীনেন্দ্র দেবনাথ, এল. এ., পি-এইচ. ডি.—**ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ** ২২·০০
ডক্টর বৈদ্যনাথ শীল, এম এ., ডি. ফিল.—**বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা** ২০·০০
[পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ]
শুভময় মাইতি—**গদ্যের সৌন্দর্য্য** ১০·০০
ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস, এম. এ., ডি. লিট্.—**বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ** ২০·০০

এ, কে, সরকার এণ্ড কোং
১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১২

Phone 24-1592

REYNOLD'S

Patent
Products Manufactured by

NATIONAL ASBESTOS CORPORATION

98, MIDDLE ROAD, CALCUTTA-700 014

STEAM, HYDRAULIC
&
RUBBERISED PACKING HEAT-INSULATING 85% MAGNESIA

With Compliments of :—

SAVOY CAMERA STORES

4, Chowringhee Road, Calcutta-700 013 Phone : 23-4836
25, Bhupendra Bose Avenue, Calcutta-700 004
Phone : 55-6087

With Best Compliments from :—

HALDIA TOBACCO HOUSE

DURGACHAK

HALDIA

Dist. MIDNAPORE

With Best Compliments From :— Phone : 24-4718

THE SMITAJA CHEMICALS PVT. LTD.

OUR PRODUCTS :—

ACTIVATED CARBON POWDER CRPII FOR CRITICAL APPLICATION ;
ACTIVATED CARBON POWDER CRTECH FOR NON-CRITICAL APPLICATION ;
ACTIVATED CARBON GRANULES FOR WATER TREATMENT AND OTHER USES ;
ACTICARB-PI FOR PRINTING INK/PAINTS ;
ACTICARB-RG FOR RUBBER.

Regd. Office : **NARENDRAPUR 24-PARGANAS. WEST BENGAL**

City Office : **30F, FREE SCHOOL STREET, CALCUTTA-700 016**

With Best Compliments from :

DOOARS TRANSPORT PRIVATE LIMITED

134/1, MAHATMA GANDHI ROAD,
CALCUTTA-700 007

Grain : AIROFOILS

Phone : 34-8344
34-8345

Space Donated by—

A WELL WISHER

অমূল্য কুমার নাথা

বাড়ীর গাড়ীর

১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-১৩

ফোন : ৩৪-২২৫২

সৌন্দর্য্যের প্রতীক

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

যাবতীয় বাইণ্ডিং ও কার্টন কাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

কে হোড়

মহাভৃঙ্গরাজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-সৌকুমার্য্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিবেকানন্দ সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

"জয়ন্তী বিল্ডিংস্"

৩২-বি, আচার্য রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৮-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৫ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০১৩

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০.০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ, বি-টি প্রণীত	
(মূল অবয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহজ ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙালী	১০.০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫.০০	বীরত্বে বাঙালী	৭.০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার দার্শনিক আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙালী	১০.০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫.০০	বাংলার ঋষি	১০.০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪.০০	বাংলার মনীষী	৪.০০
		বাংলার বিদুষী	৭.০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

R FOR ROYAL

R FOR RAJGARH

DRINK

RAJGARH TEA

RICH ROYAL REGAL

REAL QUALITY C. T. C. TEA

RAJGARH TEA COMPANY LIMITED

"YULE HOUSE"

8, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট মূল্যে-অক্ষ-বিতরণে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

হেড অফিস : "NEELAMBER", ২৮বি, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ৪৩-৪০২৫, ৪৩-৪২৪৮/৯ টেলেক্স : ২১-২৫১৯ TNGIN

ফ্যাক্টরী : ১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৫-১৬১৩

★

APPRECIATION

We extend our heartiest appreciation to all our well-wishers, particularly to those concerns whose co-operation and contributions in the shape of advertisements and donations have made possible the publication of this Puja Special of VISVAVANI at a nominal price.

Wishing all of them peace and happiness.

With Best Compliments from :

WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LIMITED

(A GOVT. COMPANY)

MANUFACTURERS OF :-

RAILWAY & ROAD BRAKES AND SIGNALLING EQUIPMENTS, AGRICULTURAL PUMPS, POWER TILLERS AND OTHER ALLIED ITEMS.

17, CONVENT ROAD, ENTALLY, CALCUTTA-700 014

Phone No. : 24-7161 (7 Lines), 21-2416 (4 Lines)

Telegram : INTERLOCK Telex : 021 2348

Space Donated by :—

ALLIED ABRASIVE & CO.

SERAMPORE

R. N. 13733/57
PUJA SPECIAL NUMBER
44th Year, October 1982
VOL. VIII

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

- 5 NOV 1982

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৩০৯৯৫, ৩২৬৬৩২, ৩৩১২৩২
Cable:'Cookmepure','Queenspice'
Telex:021 2591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70
iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
B. Raja Rajkrishna Street. Calcutta-700 006. printed at the New Indian Press. 6,Duff Street. Calcutta-700006
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012

RICE Rs. 6.00
মূল্য ছয় টাকা

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥২।১৫
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥২।১৬

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

কুম্ভমিলন বর্ষ

নবম সংখ্যা

কার্তিক

১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
সহঃ সম্পাদক : শ্রী আশুতোষ ঘোষ

॥ বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ॥

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১৮'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৮'০০ টাকা। গ্রাহক গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে আগাম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১'৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পাত্রিকা ভাকে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১৬'০০ টাকা ও ৮'০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।
- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে 'বিশ্ববাণী' না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে 'বিশ্ববাণী' অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র দিবার সময় গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁহের গ্রাহক গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক শ্রেণিভুক্ত অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক গ্রাহিকাদেরই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে 'বিশ্ববাণী' বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- 'বিশ্ববাণী'-র গ্রাহক গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর পরবর্তী ১০'০০ টাকা (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank-এর চেক পাঠাইলে Bank Charges বাবদ অতিরিক্ত ২'০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৫৫ ১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:।

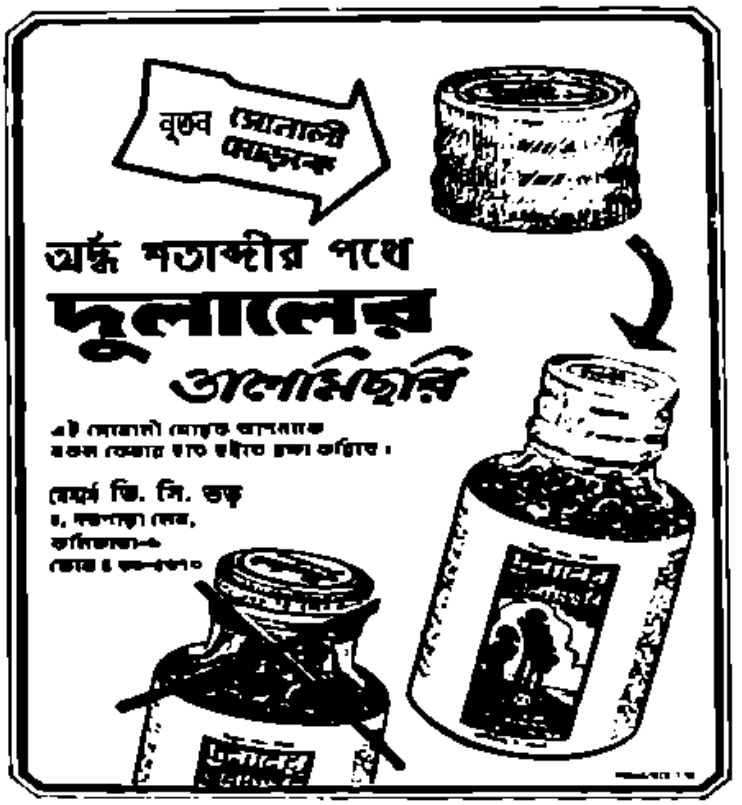

ফোন : ৪৫-৬৩৫৩

এ, এম, দে এণ্ড ব্রাদার্স

মানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স

আসল গ্রহরত্ন বিক্রেতা

৮২/৪এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

(মিত্রা সিনেমার পাশে)

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

রক্তদোষে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে বাত বেদনায় অব্যর্থ

৪০১/৭ এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পীড়াহর

ডাঃ সেন্সের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৫-৩৮৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৩৭৪

ফোন : ৪৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,
CALCUTTA-700006

ফোন : ৪৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, মির্জাগালিব স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'অনুবাদ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৮-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ০০ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০৭৩

শীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	৩০·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ. প্রণীত	
(মূল অবয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহ সুবিস্তৃত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	১০·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৭·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	১০·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিদুষী	৭·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও তদ্বৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ, (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৬·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ (১ম)	২৫·০০	তীর্থরেণু	
মন ও মানুষ (২য়) প্রকাশের অপেক্ষায়			
স্বামী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	২৫·০০		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ		অভেদানন্দ দর্শন (১ম) প্রকাশের অপেক্ষায়	
শ্রীদুর্গা নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ		নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	৫·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০		
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

কার্ত্তিক, ১৩৮৯

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ।

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী মুক্তাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৮ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরমণীরঞ্জন সোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।

শ্রীরাধানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীসুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস্

৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন। ● স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'আত্মবিকাশ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। ● প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ। ● ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন। ● শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন। ● প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Phone : 55-2526
54-3395

DAS & SONS

WATCH MAKERS & OPTICIANS

107A, Bidhan Sarani, (SHYAMBAZAR) CALCUTTA-700 004

(Front of Shyambazar Tram Dept.)

AUTHORISED DEALERS

HMT, Anglo-Swiss, Timostar, Shreeshyla, Sandoz, Favre-Leuba, I.S.T. & Suntrek Watches. Hes Anglo-Swiss & Favre-Leuba Time Pieces.

TOKYO & SCIENTIFIC WALLCLOCK.

কেয়োড়

মহাভৃঙ্গরাজ

মাথা ঠাণ্ডা রাখে
চুল উঠা বন্ধ করে

আর মিত্তির

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

ফোন নং ২৩-১৮০৫-৯ (৫টি লাইন)

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

কার্ত্তিক, ১৩৮৯

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৩৫৭	
২।	শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে	৩৬৩	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	মহিষাসুরমর্দিনী	৩৬৯	ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৩৭৫	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৫।	বৌদ্ধ-সম্মেলন ও বৌদ্ধচিন্তা— স্বামী অভেদানন্দ	৩৭৬	অনুবাদ—শ্রীকৃপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৬।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা	৩৭৮	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	৩৮২	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৮।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৩৮৪	

With Best Compliments from :—

HALDIA TOBACCO HOUSE

DURGACHAK

HALDIA

Dist. MIDNAPORE

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

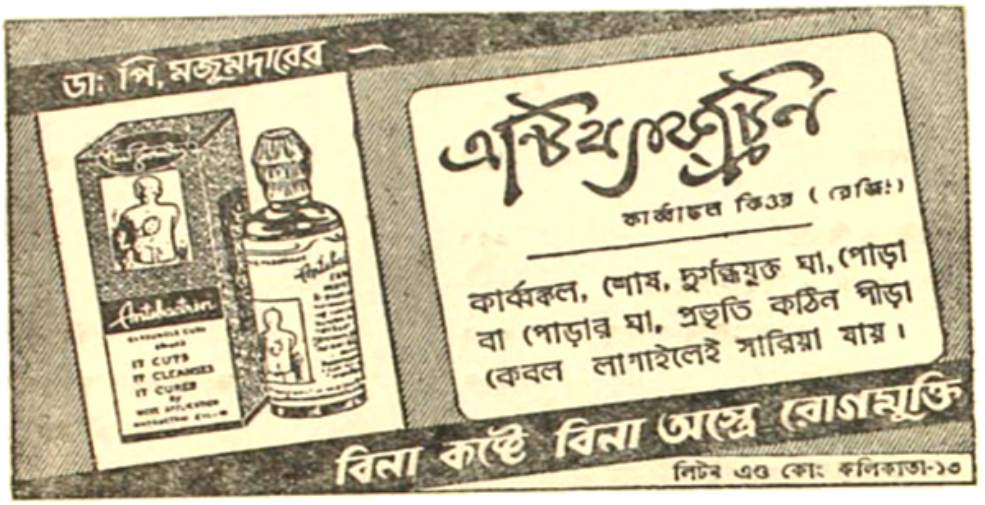

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact—

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

BUST PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Regd. Office :

87, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

চুয়াল্লিশ বর্ষ | নবম সংখ্যা | কার্তিক ১৩৮৯

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ ॥

॥ ১ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি (জ্ঞান) হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। (জ্ঞানের) দু'টি লক্ষণ—প্রথম, অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান-বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই,—সে মিছে। আর একটি লক্ষণ—কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। বসে বসে বই পড়ে যাচ্ছি, বিচার করছি, কিন্তু ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ১৩৮১, পৃঃ ২৪০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের (১৩৬৬ সালের সংস্করণ) ঊনবিংশ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ। দক্ষিণেশ্বরে (নিজের ঘরে) ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব। উপবিষ্ট সিঁথির পণ্ডিত বেলাক্তবাগীশ, ঈশান প্রভৃতি। শনিবার ১১ই অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। "সিঁথির পণ্ডিত চলিয়া গিয়াছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কালীবাড়ীতে ঠাকুরদের (বিষ্ণুমন্দিরে, কালীমন্দিরে ও দ্বাদশ শিবমন্দিরে) আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব (ঘরে টাঙানো বিভিন্ন ছবিতে) ঠাকুরদের উদ্দেশে নমস্কার করিতেছেন। ছোটখাটটিতে (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) বসিয়া (আছেন), উল্লসিত

(অন্তমনস্ক)।···ঘর নিঃশব্দ। রাত্রি একঘণ্টা হইয়াছে, ঈশান মুখোপাধ্যায় ও কিশোরী আসিয়া উপস্থিত।···ঈশান কর্মযোগী (পুরশ্চারণাদি শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানে) খুব অনুরাগী।" শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ঈশানকে লক্ষ্য ক'রে বলেন: "জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি হয়?·····সেটি জ্ঞানের লক্ষণ নয়" প্রভৃতি।

পূর্বে পণ্ডিত বেদান্তবাগীশকে শিক্ষা দেওয়ার সময়ে সাধুসঙ্গের কথা বলেছেন, আর বলেছেন জ্ঞানের লক্ষণসম্বন্ধে। বলেছেন ঐ কথার প্রসঙ্গে অজ্ঞান কাকে বলে, অর্থাৎ জ্ঞান হলো ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ এবং ঈশ্বরদৃষ্টি নিয়ে সকল আলোচনা, আর যখনই 'আমার ঘর, বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে, বন্ধু, বিষয়, তখনই অজ্ঞান। অর্থাৎ পরার্থপরতায় জ্ঞান ও স্বার্থহীনতায় অজ্ঞান—এ'কথাই বোঝাতে চেয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

তারপর সুরেশের কথাপ্রসঙ্গে সিঁথির পণ্ডিতকে বলেন: "আর দেখ, শুধু বিচার করলে কি হবে? তাঁর অর্থাৎ ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হও, তাঁকে (ঈশ্বরকে) ভালবাসতে শেখ" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪২)। তারপরই জ্ঞান ও ভক্তির কথা: **জ্ঞান-বিচার—পুরুষমানুষ···। ভক্তি—মেয়েমানুষ···"**। সুতরাং "একটা কোন রকম 'ভাব' আশ্রয় করতে হয়, তবে ঈশ্বর লাভ হয়"। 'ভাব' বলতে দাসভাব, সখীভাব, মধুরভাব, শান্তভাব (শম), সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে ক্রিয়াকর্মানুষ্ঠানে অনুরাগী ঈশান মুখোপাধ্যায়কে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন: "জ্ঞান জ্ঞান বল্লেই কি হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে···। দু'টি লক্ষণ: প্রথম—অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। শুধু জ্ঞান—বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ নাই ভালবাসা নাই,—সে মিছে। আর একটি লক্ষণ—কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না।···কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হ'লে ভাব, ভক্তি, প্রেম—এই সব হয়। **এরই নাম ভক্তিযোগ"**। অপূর্ব এই ব্যাখ্যা!

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ও ব্যাখ্যায় মধ্যে অভিনবত্ব আছে, আর আছে স্বাতন্ত্র্য বা স্বতন্ত্র-চিন্তা; কেননা অনুরাগে বা ভালবাসায় ভক্তির সঞ্চার হয় একথা ঋষি নারদ ও শাণ্ডিল্য দু'জনেই বলেছেন তাঁদের ভক্তিসূত্রে: 'একান্তরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ'। অনুরাগ ও অনুরক্তি একথা। ঈশ্বরে বা ভগবানে অনুরক্তি—অনুরাগ বা একান্ত ভালবাসার ও প্রেমের আকর্ষণ হলে তবেই ভক্তির সঞ্চার হয়। যাকে একান্তভাবে পেতে চাই ও পাওয়ার আকুল ইচ্ছা, তাতে মন গেলেই অর্থাৎ বসলেই অনুরাগ ও ভালবাসা (আসে)। আর ভালবাসা গাঢ় বা প্রবল (একান্ত) হলেই প্রেম। একান্ত-ভালবাসায় বা প্রেমে সকল পার্থক্য ও ভেদভাব দূর হয় এবং যেন প্রবল বন্যার জল নদীর দু'কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়। একান্ত ভালবাসায় বা প্রেমে জাতি-কুল-মান বা লজ্জা-ঘৃণা-ভয়—এ'সবের কোনটারই বালাই থাকে না। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে দেখি যে, শ্রীরাধা প্রধানা-সখি তো বটেই। তবে সকল ব্রজ-গোপীরাও নিজেদের ভুলে শ্রীকৃষ্ণসত্তাতেই বিভোর। শ্রীমদ্ভাগবত এর নিদর্শন দিয়ে বলেছে: 'ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ···' (২৯।৪); 'কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ,

নিত্যাঃ হরৌ বিদধতো রাতিমুত্তমভাং হি তে' (২৯।১৫) ; 'অসাবহমিতাবলাত্তদাত্মিকা, নাবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ' (৩০।৩)। এই ৩০।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর-স্বামী বলেছেন : 'অহমেব কৃষ্ণ ইতি পরস্পরং নিবেদিবন্তাঃ'। শারদ-রাসমণ্ডলে নৃত্যরতা ব্রজগোপীরা প্রত্যেকেই চিন্তা করছেন—'আমিই কৃষ্ণ', অর্থাৎ ব্রজগোপীরা এমনইভাবে আত্মহারা যে, তাঁরা নিজেদের পৃথক-সত্তা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণময় চিন্তা করছেন। অপূর্ব এই উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত। এ'ভাবে ভক্ত-সাধক যখন নিজের দেহ-মন-সত্তার অতীত হয়ে ঈশ্বরের অপরিমিত সত্তাকে আপন-সত্তারূপে চিন্তা করবেন, অর্থাৎ আত্মভোলা হবেন, তখনই ভালবাসা ও প্রেমের হয় পূর্ণ-পরিণতি। 'প্রেমে জল হ'য়ে যাক্ গলে',—ব্যক্তিসত্তারূপ 'অহং'-অভিমান বা 'আমি'-রূপ বরফ তখন গলে জল হয়ে মিশে একাকার হয়। এরই নাম যথার্থ অনুরাগ, অনুরক্তি, ভালবাসা, ভক্তি ও প্রেম। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন যে, জ্ঞানের একাত্মক বা অভেদাত্মক ('অহং ব্রহ্মোঽস্মি')-জ্ঞানের প্রথম লক্ষণ—অনুরাগ, অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। ঈশ্বরকে ভালবাসা বলতে নিজের পৃথক বা দ্বৈত-সত্তাকে বজায় রেখে মেশা বা এক হওয়া নয়, দ্বৈতকে ও খণ্ডকে অদ্বৈত ও অখণ্ড-সত্তায় এক করতে হয়।[১] এই এক হওয়ার নাম পরিণতি বা পরিণাম নয়,—বিবর্তন। রজ্জুতে সর্পভ্রম—অধ্যাস, মিথ্যা বা ভ্রান্তি,[২] যথার্থজ্ঞানে ভ্রমের বা মিথ্যা-দৃষ্টির অপনয়ন। অপনয়ন বা সংস্করণ—ভ্রমে বা ভুলজ্ঞানে সর্প, কিন্তু সত্যজ্ঞানে রজ্জু। ঈশ্বর আমাদের প্রাণের প্রাণ—সর্বদাই আপনার, কেননা তাঁর সত্তাতেই আমাদের সত্তা—জীবসত্তা—বিশ্বসত্তা—'তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বম্'। কঠোপনিষৎ (৩।১২ ; ১৩) একথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আমাদের—

'এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্ পথস্তৎকবয়ো বদন্তি ॥'

অনুরাগ, ভালবাসা ও ভক্তি জ্ঞানের অনুসন্ধী, সহায়ক বা সহচর, সে'কথাই বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তিনি জ্ঞানকে ভক্তি বা ভক্তিকে জ্ঞানের বিরোধী বলেন নি। অনেকে অবশ্য ভুল ক'রে বলেন যে, জ্ঞান ভক্তির বা ভক্তি জ্ঞানের বিরোধী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু সেকথা বলেন নি, বলেছেন : "জ্ঞান (আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান) হবার লক্ষণ আছে। দু'টি লক্ষণ —প্রথম, অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা। **শুধু জ্ঞান-বিচার করছি, কিন্তু ঈশ্বরেতে অনুরাগ নাই, ভালবাসা নাই, সে মিছে।**" তার পরের লক্ষণটি যোগের ও তত্ত্বসাধনার এবং সেই বিচার আমরা পরে করবো। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি, ভালবাসা ও প্রেমের নিবিড় সম্বন্ধের কথা বলেছেন—যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়।

১। এই এক হওয়ার অর্থ একে অপরের পৃথকসত্তাকে বজায় রেখে মিশে যাওয়া (দ্বৈতাদ্বৈতসত্তা) নয়, দুই সত্তা অখণ্ড-একে রূপান্তরিত হওয়া।

২। পঞ্চপাদিকার আচার্য পদ্মপাদ বলেছেন : 'অধ্যাসো মিথ্যা ইত্যনর্থান্তরম্', কেননা 'মিথ্যাজ্ঞান-পদ্মো ভাষ্যে (সংস্করণভাষ্যে) অধ্যাসার্থক এব'।

তাছাড়া লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগসাধনাকেও (সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্রোক্ত এবং যোগোক্ত মূলাধারাদি ষট্‌চক্রের সাধনাকেও) 'জ্ঞান হবার লক্ষণ' বলেছেন। এই জ্ঞান কোন্ জ্ঞান ? পূর্বেই বলেছি যে, এখানে জ্ঞান বলতে আত্মজ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান—যে জ্ঞানে দ্বৈতভাব অদ্বৈতজ্ঞানের সাগরে একাকার হয়ে যায়।

অবশ্য গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮ম এবং ৭ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে জ্ঞানের দু'টি ভাগের (প্রকারের) কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ : একটি—পরোক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান বা উপদেশমূলক-জ্ঞান ও অপরটি—অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন—

(১) জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। —গীতা ৬।৮

(২) জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। —গীতা ৭।২

গীতার ৭।২ শ্লোকের ভাষ্যে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী এবং 'ভক্তিরসায়ন'-গ্রন্থকার পরমভাগবতাচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন : "তেন বিজ্ঞানেন সহিতমিদমপরোক্ষমেব 'জ্ঞানং' শাস্ত্রঞ্চ তে···কথয়িষ্যামি"। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-ভেদে জ্ঞান দু'রকম। যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে, সেখানে অপরোক্ষ-উপলব্ধিমূলক অব্যভিচারিক-অপাবিষ-ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলেছেন, কেননা তারপরেই তিনি বলেছেন : "দু'টি লক্ষণ,—প্রথম, অনুরাগ অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা",—সাংসারিক ভোগসুখকে ভালবাসার কথা বলেন নি। সুতরাং সর্বধর্মসমন্বয়দৃষ্টি নিয়ে অসাম্প্রদায়িক-উদার-মনোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও তন্ত্রসাধনকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন এক ও অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্রে উপনীত হওয়ার (মিশে এক হওয়ার) জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান হওয়ার দ্বিতীয় লক্ষণ বলেছেন—"কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ। কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না"। কুলকুণ্ডলিনী—কুল + কুণ্ডলিনী। কুল অর্থে কালী, নৃত্যচঞ্চলা মহাশক্তিরূপিণী কালী, আর অকুল অর্থে শিব—নিষ্কল-চৈতন্য। শারদাতিলকতন্ত্রে (ষষ্ঠপটলী) পণ্ডিত রাঘবভট্ট প্রথম পটলের (অধ্যায়ের) প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে কুণ্ডলিনীশক্তি-সম্পর্কে কিছু আলোচনার সময়ে 'চৈতন্য'-সম্বন্ধে বলেছেন, 'চৈতন্যং চিচ্ছক্তিস্বরূপা। অতএব বক্ষ্যতি 'ততশ্চৈতন্যরূপা সা' ইতি। শ্লোকের 'ব্যাপ্তং যেন চরাচরাত্মকমিদং শব্দার্থরূপং জগৎ। শব্দব্রহ্ম···' প্রভৃতির ভাষ্যে পণ্ডিত রাঘবভট্ট বলেছেন : "যদধিত্য শাস্ত্রে শব্দস্পর্শৈরর্থস্পর্শৈরপি কুণ্ডলিন্যা এবোৎপত্তেস্তস্যা এব 'কুণ্ডলী পরদেবতা' ইতি··· মনঃশব্দেন তেজোরূপা কুণ্ডলিনীত্যুচ্যতে। যদা কুণ্ডল্যা শব্দার্থরূপং পরা-পশ্যন্তী-মধ্যমা-বৈখরী-রূপেণ শব্দজনকত্বাৎ কার্যে কারণোপচারাৎ শব্দরূপং বিবরত্বাৎ অর্থরূপতয়েন···গচ্ছতীতি জগদ্ বিশ্বরূং শরীরং ব্যাপ্তম্"। পূর্বে বলেছি, চৈতন্যের বা চিতিশক্তির অর্থ করেছেন : "···ততশ্চৈতন্যরূপা সা ইতি। অন্তর্গতং সুষুম্নান্তর্গতমিত্যর্থঃ। 'যা মূলাধারপদ্মান্তর্বিবরগতা' ইত্যুক্তেঃ"। এই শব্দব্রহ্মরূপ শক্তি বাগ্‌ভব, কামবীজ ও শক্তিবীজ তিনরূপে প্রকাশিত। এই শক্তি বিন্দু, নাদ ও বীজ এই তিন রূপেও অভিব্যক্ত—'ত্রিধাঽসৌ ভিদ্যতে পুনঃ, বিন্দুর্নাদো বীজমিতি'। শব্দব্রহ্মই চৈতন্য : 'চৈতন্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি যে মতি' (১।১০)। এই শব্দরূপিণী

দেবী মহাশক্তি কুণ্ডলিনী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী : "চিন্ময়জননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী, দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাদ্যা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী' (১।৫৬)।

শারদাতিলকতন্ত্রের ২৫।৩৬—৬৮ শ্লোকগুলিতে কুণ্ডলিনীশক্তির ধ্যানের উল্লেখ আছে। ভাস্করকার পণ্ডিত রাঘবভট্ট সংক্ষেপে বলেছেন : "কুণ্ডলিস্থানমাহ আধারেতি। কুণ্ডলিশক্তিঃ আত্মানং পরমাত্মানং বিভাতি ভোগভাগিনী ভবতি ইত্যর্থঃ। কীদৃক্। হংস জীবাত্মানম্ আশ্রিতা জীবাধিষ্ঠানাসক্তীত্যর্থঃ। হংসঃ প্রাণাশ্রয়ঃ প্রাণবায়ুসমাশ্রয় ইত্যর্থঃ। প্রাণো নাড়ী-সমাশ্রয়ঃ"। পরে ২৫।৬২—৬৩ শ্লোকে বলা হয়েছে প্রণবের (শিবের) কথা, শিবাত্মা সকলের অন্তর্গত হংসের কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে জীব এবং শিবের সামরস্যের (সমরস-রূপ একাত্মার) কথা। শারদাতিলকের ২৫।৭১ শ্লোকে চক্রে চক্রে জীবরূপ শক্তির ঊর্ধ্বগমনের ও গলিতসুধার কথা আছে : "চক্রে চক্রে গলিতসুধয়া সিক্তগাত্রা প্রকামং···বাগ্ভবী দেবতা যঃ"। তারপর সহস্রারচক্রে (মস্তকে) কুণ্ডলিনীশক্তি পরমশিবের সঙ্গে একীভূত হ'লে পরমামৃতরূপ মুক্তি বা মোক্ষ লাভ করেন সাধক। কুণ্ডলিনীশক্তি নিদ্রিতা থাকলে জীবরূপী-শিব এবং জাগ্রতা হলে শিবরূপী-শিব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন বলতে পরমশিব তাঁর নিজ রূপে মহিমান্বিত হন। এই মহামিলনের নামই সামরস্য। তন্ত্রোক্ত সামরস্যকেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'জ্ঞান' বা 'পরমজ্ঞান' বলেছেন।

কুণ্ডলিনীর এই মহানিদ্রার জাগরণরূপ মহাতত্ত্বকে আরও সহজ-সুন্দরভাবে বোঝাতে গেলে দেবতাদের অর্চনার সময়ে যে ভূতশুদ্ধি করা হয়—সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ভূতশুদ্ধির সাধনা ও ক্রম সাধকমাত্রেই জানেন, কিন্তু তাহলেও বলি—

"অনাহত শুদ্ধচক্রস্থিত প্রদীপকালিকাকার জীবাত্মাকে মূলাধারে আনয়ন করিয়া কুণ্ডলিনীতে লীন করিবে। পরে 'হুঁ'-কার-দ্বারা প্রসুপ্ত-কুণ্ডলিনীকে (জীব-শিবকে) জাগ্রত করিয়া 'হংসঃ' মন্ত্রে সুষুম্নাপথে (মেরুদণ্ডের মধ্যপথে) উত্থাপিত করিবে। তখন মূলাধারচক্রস্থিত মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তিসমূহ কুণ্ডলিনীতে বিলীন হইবে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদির সহিত পৃথিবীমণ্ডল 'লং'-বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীশরীরে সূক্ষ্মবীজাকারে প্রদীপ্ত থাকিবে। পরে স্বাধিষ্ঠানে (চক্রে) গমন করিলে সেই চক্রের দেবতা তথা মাতৃকাবর্ণ প্রভৃতি কুণ্ডলিনীশরীরে লীন হইবে ও রসনেন্দ্রিয়াদির সহিত বরুণমণ্ডল 'বং'-বীজে রূপান্তরিত হইবে, এবং পূর্বে কুণ্ডলিনীর শরীরে যে পৃথ্বীবীজ 'লং' বর্তমান ছিল তাহা এখন স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত 'বং' এই বরুণবীজে লীন হইবে, আর 'বং'-বীজই তখন কুণ্ডলিনীশরীরে বীজভাবে থাকিবে। এইরূপে পূর্বের ন্যায় যথাযথভাবে মণিপুরচক্রে 'বং'-বীজ, 'রং'-বীজে, অনাহতচক্রে 'রং'-বীজ 'যং'-বীজে, বিশুদ্ধচক্রে 'যং'-বীজ 'হং'-বীজে, আজ্ঞাচক্রে 'হং'-বীজ অহংকারতত্ত্বে, অহংকারতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব কুণ্ডলিনীতে বিলীন হইলে কুণ্ডলিনী পরে সহস্রারকমলে পরমশিবে মিলিত (একীভূত) হইবে। মূলাধারের জীবরূপী-শিব-কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সঙ্গে সমরস বা একরস-অখণ্ড-চৈতন্যরূপে রূপান্তরিত হলে তখন সামরস্যমিলন বা একীভাবসম্পন্ন হয়।[৩]

৩। ভূতশুদ্ধির সাধারণ চারটি মন্ত্রেই সুষুম্নাপথে জীবশিব (জীবাত্মা) ও পরমশিব (পরমাত্মা) এই দু'টি শিবের মিলনের কথা আছে : (১) '···সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা, (২) ওঁ যং লিঙ্গশরীরং (জীব) শোষয় শোষয় স্বাহা, (৩) ওঁ রং সংকোচশরীরং (জীব) দহ দহ স্বাহা, (৪) ও পরমশিব সুষুম্নাপথেন···প্রজ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা'।—সোঽহং (জীব) হংসঃ (শিব)—এই দুই শিবের মিলন। প্রকৃতপক্ষে শিব একটাই, তবে সাধনার জন্য দ্বৈতকল্পনা ও পরে অদ্বৈতভাবনা।

মস্তকে সহস্রারচক্রের কল্পনার অর্থ মস্তকে সহস্র-সহস্র-শক্তিকেন্দ্র (cavities) বা চৈতন্যকেন্দ্র আছে এবং ঐ চৈতন্যকেন্দ্রগুলি জাগ্রত ও সচকিত হয়ে মানুষের শরীরের সকল অংশকে ক্রিয়াচকিত করে। মস্তকই প্রধান কেন্দ্র—যে-কেন্দ্র মানুষের শরীরযন্ত্রকে পরিচালিত করে। মূলাধারাদি চক্রগুলিকে centres of consciousness বা জ্ঞানানুভূতিকেন্দ্র বলা যায়। প্রতিটি চক্রকে পদ্ম কল্পনা ক'রে তাদের প্রতিটি পাপড়িতে মাতৃকাবর্ণের ও দেবতাদের কল্পনা করা হয় সমস্ত চক্রকে চেতনাদীপ্ত ব'লে চিন্তা করার জন্য। চিন্তারূপ কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সাধক ষট্‌চক্রসাধনা করেন এবং পরিশেষে চরমশক্তিকেন্দ্র বা চৈতন্যকেন্দ্র মস্তকে (সহস্রারে) পরমজ্ঞানরূপ সর্বত্রপরিব্যাপ্ত চৈতন্যের অনুভূতি লাভ করেন। এই অনুভূতির নামই পরম ও চরম-জ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংক্ষেপে বলেছেন: "কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হলে ভাব, ভক্তি, প্রেম এই সব হয়। এর নামই ভক্তিযোগ" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩৪৩)।

জানিনা ভাব-ভক্তি-প্রেমের প্রসঙ্গে সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'এরই নাম ভক্তিযোগ' বলেছেন কিনা! কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় "এরই নাম জ্ঞানযোগ", কেননা জ্ঞানের লক্ষণ-সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব যোগসাধনরূপ কুণ্ডলিনীজাগরণের কথা বলেছেন। তিনি নিজে ষটচক্রের-সাধনা ক'রে কুণ্ডলিনী ও পরমশিবের সাযুজ্যসুখ উপলব্ধি করেছিলেন অন্নসাধনার সময়ে। তখন সাধনার সহায়ক ছিলেন সাধনসিদ্ধা ভৈরবী-যোগেশ্বরী-ব্রাহ্মণী। অলৌকিক গুরু ও অলৌকিক শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সাধনার চক্রে-চক্রে ভিন্ন-ভিন্ন অনুভূতি লাভ করেছিলেন এবং সেকথা তিনি প্রকাশও করেছিলেন অনেককে বহু প্রসঙ্গস্থলে। শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় এই প্রসঙ্গের শেষে মন্তব্য করেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণদেব কি ষট্‌চক্রে আদ্যাশক্তির (কুণ্ডলিনীর) ধ্যান করিতেছেন? শিবসংহিতাদি-শাস্ত্রে যে যোগের কথা আছে—এ'কি তাই"! প্রশ্নের শ্রীম-র অনুমান ঠিকই। যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীসাধনের কথা বীজাকারে অর্থাৎ কোথাও পরোক্ষভাবে এবং কোথাও অপরোক্ষভাবে থাকলেও শিবসংহিতাদি পরবর্তী-যোগশাস্ত্রে শক্তিসাধনার অঙ্গরূপে কুণ্ডলিনীসাধনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্বেই বলেছি যে, 'যত মত তত পথ'-মন্ত্রের সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও উদারদৃষ্টি প্রসারিত ক'রে জ্ঞান ও ভক্তির প্রসঙ্গে যোগসাধনারও অন্তর্নিবেশ করেছেন, কেননা তিনি জানতেন যে, মতে ও পথেই কেবল পার্থক্য, লক্ষ্যে সকলেরই মহামিলন ও অখণ্ড-অসীম-আনন্দ।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(শেষাংশ)

প্রাথমিক কথাবার্তার মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। আলোচনায় উভয়পক্ষেরই আন্তরিকতা পরিস্থিতির আবহে এনেছিল উষ্ণতা। কথাশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ কথার মালা গেঁথে চলেন। বোধ করি বিদ্যাসাগরের অন্তরস্থার উন্মোচনের জন্য উন্মুখ দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি অধ্যাত্মবিদ্যার প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন। রুদ্ধশ্বাস উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন দূরগামী ট্রেনের যাত্রীদের গ্রীষ্মাক্লান্তিমলিন প্রান্তরে চেয়ে থাকার মত শ্রীরামকৃষ্ণকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তারা তাঁর বাণী-নির্ঝর শুনছেন, তাঁর মধুর গান শুনছেন। বিদ্যুৎবিভার মত ক্ষণে ক্ষণে নূতন ভাবের ছটা তাদের মানসপটকে উজ্জ্বল করে তুলছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সরস প্রজ্ঞাঘন আলাপচারী গ্রীষ্ম অতি নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন, তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে কিছু বাড়তি তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। আমরা কথামৃতে পাই, শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে-জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।

এ-কথা শুনে বিদ্যাসাগর বিস্মিত হন। তিনি বলেন: এরকম সামান্য কথায় এমন গভীরভাবের কথা কোথাও শুনিনি ত, অনেক শাস্ত্র পড়লুম কিন্তু এমন ভাবের কথা কৈ পাইনি।[১১] অতঃপর বিদ্যাসাগর ব্রজবাবুকে বলেন: কি বলেন মশায়?

ব্রজবাবু উত্তর করেন: আজ্ঞে হাঁ।[১২]

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্যকে বিশদ করে বলেন একটা উদাহরণ দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'এক বাপের দুই ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপ! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি?' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক ব'লে ব'লে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগলো! বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁটমুখে চুপ করে রইল। মুখে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট ছেলেকে বললেন, 'বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।'

তখন বিদ্যাসাগর মাষ্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করেন: তুমি কি এঁরই কথা বলেছিলে?

১১। কথামৃতকারের মতে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধুদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন: যা। এটি তো বেশ কথা। আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।

১২। প্রতাপচন্দ্র হাজরার বিবরণী।

মাষ্টারমশায় : আজ্ঞে হাঁ।

বিদ্যাসাগর মাষ্টারমশায়কে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে—তাঁর নিবাস কোথায় ছিল, এখন কোথায় থাকেন, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুর শুনে তিনি মন্তব্য করেন : কামারপুকুর যে আমাদের গ্রাম বীরসিংহের মাত্র তিন চার ক্রোশ তফাতে।[১৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা-নির্ঝর থেকে কথামৃত ঝরতে থাকে। প্রাণমাতানো কথা। সে-কথাতে চিন্তার ও ধারণার কি গভীরতা! কথার মাঝে মাঝে তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করার জন্যই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ গান করেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের গান। গানের মাধুর্যে উপস্থিত সকলেই মোহিত, পুলকিত। তাঁর একটি গান :

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, তার অতীত অভাবে কি ধরতে পারে। ইত্যাদি।[১৪]

গানের সুগভীর তত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রবিৎ বিদ্যাসাগরকে নিশ্চয়ই ভাবিয়ে তুলেছিল। এদিকে গান শেষ হতে না হতেই একটি আশ্চর্যজনক প্রত্যক্ষ-ব্যাপার ঘটে গেল। প্রত্যক্ষ-ব্যাপার অসাধারণ কিন্তু বাস্তবভিত্তিক। এমন দৃশ্য বিদ্যাসাগর কখনও চোখে দেখেননি। কথামৃতকার লিখেছেন : গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ। দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উৎসুক হইয়া এক অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুর মত সরল, পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তাঁর মুখমণ্ডলে অসাধির দ্যুতি, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রোমাঞ্চাদি দর্শন করে বিদ্যাসাগরের চেতনায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানতে ইচ্ছা করে। সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের ধর্মজীবন সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার শেষ নেই। সুদিরাম বসু লিখেছেন : ঝোঁকের উপর মনে হয় তিনি agnostic (সংশয়বাদী) ছিলেন। ইন্দ্র মিত্র লিখেছেন : এক সময় তিনি বলেছিলেন—'বয়স ঢের হয়েছে, ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোক একটিও দেখিনি। সকলেই নিচের দিকে তাকায়, উপরের দিকে কেউ তাকায় না।'[১৫] আজ যে প্রত্যক্ষ-ব্যাপার তাঁর চোখের সামনে উন্মোচিত হ'ল—এই অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাস সম্বন্ধে ধর্ম-ধারণার কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি? ঈশ্বরজাগ্রত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণঘন ভাবতরঙ্গ বিদ্যাসাগরের সোনাচাপা ফুলফুটুরীর দুয়ারে আঘাত দিয়ে দিয়ে দুয়ার একটু ফাঁক করতে পেরেছিল কি?

যে উনিশ শতকের প্রারম্ভ অদ্বৈতবেদান্তী রামমোহন রায় এবং সমাপ্তি বেদান্তকেশরী স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে সেই শতকে বাঙালী মনিষীদের মধ্যে দেখি বেদান্ত-সম্বন্ধে প্রচুর বিভ্রান্তি।

১৩। গুরুদাস বর্মন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ৩১৫

১৪। গুরুদাস বর্মনের মতে 'মশাই, ব্রহ্মের স্বরূপ কি?' বিদ্যাসাগরের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি গেয়েছিলেন। তাঁর মতে এটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম গান, কথামৃতকারের মতে তৃতীয়।

১৫। করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পৃঃ ৩৬১

শক্তির বিদ্যাসাগরও সেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেননি। ১৮৫০ খ্রীঃ ব্যালান্টাইন সাহেবের রিপোর্টের বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর কাউন্সিল-অফ-এডুকেশনের অধিকর্তা ময়াট সাহেবকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তারমধ্যে তিনি লিখেছিলেন : That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. উত্তরকালে প্রমথনাথ বিশী এই উক্তিটির গুরুত্ব বিবেচনা করে মন্তব্য করেছেন : আমার তো মনে হয়, প্রকান্তে বেদান্তকে ভ্রান্তধারণা ঘোষণা করাই দুঃসাহসী বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিকতম কার্য, তুলনায় বিধবাবিবাহ সমর্থন বা বহুবিবাহ-প্রতিকূলতা নিতান্ত ছেলেখেলা ; ঐ এক উক্তির দ্বারা ভারতের বহুযুগলক্ষিত সংস্কার ও অহমন্যতার মূলে আঘাত করিয়াছেন।[১৬] প্রমথনাথ বিশীর নিরিখে বিদ্যাসাগরের মহত্তম কীর্তি তাঁর বেদান্তকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা। সেই বিদ্যাসাগরই দেখছি ত্রিশ বছর পরে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সাগ্রহে বেদান্তদর্শন শুনছেন। বিভিন্ন জনের সংগৃহীত আলোচ্য সাক্ষাৎকারের তথ্যের মধ্যে কোথাও দেখি না যে বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ততত্ত্ব-সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার সময় বা পরে কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি তুলেছেন। ভারতীয় প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদান্ততত্ত্ব শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্ত-ব্যাখ্যা তাঁর উপলব্ধির ছাতিতে উদ্ভাসিত। নির্দ্বিধায় অনুমান করতে পারি, বিদ্যাসাগর এই প্রথম শুদ্ধাহিত বেদান্তসত্যকে একজন ব্যক্তির উপলব্ধিতে সংপ্রতিষ্ঠ দেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : ব্রহ্ম বিদ্যা-অবিদ্যার পার, ব্রহ্ম অনুভূতি—ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না ; সমাধিযোগে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় ; এরূপ সমাধি-উত্তীর্ণ অবস্থাই বিজ্ঞানীর অবস্থা। বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, সুমেরুবৎ। তাঁর সত্ত্ব, রজঃ, তম এই তিন গুণে সৃষ্টি হয়েছে জগৎ-সংসার। কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। যিনি গুণাতীত ব্রহ্ম, তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। জীবজগৎ মন বুদ্ধি ভক্তিবৈরাগ্য জ্ঞান এসব তাঁর ঐশ্বর্য। বিজ্ঞানী ভক্তি নিয়ে থাকে। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই শক্তিকেই সাধক মা বলে ডাকে। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরে ভালবাসা হয় ; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায় ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর সহজে মেনে নেবার লোক ছিলেন না, ছেড়ে কথা বলাও তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাঁর প্রতিবাদহীন সাগ্রহ শ্রবণ থেকে অনুমান করতে পারি কি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-উপস্থাপিত বেদান্তকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন ?

আলোচ্য কথোপকথন সমগ্র কথামৃতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠাংশ। সাড়ে চার বছর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বাস করেও মাষ্টারমশায় মুখে এরকম সংলাপ বেশী শোনেননি। এই সংলাপের বিবরণী উপস্থাপিত করে তিনি মন্তব্য করেছেন : যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতের ধারা অপ্রতিহতভাবে বয়ে থাকে। রসিক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মুখ্যতঃ শ্রোতার ভূমিকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এর ব্যতিক্রম

১৬। প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত : বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার, ১৯৫৭, ভূমিকা পৃঃ ৮।

দেখা যায় একবারমাত্র। বিদ্যাসাগর উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন একবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছিলেন যে ঈশ্বর বিভুরূপে এক, কিন্তু আধার অনুযায়ী শক্তিবিশেষের তারতম্য দেখা যায়। এ-কথা শুনে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেন: তিনি কি কাকুকে বেশী শক্তি, কাকুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ-ধাঁধানো প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। তাঁর কোন দ্বিধা নেই, কালক্ষেপ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোক দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো। তিনি হাসতে হাসতে আরও বলেন: তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কিনা? শ্রীরামকৃষ্ণের একথা শুনে বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসেন।

পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণ সংলাপের এই অংশ কয়েকবার উল্লেখ করেছিলেন। একবার তিনি পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে বলেছিলেন: শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললে, তিনি কি কাকুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, তবে একজন লোক একশ'জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন—যদি শক্তি না থাকতো? আমি বললাম, তুমি মানো কিনা? তখন বলে, 'হাঁ মানি।' (কথামৃত ৩।১।৬)

শ্রীরামকৃষ্ণের কথাশিল্প শ্রোতা বিদ্যাসাগরের মনকে গভীর থেকে গভীরে টেনে নিয়ে যায়, তাঁর সঙ্গীতময় যুক্তি-বিচার-উত্তীর্ণ অনুভূতির আভাস দেয়, মাঝে মাঝে হাসির উৎসারে দ্বিধা-সন্দেহের কুয়াশা দূরে ঠেলে দেয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার নাটক সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রজ্ঞার আলোকে পরিস্নাত বিদ্যাসাগর পূর্ণ পরিতৃপ্ত।

বিদ্যাসাগর ব্রজবাবুকে বলেন: কি চমৎকার কথা। ব্রজনাথ তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলেন: আজ্ঞে হাঁ, অতি চমৎকার। সূক্ষ্মদৃষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রজনাথের তোষামোদির ভাব অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনি একটি গল্প বলেন: ও-দেশে ব্যাদাই গ্রামে এক জমিদারের একজন লোক ছিল। জমিদারের মন যোগান তার কাজ। একদিন আমড়ার অম্বল চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না হয়েছে। জমিদার আমড়ার অম্বল খেতে খেতে বললে, 'আমড়ার অম্বল কেমন হে?' লোকটি বললে, 'মশাই, অতি পরিপাটি, আমড়ার অম্বলের মত কি আর অম্বল হয়?' আমড়া, জান ত, শাঁসের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, খালি আঁটি আর চামড়া; আবার খেলে হয়—অম্লশূল।' একথা শুনে বিদ্যাসাগর হেসে ওঠেন, উপস্থিত অন্যান্যরা হেসে ওঠে, শুধু ব্রজনাথ লজ্জায় মুখ নীচু করেন।[১৭]

সময় অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। তখন রাত্রি প্রায় নটা। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর যাবেন, তিনি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হন। তিনি এতক্ষণ ধরে পণ্ডিতাগ্রণী বিদ্যাসাগরকে উপদেশ দিয়ে চলেছিলেন, এবার তিনি বিনীতভাবে বলেন: এ যা বহুল, বলা বাহুল্য

১৭। শুকদাস বর্মন ও প্রতাপচন্দ্র হাজরার বিবরণী।

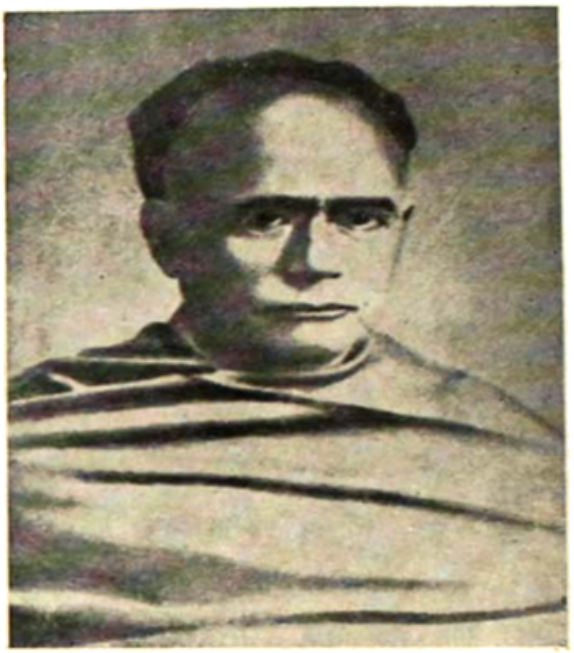

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়

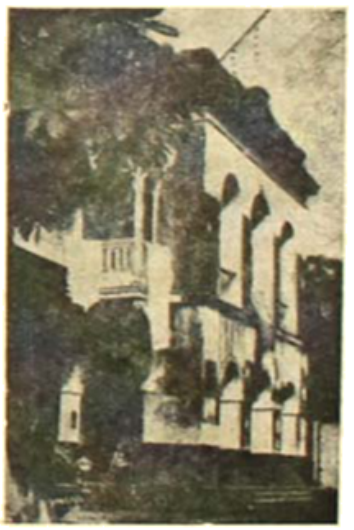

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যাসাগর সংঘ

আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই। বহুপরাজার ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। বহুপরাজার খপর নাই। বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) : তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম (সকলের হাস্য)—বা বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা অমৃতের সাগর। অমৃতসাগরের বারি নিরবধি, কিন্তু সুপেয়, ক্লান্তিহর, আনন্দপ্রদ। সামর্থ্য ও রুচি অনুসারে প্রত্যেকে গ্রহণ করে এই অমৃত। এর ফলশ্রুতি, প্রত্যেকের মন হয় প্রসন্ন, আনন্দে পরিপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে সাদর আমন্ত্রণ করেন, দক্ষিণেশ্বরে যাবার আমন্ত্রণ। বিদ্যাসাগরও আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।[১৮] শ্রীরামকৃষ্ণ ঘর থেকে বেরুবার আগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'মূলমন্ত্র' করে জপ করতে করতে ভাবাবিষ্ট হন। এখানে শ্রীম মন্তব্য করেছেন : অহেতুক কৃপাসিন্ধু। বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন। ঠাকুর ঘোড়ার গাড়ীতে ওঠার পর 'বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।' বিদ্যাসাগর হাত জোড় করে ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, এখন তিনি অন্যান্যদের মত ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।[১৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে চলে যান। বিদ্যাসাগর ও তাঁর পরিজনবর্গের জন্য আনন্দ-অমৃত যথেচ্ছ বিতরণ করে চলে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের গাড়ীর দিকে সকলের দৃষ্টি পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। অক্ষয়কুমার সেন লিখেছেন : যতদূর দেখা যায় দুয়ারে দাঁড়ায়ে।

পণ্ডিত গাড়ির পানে রহে নিরখিয়ে।
আশ্চর্য গণিয়া মনে প্রভুরে আমার।
কে এ প্রেমোন্মত্ত ব্যক্তি বালক-আচার॥

এই প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তির মধ্যে। এই মহামিলনক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় মথন করে উঠে এসেছিল এমন অমৃত ভাবসত্তা যা কালের সীমা অতিক্রম করে শাশ্বত প্রবহমান। এই অমৃত আস্বাদন করে আজকের কথামৃত-পাঠক প্রশ্ন করে এই সাক্ষাতের ফলশ্রুতি কি? এই অমৃত গ্রহণ করে বিদ্যাসাগরের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল কি, তাঁর জীবনদৃষ্টির কোন পরিবর্তন ঘটেছিল কি?

১৮। গুরুদাস বর্মনের বর্ণনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : আপনি যেতে পারবেন কি। বিদ্যাসাগর মহাশয় : সে কি মশায়, কেন যেতে পারব না, আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : আমরা ছেলে-ছিলি, খালবিলে যাই, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। আপনি জাহাজ, কেমন করে ছোট নদীতে যাবে। যদি চড়ায় আটকে যাও?

আবার একটি মহা হাসি পড়িয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু কি জানি কি ভাবিয়া আর উত্তর করিলেন না। হয়ত মনে করিলেন, বলিয়া লাভ ঠিক নহে, কারণ নানা কার্যে যদি নাই যাইতে পারেন। আশ্চর্য ব্যাপার, পরে রামকৃষ্ণদেবের কথাই ঠিক হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইচ্ছা করিয়াও আর ও হার নিকট যাইতে পারেন নাই।

১৯। মাস্টারমশায় ডায়েরীতে লিখেছেন 'Vid প্রণাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিক্রিয়ার কিছু কিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন সময়ের কথোপকথনের মধ্যে। যেমন এই সাক্ষাতের প্রায় এক বছর পরে ঠাকুরের মুখে শুনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের অন্তর-আয়নায় বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিসত্তার একটি নিবিড় ছবি পরিস্ফুট হয়েছে। ঠাকুর বলেছিলেন : বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেত, এত বাইরের যা কচ্ছে, সে সব কম পড়ে যেত; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেত। অন্তরে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর আছেন, একথা জানলে তাঁরই ধ্যান-চিন্তায় মন যেত।..... ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল।[২০] শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য করেছিলেন বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সব প্রস্তুত, শুধু উন্মোচনের পথটি আটকে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন সেই চাপা দেওয়া পাথরটা সরিয়ে দিতে, যাতে তাঁর হৃদয়-উৎস থেকে মধুর ধারা আপনা-আপনি উৎসারিত হয়। কথাবার্তার তাঁকে তিনি বোধ করি একবার সেই অনন্ত পাথরটা নাড়া দিতে চাইলেন; তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমার কি ভাব?' শ্রীরামকৃষ্ণের এই খোঁচাতেও তিনি সাড়া দিলেন না, প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেলেন। বিদ্যাসাগর উত্তর করেন : সেকথা আপনাকে একলা-একলা একদিন বলব।

অপরপক্ষে এই সাক্ষাৎকারে বিদ্যাসাগরের মানস-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য রেকর্ড নাই, তবুও এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নাই। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অতি সরল ও সুদৃঢ় বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিতেন। এইজন্যই পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। প্রথম সাক্ষাৎকারেই বিদ্যাসাগর মহাশয় পরমহংসদেবের সরলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন।[২১]

ইদানীংকালে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে অন্তরের সোনা বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর পরে তাকে সত্যই বিশেষভাবে চেয়েছিলেন, কিংবা পেয়েছিলেন কি-না, তা জানবার উপায় নেই।[২২] প্রণবরঞ্জন ঘোষ মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণের এখানে জয়ীর ভূমিকা। তিনি জয়ী, কিন্তু বিদ্যাসাগরকে পরাজিত না করে জয়ী। এই অবিস্মরণীয় সংলাপের তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঈশ্বরতন্ময়তার আলোকে বিদ্যাসাগরকে দেখা পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত প্রয়োজনীয় ঘটনা। দিনে দিনে আমরা এ-ঘটনার তাৎপর্য অনুভব করব।[২৩] এবং সুবোধ চৌধুরী প্রমাণ করতে চেয়েছেন বিদ্যাসাগরের কয়েকজন গুরুর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চম ও সর্বশেষ গুরু। তাঁর মতে আলোচ্য সাক্ষাৎকারের নীট ফল : বিদ্যাসাগরের মনে আবির্ভূত হয়েছিল সেদিন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ভাবসমাধি। বাকী জীবনটুকু অসুস্থতায় কাটলেও অন্তরের সেই নিস্তরঙ্গ ভাবটি আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মাটি চাপা সোনা বুঝি তাঁর প্রকৃত খবর জেনেছিল।[২৪]

২০। কথামৃত ১।৩।১
২১। বিদ্যাসাগর, ৪ সং, পৃঃ ৩১৬-১৭
২২। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ২ খং, পৃঃ ২১০
২৩। উদ্বোধন, ফাল্গুন ১৩৮৯, পৃঃ ৩৯৫
২৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর, ১৩৮২, পৃঃ ১৩৩

অনেকেই আভাষে-ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগরের মানস-প্রতিক্রিয়ার একটা আন্দাজ করতে চেয়েছেন, কিন্তু এ-সকল মূল্যায়ন মূলতঃ অনুমানাশ্রয়ী। এই সাক্ষাৎকারের ফলে বিদ্যাসাগরের কোন তাত্ত্বিক প্রাপ্তি হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু দুজনের সাক্ষাৎকার থেকে যে মাধুর্যমণ্ডিত রস উদ্ভূত হয়েছিল তার সম্বন্ধে সকলেই একমত। এই সাক্ষাৎকারের কথা ভাবলে আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি দৃশ্য। ভারতভূখণ্ডের দক্ষিণতম প্রান্তবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছি। উপসাগর, সাগর, মহাসাগর, সেখানে এসে মিলিত হয়েছে—মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। অনিন্দ্যসুন্দর অতুলনীয়-প্রায় একটি দৃশ্য—নিঃসন্দেহে অনন্তের একটি গবাক্ষ। এখানে দেবী পার্বতী এক-পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করেছিলেন, সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এখন তিনিই দেবী কন্যাকুমারীরূপে সকলের পূজা নিচ্ছেন; মুখে তাঁর আনন্দদীপ্তি, চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। এই প্রত্যন্তে বসেই গান্ধীজি লিখেছিলেন: আমি অন্তরীপে বসে লিখছি। আমার সম্মুখে তিনটি সাগর এসে মিলিত হয়েছে, তাদের মিলনে উদ্ভূত হয়েছে এমন দৃশ্য যা জগতে অতুলনীয়। এটা কোন জাহাজঘাটার নয়। দেবী কুমারীর মতই এখানকার তিন দিকের জল বিশুদ্ধ পবিত্র।[২৫] বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিলিত হয়েছিলেন—দয়া ও বিদ্যার সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল আধ্যাত্মিক মহাসাগর—এই মহামিলনে একটি যুগতীর্থের সৃষ্টি হয়েছে। যে-কেউ এই তীর্থে অবগাহন করবে সেই পরিতৃপ্ত হবে। উপরন্তু অবগাহন করে যদি কেউ আলোচ্য সংলাপের সার্থক অনুধ্যান করে, সে খুঁজে পাবে ভারতীয় মানসের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ, চিরন্তন জীবন সমস্যার একটি সার্থক সমাধান, সমাজবিচ্ছিন্ন ধর্মসাধনা ও সমাজমুখী কর্মসাধনার একটি সমন্বয়সূত্র। ধ্যান গভীরতর হলে সেই তীর্থসেবীর কাছে উন্মোচিত হবে অনন্তের প্রশান্তি।

●

॥ মহিষাসুরমর্দিনী ॥

ডক্টর শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর উপাখ্যানে অসুরাধিপতি মহিষাসুর দেবগণের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করে হয়েছিল স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র। যুদ্ধে পরাকৃত দেবকুল বিষ্ণু ও শিবের নিকট গিয়ে অসুররাজের অত্যাচারের বিবরণ দিলে কোপাবিষ্ট বিষ্ণু ও শিবের বদন থেকে মহৎ তেজ নির্গত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাদেরও দেহ থেকে তেজ নির্গত হয়েছিল। সকল দেবতার তেজরাশি একত্রিত হয়ে বিরাট জলন্ত পর্বতের আকার ধারণ করে এক অপূর্ব নারীমূর্তি পরিগ্রহ করলো। দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র ও ভূষণ দিয়ে এই তেজময়ী নারীকে সাজিয়ে দিলেন। এই দেবীই মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী-দুর্গা।

২৫। গান্ধীজির ১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৭-এ লেখা।

দেবতেজঃসম্ভূতা এই দেবী চিক্ষুর, উদগ্র, বাস্কল প্রভৃতি অসুর-সেনাপতি ও অসংখ্য দৈত্যসৈন্য বিনাশ করে মহিষাসুরকে বিনাশ করেছিলেন। মায়াবী দানব প্রথমে মহিষরূপ, পরে সিংহরূপ, মহাগজ, খড়্গধারী পুরুষ, ও শেষে পুনরায় মহিষরূপ ধারণ করে মহাদেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। দেবী মহাসুরের পৃষ্ঠে আরোহণ করে পদের দ্বারা কণ্ঠ নিপীড়িত করে বক্ষে শূল দ্বারা আঘাত করেছিলেন। অসুরও মহিষমুখ থেকে পুরুষরূপে অর্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় দেবীর শক্তিতে স্তব্ধ হলে দেবী খড়্গের দ্বারা তার শিরশ্ছেদ করেছিলেন।

মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা মহিষাসুরের পৃষ্ঠে এক পদ ও সিংহপৃষ্ঠে এক পদ স্থাপনকারিণী শূলাঘাতে অসুরের বক্ষঃস্থল বিদারণকারিণী মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর পূজা হয় শরৎকালে আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত। চণ্ডীর উপাখ্যানেই শরৎকালে দেবীর বার্ষিক মহাপূজার উল্লেখ আছে। দেবীর এই মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য প্রথম করেছিলেন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে, কালিকাপুরাণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র রাবণবধের উদ্দেশ্যে অকালে দুর্গাপূজা করেছিলেন ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে।

মহিষাসুরবধের উপাখ্যান বহু প্রাচীন। মহাভারতে পুরাণে এই কাহিনীর বৈচিত্র্যময় রূপ প্রচলিত। বামন পুরাণে (১৭ অঃ) ও দেবী-ভাগবতে (৫।২) মহিষাসুরের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। বামন পুরাণে রম্ভ ও করম্ভ নামক দৈত্যভ্রাতৃদ্বয় পুত্রলাভের জন্য পঞ্চনদের জলে তপস্যা করেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র কুম্ভীর হয়ে করম্ভকে গ্রাস করলে করম্ভের তপস্যায় রম্ভ অগ্নিদেবকে তুষ্ট করে ত্রিলোকবিজয়ী পুত্রবর লাভ করেছিল। তৎপরে দানবরাজ এক ত্রিহায়নী মহিষীকে উপগত হওয়ায় মহিষী কামরূপী শুভ্রবর্ণ মহিষাসুরের জন্ম দিয়েছিল। মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত অমরগণ একত্রে বিষ্ণু ও শঙ্করের নিকট নিজেদের দুঃখ নিবেদন করলে ক্রুদ্ধ দেবগণের বদন থেকে নির্গত তেজ মহর্ষি কাত্যায়নের আশ্রমে প্রবেশ করে। ঋষিসৃষ্ট তেজের দ্বারা দেবতেজ আবৃত হওয়ায় কাত্যায়নী দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল। (বা. পু. ১৮ অঃ)। ইনিই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা। দেবী মহিষাসুরের পৃষ্ঠে আরোহণ করে শূল দ্বারা কণ্ঠ বিদীর্ণ করেছিলেন। বিদীর্ণ কণ্ঠ থেকে নির্গত খড়্গধারী পুরুষকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করে দেবী মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন।

দেবী-ভাগবতে মহিষাসুরের উৎপত্তি-কাহিনী প্রায় একই প্রকার। দেবীভাগবতে মহিষাসুর প্রকৃতই একটি বিশালকায় মহাশক্তিমান মহিষ। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে সে কখনও মহিষ কখনও সিংহের রূপ ধারণ করতো। ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর স্ত্রী-বধ্য, পুরুষ-বধ্য নয়। ব্রহ্মার সঙ্গে দেবগণ যখন শিবের কাছে গেলেন মহিষাসুরবধের উপায় জানার জন্য তখন শিব ব্রহ্মাকে বলেছিলেন, প্রভো, তুমি বর দিয়ে দেবতাদের অনর্থ ঘটিয়েছ, এখন কি করার আছে? তার বলবান শর সর্বদেবের ভীতিপ্রদ। কোন্ নারী এমন শক্তিমতী যে বলদর্পিত অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? আমার ভার্যা বা তোমার ভার্যা যুদ্ধে যাবেন না, গেলেও তাঁরা কি করে যুদ্ধ করবেন? ইন্দ্রাণী যুদ্ধকুশলা নন।

তবৈতৎ কৃতং কার্যং বরদানাৎ পুরা বিভো।
অনর্থকং দেবানাং কিং কর্তব্যমতঃপরম্॥

ঈদৃশো বলবাহুরঃ সর্বদেবভয়প্রদঃ।
কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্॥
ন মে ভাষা ন তে ভাষা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি।
গচ্ছৈব তে মহাভাগে যুযুধাতে কথং পুনঃ॥
ইন্দ্রাণী চ মহাভাগা ন যুদ্ধকুশলাহি হি। (দে. ভা. ৫।৭।৪৯-৫২)

শিবের পরামর্শে দেবগণ গেলেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললেন, সকল দেবতার তেজ থেকে জাতা নারী দেবতাদের দ্বারা ভূষিতা হয়ে মহিষাসুরকে বধ করবে। তখন প্রথমে ব্রহ্মা, পরে বিষ্ণু, তৎপরে শিব ও অন্যান্য দেবতাদের শরীর-নির্গত তেজ থেকে অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মী-স্বরূপা মহিষাসুরহন্ত্রীর আবির্ভাব হয়েছিল। এই দেবী অষ্টাদশভূজা, ত্রিবর্ণা, শ্বেতাননা কৃষ্ণনেত্রা, রক্তাম্বরা।

ত্রিগুনা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্বদেবশরীরজা।
অষ্টাদশভূজা রম্যা ত্রিবর্ণা বিশ্বমোহিনী॥
শ্বেতাননা কৃষ্ণনেত্রা সংরক্তাম্বরপল্লবা। (ঐ ৫।৮।৩৩-৩৫)

দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে মহিষাসুর কখনও মহিষ, কখনও সিংহ, কখনও গজ, কখনও শরভ প্রভৃতি বহুবিধ রূপ ধারণ করেছিল। দেবী চক্রদ্বারা মহিষের মুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন।

এই দেবীমূর্তি মহিষমর্দিনী দুর্গারূপে পূজা পান না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত মূর্তির পূজা দেয়ে থাকেন। বামনপুরাণ ও দেবীভাগবতে অর্ধনিষ্ক্রান্ত অবস্থায় দেবীকর্তৃক মহিষাসুর-বধের কথা বলা হয় নি। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ ও দেবীভাগবতের বিবরণে অল্পবিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও মোটামুটি মিল আছে। কিন্তু স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে মহিষাসুর বধ করেছেন শিবগণ -অর্থাৎ শিবের অনুচরবর্গ। এখানে মহিষাসুরের নাম অমরকণ্টক। অমরকণ্টক বা দেবকণ্টক রুদ্রগণের সঙ্গে যুদ্ধকালে মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল। শিবের আদেশে দেবগণ (অথবা শিবগণ) শূল, মুষল ও শরজালের আঘাতে মহিষ-বেশী দেবকণ্টককে বধ করেছিলেন।

ততো দেবগণঃ দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং মহাসুরম্।
গর্জমানং মহানাদং ভ্রমমানং মহাভুজম্॥
বিভিন্নঃ শূলসঙ্ঘাতৈরসিভিঃ মুষলৈস্তথা।
সহস্র শরজালেন ভূমৌপ্যপাতয়ন্॥ (আবন্ত্য ১।১২-১৩)

দেবীপুরাণে মহিষাসুরঘাতিনী মহামায়া ঘোরাসুরকে বধ করেছিলেন। ঘোরাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধকালে ভয়ংকর মহিষরূপ ধারণ করেছিল।

প্রাবৃট্‌কালে সমায়ন্তী কালনীলাদ্রিসপ্রভঃ।
রক্তাক্ষো ভৈরবাকারঃ সুরাসুর ভয়ংকরঃ॥
দশবাহনকোটীনাং স হ্যেবৈকো বিনির্মিতঃ॥ (দে. পু. ২১।২২)

—বর্ষাকালে সমাগত নীলাদ্রিসদৃশ প্রলয়কালীন মেঘের মত, রক্তচক্ষুবিশিষ্ট, সুর ও অসুরের নিকট ভয়ংকর, কোটি সংখ্যক দশবাহন মহিষ দিয়ে সে একাই নির্মিত হয়েছিল।

মৎস্যপুরাণে মহিষাসুর তারকাসুরের সেনাপতি। গরুড় বাহন বিষ্ণুর অস্ত্রাঘাতে মহিষাসুর ভূপাতিত হলে বিষ্ণু বলেছিলেন: মহিষাসুর তুমি আমার অস্ত্রের বধ্য নও, পূর্বকালে ব্রহ্মা তোমাকে বর দিয়েছিলেন যে তুমি নারীর বধ্য হবে।

মহিষাসুর মতত্বং বধং নাস্ত্রৈরিহার্হসি।
যোষিদ্ধ্যঃ পুরোক্তোঽসি সাক্ষাৎ কমলযোনিনা। (মৎস্য ৫২।২৪)

স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডে কৌমারীব্রতধারিণী চমৎকারী দেবী মহিষাসুর নিধন করেছিলেন।

যয়া স মহিষঃ পূর্বং নিহতঃ দানবো রণে।
কৌমার ব্রতধারিণ্যা মায়া শক্তসহস্রযুক্। (স্কন্দ. নাগ. ১৪।৫)

মহাভারতে মহিষাসুরহন্তা কুমার স্কন্দ কার্তিকেয়। পুরাণে ও কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে কার্তিকেয়ের জন্ম তারকাসুর বধের নিমিত্ত এবং তিনি তারককে বধ করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতে কার্তিকেয়ের আবির্ভাব মহিষাসুর বধের নিমিত্ত। এখানে মহিষাসুর মহিষ নয়, মহিষ তার নামমাত্র—দানবো মহিষো নাম (বনপর্ব ১৯৪।৫২)। কার্তিকেয় মহিষাসুরকে এবং মহিষাসুরতুল্য শত শত দানব বধ করেছিলেন।

পুরাণের বিবরণগুলি পাঠে মনে হয়, মহিষাসুর মহিষাকার বিশিষ্ট নয়। সে মহিষের রূপ ধারণ করতো। নাম-সাদৃশ্যে তাকে মহিষী-গর্ভজাত বিশালকায় মহিষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

উক্ত বিবরণগুলির মধ্যে মহাভারতের বিবরণ নিশ্চয়ই প্রাচীনতর। মহিষ শব্দটি ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে সহস্র মহিষ-হন্তা বলা হয়েছে—

"যদি প্রবৃদ্ধ সৎপতে সহস্রং মহিষা অধঃ।
আদিত্তে ইন্দ্রিয়ং মহি প্র রায়ুধে।" (ঋক্ ৮।১২।৮)

হে সবস্তর অধিপতি ইন্দ্র, যখন তুমি প্রবৃদ্ধ হয়ে সহস্র মহিষ বধ করেছিলে, তখন তোমার মহিমা প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত হয়েছিল। মহিষাসুর বধ উপাখ্যানের এটাই মূল মনে হয়। সায়নাচার্য মহিষ শব্দে মহাশক্তিশালী বৃত্র প্রভৃতি অসুর বুঝিয়েছেন।

মহাভারতের উপাখ্যানে কার্তিকেয়ের দ্বারা নিহত মহিষ নামক অসুর মহাশক্তিশালী অসুর অর্থেই প্রযুক্ত। অমরকণ্টক ও ঘোরাসুরকে মহিষরূপে বর্ণনা করার মধ্যে এই তাৎপর্যই লুক্কায়িত আছে। কিন্তু পুরাণের গল্পে আসল অর্থ বাদ দিয়ে মহিষ অর্থে চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষকে লক্ষ্য করা হয়েছে। মহিষাসুর ছিল কামরূপী। সে কখনও গজ, কখনও সিংহ, কখনও মহিষ, কখনও বা মানবরূপ পরিগ্রহে সমর্থ ছিল। সুতরাং মহিষাকৃতি তার একমাত্র রূপ নয়।

দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মধ্যে কোন কোন পণ্ডিত ইতিহাসের ইঙ্গিত পেয়েছেন। তাঁদের মতে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমরপ্রিয়া ব্যাঘ্রযুগো (virgo) দেবীই দুর্গা। ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণ মনুষ্যের জাতিকে জয় করেছিল। মনুষ্যের জাতির কাছে মহিষ ছিল মূল্যবান এবং পবিত্র পশু। মনুষ্যের জাতিকে জয় করাই হোল মহিষাসুর-বিজয়। কিন্তু মনুষ্যের বিজয়কে ও মহিষবিজয়কে সমার্থকরূপে গণ্য করা এবং মনুষ্যের বিজয়ের সঙ্গে মহিষমর্দিনী দেবীর সংযোগ স্থাপন করা নিতান্তই কষ্টকল্পনা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের

অধিবাসীদের মনুষ্যত্বের বিজয় কিভাবে গৌড়বঙ্গে মহিষমর্দিনীরূপ পরিগ্রহ করলো তারও কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিকল্পনা ভারতীয় দেবভাবনার সঙ্গে অন্বিত এবং নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দেবীমূর্তির আবির্ভাব। ভারতীয় দেবকল্পনার মূলীভূত সূত্র,—সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন অগ্নি। সূর্যাগ্নির তেজ নানাভাবে জীবজগতের কল্যাণ সাধন করে থাকে। সূর্যাগ্নির শুভকর্ম অবস্থা অনুসারে ইন্দ্র, সূর্য, বিষ্ণু, পূষা, ভগ, বরুণ, যম, অশ্বিনীদ্বয়, উষা, সরস্বতী, অদিতি প্রভৃতি বৈদিক ও পরবৈদিক দেবতার পরিকল্পনা। এই দেবতাদের সমন্বিত শক্তি,—সূর্যাগ্নির তেজোরূপা মহাশক্তিই চণ্ডী—মহিষাসুরমর্দিনী। সূর্যাগ্নির অশুভনাশিনী যে শক্তি তাই মহিষাসুরমর্দিনী কাত্যায়নী চণ্ডী।

মহিষাসুরঘাতিনী দেবী সিংহবাহিনী। পুরাণানুসারে দেবতাদের তেজে দেবীর আবির্ভাব হলে হিমালয় দেবীর বাহন সিংহটিকে দান করেছিলেন। হিমালয়ে একসময়ে সিংহের বাস ছিল। দেবীও একসময়ে হিমালয়ে বাস করেছিলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভবধকালে দেবীর কোষ-নির্গতা কৌশিকী হিমালয়ে অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু মহাশক্তিরূপা দেবতেজোজাতা দেবী যেমন মানবদেহধারিণী নন, দেবীর সিংহবাহনও তেমনি পশুরাজ সিংহ নয়। হরি শব্দের এক অর্থ বিষ্ণু, অপর অর্থ সিংহ। বৈদিক বিষ্ণু সূর্যই। তিনি ত্রিপদে পৃথিবী পরিক্রমণ করেন, —বৎসরাদি কাল বিভাগ করেন। সূর্যাগ্নির তেজোরূপা যে বিশ্বের আদ্যাশক্তি মহাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশের হেতুস্বরূপিণী তাঁর বাহন সূর্যরূপী হরি বা সিংহ ছাড়া কে হবেন? ঋগ্বেদে (১।১৫৪।২) সূর্যবিষ্ণুই গিরিচর সিংহ—"মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠা"—বিশ্বে বিচরণশীল সিংহ সদৃশ ভয়ংকর। কালীবিলাসতন্ত্রে (১৮।৩৪) দেবী-বাহন সিংহকে বলা হয়েছে হরিরূপী বিষ্ণু—

সিংহস্তু হরিরূপোঽসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।
পার্বত্যা বাহনং ত্বং হি অতস্ত্বাং পূজয়াম্যহম্ ॥

বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারও সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং সিংহ সূর্যবিষ্ণুর প্রতীকরূপেই দেবীর বাহনত্ব করিত।

সিংহ এককালে সরস্বতীর বাহন ছিল। সিংহবাহনা সরস্বতীমূর্তি অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। বৈদিক উপাখ্যানে সরস্বতীর সিংহীরূপ-ধারণের কথা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। বৈদিক সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী—তেজোরূপা। সরস্বতী দুর্গা-চণ্ডী অপেক্ষা প্রাচীনা। দেবী দুর্গা নিশ্চয়ই সরস্বতীর কাছ থেকে বাহনটি অধিকার করেছিলেন।

সিংহবাহনা দেবতেজঃসম্ভবা দেবী মহিষাসুর বা মহাশক্তিশালী অসুর বধ করেছিলেন। অসুর শব্দ ঋগ্বেদের আমলে দেবতাবাচক ছিল। পরে অর্থের পরিবর্তনে দেববিরোধী শক্তিকে অসুর শব্দে বোঝানো হয়েছে, যে-কোন অশুভ শক্তি বা দেবতাদের মঙ্গলকর্মে বাধা সৃষ্টি করে তাই অসুর। দেবতাদের মত অসুরও কোন শরীরী জীব নয়। অসুরনিধনে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। তিনি কুয়, বল, শম্বর, পিপ্রু, নমুচি প্রভৃতি বহু অসুর বধ করে বিশ্বের অমঙ্গল দূর করেছেন। কুয়বধ ইন্দ্রের মহত্তম কর্ম। ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। তাঁরই কৃপায়

সপ্তসিন্ধু প্রবল বেগে প্রবাহিত হোত। বৃত্র শব্দের অর্থ আবরণকারী। যে প্রাকৃতিক অবস্থা বৃষ্টিহীন মেঘরূপে আকাশ ও সূর্যালোক আবৃত করে, অথচ বৃষ্টি নামতে দেয় না সেই অবস্থাই বৃত্র। ঋগ্বেদে বৃত্রের অপর নাম অহি। কুণ্ডলীকৃত মেঘই কুণ্ডলীকৃত অহি বা সর্প। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা বৃষ্টি-নিরোধক অশুভ শক্তিকে বজ্রাঘাতে বিনাশ করে বৃষ্টি এনে সপ্তসিন্ধুকে পূর্ণ করেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীও বৃত্রঘ্নী (৬।৬১।২) অর্থাৎ বৃত্রঘাতিনী। বৈদিক যুগে জ্যোতিঃরূপা সরস্বতীও দানবদলনী ছিলেন। সরস্ শব্দের এক অর্থ সুষলিলবতী। সরস্বতী যখন কেবলমাত্র বিদ্যাদেবীতে পরিণত হলেন তখন সরস্বতীর বাহনের সঙ্গে দানবদলন কর্মটি গ্রহণ করলেন দুর্গা-চণ্ডী। তিনি মহিষ অসুর অর্থাৎ মহাশক্তিশালী অশুভশক্তিকে বিনাশ করে বিশ্বে আনলেন মঙ্গল। যে অশুভ শক্তিকে অগ্নিপুত্র কার্তিকেয় বিনাশ করেছিলেন অথবা শিবের গণ বা অনুচর বিনাশ করেছিলেন, সেই শক্তিকে নিধনের ভার গ্রহণ করলেন মহাশক্তি চণ্ডী। মহাভারতে কার্তিকেয়-কর্তৃক বিচ্ছিন্ন মহিষাসুরের পর্বতপ্রমাণ মস্তক ষোড়শ যোজন পরিমিত বিস্তৃত ছিল। কোন প্রকৃতজীবের মস্তক নিশ্চয়ই এই আয়তনের হতে পারে না। ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের আদর্শেই মহিষাসুরের কল্পনা। আকাশের ঘন কালো মেঘকে মহিষ কল্পনা করা অস্বাভাবিক নয়।

এইভাবে হরিষাহনে তেজোময়ী-মহাশক্তি দশহাতে দশদিকের অমঙ্গলকে বিনাশ করছেন। মহাশক্তি মহামায়ার রূপকল্পনায় এই মহত্তর ভাব বিরাজ করছে। মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি কত অসুর বা মঙ্গল-প্রতিঘাতী শক্তির তিনি হন্ত্রী। এই অশুভ-নাশিনী মহাশক্তিকেই বাঙ্গালী জগজ্জননীরূপে মায়ের আসনে বসিয়ে অর্চনা করে প্রার্থনা করছে :

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরিশেষে একদিন স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু মিঃ লেগেটের বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিলেন অভেদানন্দ এবং সেইখানেই দেখা হয় মিস্ ম্যাকলিওডের সহিত। এইভাবে সকল কিছু ও সকল-স্থান দেখাশোনা করিতে প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল।

২৪শে আগষ্ট নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে স্বামী অভেদানন্দকে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। বহু নরনারীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী অভেদানন্দ তাঁহার লণ্ডনে থাকাকালীন কাজকর্মের বিশদ বিবরণ আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের বহু অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রীরা, শিষ্য-শিষ্যা ও বন্ধু-বান্ধবগণ। সকলেই স্বামী অভেদানন্দের মনোমুগ্ধকর তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনিতে আগ্রহী ও উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

স্বামী অভেদানন্দ অভিনন্দনের উত্তরে বলিলেন কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মসমূহ তিনি পরিচালনা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো-ধর্মমহাসম্মিলন ছাড়া আমেরিকার সর্বত্র ও সকল প্রতিষ্ঠানে কি কি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার একটি পরিচয় অতিসুন্দরভাবে তিনি বর্ণনা করিলেন। এইদিকে গুণগ্রাহী ভক্তমণ্ডলীরা ঐ সভায় স্বামী বিবেকানন্দের পরিবর্তে স্বামী অভেদানন্দকে পাইয়া একান্তভাবে আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামী অভেদানন্দের সরল মিষ্টি কণ্ঠস্বর, সাদাসিধা ব্যবহার, পবিত্রতা ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সভার শেষে বেদান্ত সমিতির অন্যান্য কর্মী ও সভ্যগণের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ পরিচিত হইয়াছিলেন। ঐ সভার সমিতির অন্যতম সদস্য গুডইয়ার-দম্পতি ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা মিস্ ওয়াল্ডো বা যতীমাতার সঙ্গেও স্বামী অভেদানন্দ পরিচিত হইয়াছিলেন এবং গুডইয়ার-দম্পতির সহিত পরিচিত হইয়া ও তাহাদিগের সহিত করমর্দন করিয়া স্বামী অভেদানন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন।

নিউ ইয়র্কের অভিনন্দনের পর স্বামী অভেদানন্দ ফিলাডেলফিয়ায় যান। তাঁহার যাওয়ার সকল ব্যবস্থাই করিয়া দিয়াছিলেন মিস্ মেরী ফিলিপস্। লণ্ডন হইতে নিউ ইয়র্কে যাইবার সময়ে পথে একজন ফরাসী কাউন্টেসের সঙ্গে স্বামী অভেদানন্দের পরিচয় হইয়াছিল। তিনি স্বামী অভেদানন্দের বেদান্তের আলোচনা শুনিয়া বেদান্তের সার্বভৌমিক ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে কেরোলীনার অতিথিরূপে কয়েকদিনের জন্য আমন্ত্রণও জানাইয়াছিলেন স্বামী অভেদানন্দকে। ফরাসী কাউন্ট্ দাদ্মার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে স্বামী অভেদানন্দ পাঁচদিন তাঁহাদিগের অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। আটলান্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত একটি অপূর্ব সুন্দর নগরী ফিলেডেলফিয়া। স্বামী অভেদানন্দ ২৭ মে ফিলেডেলফিয়ায় গমন করেন। কাউন্টেস ও কাউন্ট। এবং তাঁহাদিগের পুত্র সকলে মিলিয়া স্বামী অভেদানন্দকে একান্ত সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গৃহটি ছিল অতিসুন্দর এবং প্রাকৃতিক

মৃত্যু পূর্ণ। তাঁহাদিগের বাড়ীতে একজন নিগ্রো চাকর ছিল। নিগ্রোদের পূর্বপুরুষরা তুলার খামারে ক্রীতদাসের কাজ করিত। প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন্ তাঁহাদিগের দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিয়াছিলেন। ফলে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ হইয়াছিল। এখন নিগ্রোরা স্বাধীন এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরী করিয়া আমেরিকার সর্বত্র জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা একান্ত বিশ্বাসী। যাহাহউক কাউন্টস ও কাউন্ট স্বামী অভেদানন্দের নিকট হইতে বেদান্তের সার্বভৌমিক আদর্শ ও তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমেরিকায় বেদান্তপ্রচারে অভেদানন্দকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

●

॥ বৌদ্ধ-সম্মেলন ও বৌদ্ধচিন্তা—স্বামী অভেদানন্দ ॥

অনুবাদ—শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(তিন)

মহাযান ধর্মাবলম্বীদের ন'টি পাঠ্য বা ধর্ম হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সূত্র। অষ্টসাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতা, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরিক, লঙ্কাবতার, সুবর্ণ-প্রভাস, গন্ধব্যূহ, তথাগতগুহ্যক, সমাধিরাজ ও দশভূমীশ্বর গ্রন্থগুলি বৈপুল্যসূত্র নামে পরিচিত। এ সকল ছাড়াও নাগার্জুন, বসুবন্ধু, অসঙ্গ এবং আরও অনেকে মহাযান মতবাদের দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্য ১১০৮ খানি পুস্তক-সম্বলিত তাঞ্জুর এবং ৩৪৫৮ খানি পুস্তক-সম্বলিত কাঞ্জুরও উল্লেখযোগ্য।

মহাযান সাহিত্যের মতো মহাযান মতবাদও ধীরে ধীরে মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ নামে এক শাখা এবং বিজ্ঞানবাদ নামে দ্বিতীয় শাখায় বিকশিত হয়েছিল। কাশ্মীরে আরোপিত অষ্টসাহস্রিক-প্রজ্ঞাপারমিতায় আমরা শূন্যবাদের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখতে পাই। খ্রীস্টপূর্ব প্রায় ৪০০ অব্দে, দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলনকালে গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনা ভাষায় এবং খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতী ভাষায় গ্রন্থখানির অনুবাদ হয়েছিল।

বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূট পর্বতে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করছিলেন তখন সারিপুত্র সুভূতি, মৈত্রায়নীপুত্র এবং আরও অনেকে প্রজ্ঞাপারমিতার মূলনীতি সম্পর্কে একবার আলোচনা করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধ তাঁদের জটিল প্রশ্নগুলির মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। এই আলোচনা এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত প্রজ্ঞাপারমিতার বিষয়বস্তু গঠন করেছে। "প্রজ্ঞাপারমিতা" অর্থ হচ্ছে সর্বশূন্যতার চরম জ্ঞান। 'প্রজ্ঞা' অর্থ জ্ঞান, 'পারমিতা' অর্থ চরম।

কথিত আছে: "পরম জ্ঞানী বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্ব সর্বশূন্যতা জ্ঞাত হয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্জন করেছিলেন। এ অবস্থায় প্রতিটি জিনিসের কেবলমাত্র শূন্যতা থাকে, কোন বস্তুরই নাম বা চৈতন্য থাকে না।—এ অবস্থাকেই বলে প্রজ্ঞাপারমিতা। এ অবস্থায় কেউ কিছু স্মরণও করতে পারে না, আবার আশাও করতে পারে না। তার দেহে তখন এমন কোন স্থান থাকে না, যেখানে কেউ তাকে আঘাত কিংবা হত্যা করতে পারে। অস্ত্র, লাঠি বা ঢিল তার প্রতি নিক্ষিপ্ত হলেও তার দেহে পৌঁছাতে পারে না।" এভাবে যখন প্রজ্ঞাপারমিতা লাভ হয়, তখন মানুষ আনন্দ-বেদনায়, সুখে-দুঃখে নিরাসক্ত হয়ে থাকে। যোগ-সমাধিতে পৌঁছে লোকে সর্বশূন্যতার চরমজ্ঞানও লাভ করে। প্রজ্ঞা-পারমিতাকে মহাপারমিতাও বলা হয়ে থাকে। এ হচ্ছে সর্বোচ্চ জ্ঞান বা মহাবিদ্যা, সর্বোচ্চ বিজ্ঞান অর্থাৎ সর্বশূন্যতার জ্ঞান।

মাধ্যমিকদের নির্বাণ এই প্রজ্ঞাপারমিতা দ্বারা গঠিত। মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা বলে, আমাদের যাবতীয় অস্তিত্বই হচ্ছে শর্তযুক্ত। আমার অস্তিত্ব অন্যান্যদের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই কার্য-কারণ বিদ্যমান রয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর যথা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতির কোন নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। যেমন এ-সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নিজে নিজে বিদ্যমান থাকতে পারে না, তেমনি বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কারও। বস্তুর যদি নিরপেক্ষ অস্তিত্ব না থাকে, তবে তাকে শূন্য বলেই ধরতে হবে। সুতরাং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও অবশ্যই শূন্য হবে। এই সর্বশূন্যতার জ্ঞানই হচ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতা এবং চিন্তা ও দৃষ্টির জগতে শূন্যতাই হচ্ছে একমাত্র শর্তহীন সত্তা।

প্রজ্ঞা-পারমিতা এবং সর্বশূন্যতা আবার পরস্পর পৃথক নয়। এই শূন্যতাবোধ দ্বারাই আমরা শান্তি ও আনন্দের ধাম—নির্বাণ লাভ করে থাকি। কথিত আছে যে, ভগবান্ বলেন, "হে সুভূতে, সকল পদার্থেরই তাদের আশ্রয়—শূন্যতা আছে; তারা সে আশ্রয় পরিবর্তন করে না।" যে চিত্ত শূন্যতাবোধ লাভ করেছে, তা' অচিত্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ সে তা'র চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। তখন চিত্তকে বর্তমানও বলা চলে না, আবার অবর্তমানও বলা চলে না;—"তত্র অস্তিত বা নাস্তিত বা ন বিদ্যতে নোপলভ্যতে।" এভাবে সমগ্র অনস্তত্ব এই শূন্যতায় বিশ্লেষণযোগ্য। মাধ্যমিক দর্শনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যাখ্যাকার ছিলেন নাগার্জুন। তিনি অনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দের অধিবাসী ছিলেন। তিনি মাধ্যমিক-কারিকা রচনা করেছিলেন। চন্দ্রকীর্তি ছিলেন গ্রন্থখানির টীকাকার।

বিজ্ঞানবাদকে পরবর্তীকালে যোগাচার বলা হ'ত, কারণ এই মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার অসঙ্গ (৪০০ খ্রীস্টাব্দ) কর্তৃক লিখিত যোগাচার-ভূমি-শাস্ত্র* শিক্ষা দেয় যে, কোন কিছুতেই চরম বাস্তবতা নেই, এবং প্রত্যেকটি জিনিস বিজ্ঞান-অবস্থার মধ্য দিয়ে স্বপ্নের মতো পার হয়ে যাচ্ছে। এই দর্শন অনুসারে, সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতি (ব্যাপ্তি-বিজ্ঞান)

* মহাযান-সূত্র, মহাযানসম্পরিগ্রহ-শাস্ত্র, মহাযান-সূত্রালঙ্কার প্রভৃতি গ্রন্থেরও লেখক ছিলেন অসঙ্গ। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর বসুবন্ধু ছিলেন মহাযান-সূত্র, সদ্ধর্ম-পুণ্ডরিক, প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতির টীকাকার।

হচ্ছে মন-সরোবরে (আলয়-বিজ্ঞান) তরঙ্গের মতো। সুতরাং দৃশ্যমান বিষয়গুলি আমাদের নিজ নিজ মনের (স্বচিত্ত) সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। একমাত্র মায়ার জন্যই দৃশ্যমান বিষয়গুলিকে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় বলে মনে হয়।

যদিও এই শ্রেণীর আদর্শবাদ ও মাধ্যমিক মতাবলম্বীদের শূন্যবাদ একই সঙ্গে বিদ্যমান ছিল, তথাপি এর মহান্ শিক্ষক অশ্বঘোষ (১০০ খ্রীস্টাব্দ) বিজ্ঞানবাদের অন্যতম প্রাথমিক গ্রন্থ লঙ্কাবতার-সূত্রের শিক্ষা থেকে তথাগত-দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তথাগত-দর্শন শিক্ষা দিয়ে থাকে : "সকল বস্তুই তাদের মূল প্রকৃতিতে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার অতীত। কোন ভাষার মাধ্যমেই তাদেরকে প্রকাশ করা যায় না। তাদের মধ্যে চরম অস্তিত্ব (সত্যতা) বিদ্যমান। তাদেরকে রূপান্তর করাও যায় না, আবার ধ্বংস করাও যায় না। তারা এক আত্মা বা তৎস্বরূপতা (তুত-তথতা)।" এই তৎস্বরূপতার কোন গুণ নেই। এ কেবল বাক্যের মাধ্যমে কোনপ্রকারে প্রকাশ করা চলে মাত্র—যেমন, 'তৎস্বরূপতা'। যে মুহূর্তে তুমি বুঝতে পারবে যে, যখন সত্তার সমগ্রতার কথা বলা বা ভাবা হয়ে থাকে, তখন কিন্তু কোন বক্তাও থাকে না, কোন বক্তব্য বিষয়ও থাকে না; তখন চিন্তা করারও কেউ থাকে না, আবার চিন্তনীয় কোন বিষয়ও থাকে না। সেই অবস্থাই হচ্ছে এই তৎস্বরূপতা।

(ক্রমশ:)

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রসের সার্থকতা ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(ছয়)

ঐতিহাসিক পরিচয় : পাশ্চাত্যে বার্নার্ড বোসাঁকের (BernardBosanquet) অবদান সৌন্দর্যানুশীলনের ক্ষেত্রে অপরিসীম ও উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর *A History of Aesthesic* (first published in May, 1892) বা 'সৌন্দর্যতত্ত্বের ইতিহাস'-গ্রন্থে পনেরোটি অধ্যায়ে ও দু'টি পরিশিষ্টে ও তাছাড়া *Three Lectures on Aesthetic*-গ্রন্থে সৌন্দর্য-সম্পর্কে বিভিন্ন মতের সন্নিবেশ ক'রে অতি নিপুণতার সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা লিখেছেন। পাশ্চাত্যের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও বর্তমানকালের সকল চিন্তাশীল দার্শনিকদের সৌন্দর্য-সম্বন্ধে মতবাদ ও সিদ্ধান্তের সন্নিবেশ করেছেন।

প্রথম পরিশিষ্টের শেষে অধ্যাপক বোসাঁকে symbolic, classical and romantic —এই তিন শ্রেণীর শিল্পের উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

(a) 'For *symbolic art* attains its most adequate reality and most complete application in *architecture*.....

(b) The *classical* type of art, on the other hand, finds adequate realization in *sculpture*.. ....

(c) The *romantic* type takes possession of *painting* and *music*, and in like manner of poetic representation.....Poetry, however, is conformable to all types of the beautiful.....

অধ্যাপক বোসাঁকে বলেছেন, শিল্পকর্ম একটি গোটা মানুষের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে, কেননা শিল্পী তার অন্তরের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি ছাড়া অন্য-কিছু নয়।

দার্শনিক ক্রোচে (Benedetto Croce) তাঁর *The Eessence of Aesthetics, Aesthetic as Science of Expression and General Linguistic, Guide to Aesthetics* প্রভৃতি গ্রন্থে সুন্দর ও সৌন্দর্যের আলোচনা দর্শন ও বিজ্ঞানদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে করেছেন। এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় প্রকাশিত *Aesthetic*-সম্পর্কে তাঁর আলোচনা—যা অধ্যাপক আর. জি. কলিঙউড ইংরাজীতে অনুবাদ করেছেন—তা উল্লেখযোগ্য, কেননা অতিসংক্ষিপ্তভাবে তিনি সৌন্দর্যতত্ত্বের মর্মকথার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, শিল্প দর্শনশাস্ত্র নয়, সাধারণ-বিজ্ঞান নয়, নাটকাভিনয় নয়, বক্তৃতার ক্ষেত্রে চাতুর্য নয়, কিন্তু শিল্প সুন্দরের পরিচয় দেয়—যে সুন্দর প্রতিটি মানুষের ও প্রাণীর অন্তরের মণিকোঠায় নিহিত থাকে। অধ্যাপক ক্রোচে Intuition and Expression এবং Expression and Communication আলোচনাগ্রন্থটিতে মন ও বাস্তব-পদার্থ, শরীর ও শরীরী-আত্মার মধ্যে সম্পর্কের উল্লেখ ক'রে শিল্প যে ধীরে ধীরে শিল্পীকে শুধু নয়—সকল চিন্তাশীল মানুষকেই শরীর থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি থেকে বোধির অতীন্দ্রিয় ধারণার দিকে পরিচালিত করে এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শিল্প তাই ইন্দ্রিয়রাজ্যে বাস ক'রেও অতীন্দ্রিয় রাজ্যে। আনন্দময়-ভূমিতে পরিচালিত করে শিল্পীকে ও শিল্পসেবী সকল মানুষকে।

সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশ্লেষণক্ষেত্রে বস্তুতন্ত্র ও বিজ্ঞান বা ভাবদৃষ্টি দু'রকম দৃষ্টির বিকাশ ও প্রচলন দেখা যায়—ইংরাজীতে যাদের বলা যায় realistic school and idealistic school. সুন্দর বা সৌন্দর্যকে ভাববাদীরা (idealists) বলেছেন 'beauty is not a quality of the object, but a mental construction or imaginative creation of the artist'. বিজ্ঞানী বা ভাববাদীদের মতে 'true nature lies in the Nature, and is idealised. Art is the informing spirit of matter, and makes it alive and responsive'. মনীষী ক্রোচের অভিমতও তাই, কেননা তিনি বলেন 'art is not the past participle but is the active voice, and it communicates a delicacy and delight to the stuff of matter'. সেজন্য শিল্পের যে আনন্দ—তা শিল্পীর সৌন্দর্যে প্রকাশ পায়। সেজন্য যথার্থ-শিল্প-সৌন্দর্যের যাঁরা দ্রষ্টা—তাঁরা প্রকৃতির স্বভাবসুন্দর পরিবেশ কিংবা মানুষের মধ্যে চিন্তা ও তার কাজকে ভাবময় করে, আর তাই সৃষ্টি করে নূতন-নূতন রূপ ও গঠন তাঁদেরই আন্তর-চিন্তাকে বাইরে

রূপায়িত ক'রে। তাই সৌন্দর্যের বা সুন্দরের মাধুর্য ও লাবণ্য থাকে প্রকৃতিতে বা প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে, কিন্তু শিল্পীই তাঁর ধ্যান-সমাহিত প্রচেষ্টায় ও আন্তরিকতার বাইরে প্রকাশ করেন সাধারণ মানুষের উপভোগের জন্য। মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) তাই বলেছেন যে, শব্দে নিহিত যে মোহনীয় শক্তি এবং কবিতার ছন্দে নিহিত যে সৌন্দর্যের প্রকাশ—তারা অভিব্যক্ত হয় বাইরের জগতে ভাবের উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গরূপে নিজের মহিমায় নয়, প্রকৃতিরই মহিমা ও মাধুর্যকে প্রকাশ করার জন্য। ক্রোচে ভাবের পূজারী ছিলেন, তাই সকল-কিছু সুন্দরের প্রকাশ ও উচ্ছ্বাসকে তিনি ভাবের অভিব্যক্তি বলেছেন—যে চিন্তা বা ভাবধারা লুকানো থাকে মহাপ্রকৃতির মধ্যে।

বস্তুতান্ত্রিক-ধারণার ও ভাবের বিকাশে Realism ও Idealism দু'টি ধারা থেকেই শিল্পে ও শিল্পসৌন্দর্যে ক্লাসিক্যাল ও রোমান্টিক-শিল্পচেতনার সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক পি. এন. শ্রীনিবাসাচারি তাঁর *Philosophy of the Beautiful* (1942)-গ্রন্থে ঐ দুটি ধারা-সম্বন্ধে বলেছেন: 'The preference for classical or for romantic art is largely a matter of temperament in the artist, or in the critic.....Classicism is based on the spirit of restraint and order which avoids eccentricity and extravagance. It believes in the importance of following conventions, as they have been arrived at by a study of the practice of the previous generation of great artists. Classical art seeks the universal in experience, and moulds its designs in forms of flawless beauty.....Romantic art, on the other hand, stries to combine strangeness with beauty'. কিন্তু ক্লাসিক ও রোমান্টিক উভয় শিল্পধারায় মধ্যে কিছু-কিছু আবার ব্যতিক্রম আছে—যা ভাবের বাস্তব-প্রকাশে আনে অসঙ্গতি ও বিরূপতা। তবে মনে রাখতে হবে যে, ঐ উভয় ধারাই পরস্পরে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক। তবে *Foundation of Aesthetic*-নিবন্ধ-লেখক অধ্যাপক ওডগেন (Odgen) ও তাঁর অনুবর্তীরা বলেন যে, শিল্পে যে কোন ধারার বা শৈলীর বিকাশ ও প্রবর্তন থাকলেও শিল্পীর প্রভাব ও প্রতিভাই শিল্পকে স্বতন্ত্রসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। শিল্প-সমালোচকেরা বলেন: 'The artistic genius has a divine vision of beauty or a flash of inspiration which cannot be accounted for by the logical intellect'; অর্থাৎ যথার্থ-সৌন্দর্যের প্রেরণা ও চেতনার উৎসকে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নির্ণয় করা যায় না, কেননা এই প্রেরণা ও চেতনা শিল্পীর মধ্যে অনেক সময়ে সহজাত থাকে এবং প্রতিভার প্রেরণায় বা আলোকে তা বাইরে ও শিল্পে প্রকাশ পায়। এজন্য 'genius is rare, but is not the monopoly of the previleged few'. ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁর অভিমতও তাই।

তাছাড়া শিল্পে আছে impressionism এবং expressionism ভাবের ধারণাশক্তিতে ও তার প্রকাশশক্তিতে। Impressionism-সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীনিবাসাচারী বলেছেন:

'Impressionism is a form of naturalism in which the artist's mind passively takes is the phenomena of nature or life, and portrays them as they are. Expressionism is opposed to this attitude' ; কেননা expressionism বা সৌন্দর্যের প্রকাশভঙ্গীর ধারায় শিল্পী তাঁর নিজের ভাবধারাকেই বিশেষভাবে রূপায়িত করে : 'He projects himself into what he creates, and is, as it were, the mystic in art'. জার্মাণ-দার্শনিক হেগেলের মতবাদ অনেকটা তাই, কেননা তিনি বলেন সৌন্দর্য বা সুন্দর তাকেই বলি—যা সত্য ও নিরাকার—তাকে আকারে সর্বসাধারণো প্রকাশ করা : 'beauty is the representation of reality in sensnous form'. সেজন্য হেগেলের মতে সুন্দর বা সৌন্দর্য হলো 'the synthesis of the abstract idea and the material given in sense-knowledge'. কিন্তু দার্শনিক হেগেলের এই অভিমত অধ্যাপক বোসাঁকে স্বীকার করেন না, কারণ বোসাঁকে বলেন যে, বস্তু-ছাড়া কোন বাস্তব-আকারই সৃষ্টি হতে পারে না। অধ্যাপক বোসাঁকের অভিমতে : 'Beauty arises when feeling finds a shape for itself through a plastic medium'. সেজন্য অধ্যাপক বোসাঁকের অভিমতে 'the soul of a thing is its body spiritualised'. অধ্যাপক বোসাঁকে তাই বলেন : যেমন কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত থাকে, তার প্রেরণা সৃষ্টি করে কবিতার শব্দ বা কথা, কিংবা চিত্রের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তার তুলিকার স্পর্শে ('In painting, it is the stoke of the brush or pencil')। দার্শনিক কোলরিজ (Coleridge) অনেকটা এই অভিমতই পোষণ করেন, কেননা 'Coleridge defines beauty as the subjection of matter to spirit so as to be transformed into a symbol, in and through which the spirit reveals itself'. দার্শনিক কোলরিজ প্রায় অধ্যাপক বোসাঁকেরই মতো বলেন যে, সৌন্দর্যের আশ্রয় বা আধারস্বরূপ কোন আকারের (বস্তুর) সহায়তা প্রয়োজন, কোন-কিছুর সাহায্য-ছাড়া অনুভূতির আকারে সুন্দর তার রূপকে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টি এ'থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং ভারতীয় সৌন্দর্যদৃষ্টির আলোচনার সময়ে আমরা এ'বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করবো।

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(২৬)

ভারত-শিল্পের আদর্শ : আমাদের কাছে তাই শিল্প-সঙ্গীত-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান—বস্তুত: জীবনের সমস্ত কর্ম ও চিন্তার একটিই পরম পরিণতি। আমাদের সমস্ত পথ-পরিক্রমাই পূর্ণের প্রাঙ্গণে গিয়ে সমাপ্ত হয়। অষ্টাদশ পর্বের বিশাল ব্যাপ্ত মহাভারতের সমস্ত কর্মোদ্যোগ শেষ পর্যন্ত মহাপ্রস্থানের অভিমুখে চলে গেছে। জীবনের যা কিছু আত্মপ্রকাশ শেষপর্যন্ত সমস্তই এক মহা ঐক্যে বিধৃত হয়ে আছে। সঙ্গীতে শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে আমরা সেই এক-এরই উপাসনা করি। "আমাদের দেশে তাই শিল্প ও সাহিত্যতত্ত্ব অবশেষে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-সত্যের ও তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। জগৎ ও জীবনের পশ্চাতে পরম সত্যের আবিষ্কারই আমাদের শিল্প-সঙ্গীতেরও মূল উদ্দেশ্য। শিল্পের মধ্যেই ব্যক্ত হয়ে আছে জীবাত্মার চিরন্তন ব্যাকুল অভিসার। শিল্পের মধ্য দিয়েই আমরা অন্বয় 'এক'-এর সঙ্গে মহামিলনে যুক্ত হই। ইহাই ভারততত্ত্ব।" শিল্প কখনো শিল্পের পরম লক্ষ্য হতে পারে না। শিল্পের জন্য শিল্প (Art for art's sake)—এক অর্থহীন অলীক প্রলাপ মাত্র, কোনো অর্থ বহন করে না। পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনের পথে জীবাত্মার সঞ্জল স্বচ্ছন্দ প্রগতির জন্যই শিল্প। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ছোট আমি' থেকে 'বড় আমি'তে উত্তরণে সাহায্য করে শিল্প ও সঙ্গীত। মহৎ শিল্প ও সঙ্গীত আমাদের বৃহতের অভিমুখে নিয়ে যায়। শিল্পের সর্বোচ্চ গুণ তার প্রতীকী অভিধা। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত মানবিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়ে একই অদ্বয়তত্ত্বের প্রকাশ মাত্র। তাই অন্যান্য শিল্পের মত চারুকলা, সঙ্গীত ও একধরণের আধ্যাত্মিক অভিসার। জীবনকে স্বীকার করেই জীবন ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার অভিযাত্রা। এদিক থেকে বিচার করলে সমগ্র শিল্প-সাহিত্য-চারুকলা-সঙ্গীত সবই ধর্মের অন্তর্গত। অনুভাবে গ্রন্থের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের ভাষায় বলা যায় : "ভারতীয় শিল্পবোধের ভিত্তিভূমি নিগূঢ় অধ্যাত্ম সত্য। ভারতবর্ষ পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রকৃতিকে উত্তরণের পথে অতিক্রম করে একটি মহৎ ভাবপ্রাপ্তিকে করেছিল আদর্শ। এই মহৎ ভাবটির স্বরূপ আবিষ্কার ক'রে যুগোপযোগী উপায়ে শিল্পসাধনার মধ্যে সেই ভাবটিকে আয়ত্ত করার পথনির্দেশ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।"—চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—৮২ পৃ:। পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে ভারতীয় শিল্পের ২টি বিশেষ আদর্শের কথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে : (১) বিশ্বাত্মবোধ ও বিশ্বকল্যাণ এবং (২) আত্ম উদ্বোধন বা অপাবৃত্তি। বস্তুত: যে কোনো মহৎ শিল্পেই এই দুটি গুণ অবশ্য কাঙ্ক্ষিত। স্বামীজী স্পষ্টতঃই বললেন : অন্তরস্থ সত্তার অকপট উন্মোচনই যথার্থ শিল্পকর্ম। বাইরের অলঙ্করণ ও কারুকার্য সেখানে তুচ্ছ। শিল্পসাহিত্য মানুষের চেতনাকে প্রসারিত করে, উপলব্ধিকে নিবিড় করে—মানুষকে বৃহৎ মহৎ হয়ে ওঠার অনুপ্রেরণা দেবে—একথা সত্য হলেও, নান্দনিক বিচারেও তাকে অবশ্য উত্তীর্ণ হতে হবে। আবার আড়ম্বর-প্রিয়তা। অতি অলঙ্কার-বিলাস—তাও বর্জন করতে হবে।

এই কারণেই স্বামীজী বললেন, "হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন আপেক্ষিকতাকে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ তত্ত্বচিন্তা উপলব্ধি বা প্রকাশ করা সম্ভব ; এবং প্রতিমা ক্রুশ বা চন্দ্রকলা প্রতীকমাত্র ; আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিবার অবলম্বন-স্বরূপ।" শিল্পক্ষেত্রেও এই একই তত্ত্বের প্রয়োজনা। প্রকৃতিই সমস্ত শিল্পের উৎস হলেও হুবহু প্রকৃতির চিত্রণ সার্থক শিল্প নয়। প্রকৃতিকে গ্রহণ করে প্রকৃতির পারে চলে যেতে হবে। ভারতদর্শনের উদ্গতি-তত্ত্ব (theory of sublimation) এখানেও প্রযুক্ত। পঙ্ক থেকে যেমন পঙ্কজের জন্ম, শিল্পও ঠিক তেমনি জীবন ও জগতের বস্তু ও উপাদান থেকে জাত হয়েও জীবন ছাড়িয়ে অন্য কোনো এক দূরের কথা উচ্চারণ করে। শিকড়-সন্নিধিতে রস সংগ্রহ করেও, ঊর্ধ্বায়িত শাখা-প্রশাখায় ফুল ফোটানো ও ফল ধরানোই বৃক্ষের সাধনা। অর্থাৎ নিসর্গ ও কল্পাদর্শের যথার্থ সম্মিলনই শিল্পের আদর্শ। অর্থাৎ—"আদর্শকে অতীন্দ্রিয়কে পরিস্ফুটন ভারতের অভিপ্রায়।" একটি রূপকল্পের মাধ্যমে স্বামীজী ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বললেন, "খাঁটি শিল্পকে পদ্মের সঙ্গে তুলনা করা যায় ; যা মাটি থেকে ওঠে, সেখান থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে, মাটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকে, তবুও তার পাপড়ি খুলে ছড়িয়ে থাকে উপরের দিকে। সুতরাং প্রকৃতিকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকতেই হবে। যেখানে সেই সংযোগ হারিয়েছে সেখানে শিল্পের পতন হয়েছে। তবু, প্রকৃতিকে অতিক্রম করতেও হবে শিল্পকে।" ইওরোপের অন্ধ অনুকরণে আমরা এই মাটির সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছিলাম বলেই স্বামীজী ভারতশিল্পকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসেই বিকারবাণী উচ্চারণ করলেন এবং যথার্থ পথের সন্ধান দিলেন।

ইউরোপীয় বাস্তববাদ ও ভারতীয় আদর্শবাদ : এইসব কারণেই ইওরোপীয় realism স্বামীজীর অপছন্দ। জীব-প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ তাঁর মতে মহৎ শিল্পের কখনো আদর্শ হতে পারে না। গ্রীক আর্টের মূল কথা প্রকৃতির হুবহু অনুসরণ, অপরপক্ষে ভারতীয় আর্টের মূল উদ্দেশ্য আদর্শকে প্রতিফলিত করা। তবু গ্রীস তার স্ব-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে স্বামীজী গ্রীস শিল্পেরও প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেটা হবে ভারতের পক্ষে পরধর্ম গ্রহণ। তিনি বললেন অন্তর্মুখ আধ্যাত্মভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হিন্দু সভ্যতায়, বহির্মুখ ঐহিকভাবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ গ্রীক সভ্যতায়। কিন্তু অনুকরণ ক'রে, স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে কেউ বাঁচতে পারে না। তাও আবার ইওরোপের শিল্পোন্নতিতে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ নিকৃষ্ট জাতি ইংরেজদের নকলনবিশী করা সবচেয়ে নিন্দনীয় পথ বলে স্বামিজী মনে করতেন। কারণ "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ"। ভিক্ষা দ্বারা, চালাকি দ্বারা কিছু অর্জন করা যায় না। "ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?" বললেন, "ইংরেজ জীবজন্তু আর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে এঁকেই গেল। তাদের জীবনে যেটুকু সৌন্দর্যবোধ তা এসেছে প্রাচ্যের সংস্রবে। ইংরেজ জীবনের মূল কথা utility আর আমাদের ভারতের, আর্ট। কোথায় বৌদ্ধ ও মুঘল শিল্পের প্রাণবন্ত ঐশ্বর্যদীপ্ত শিল্প-সমারোহ। আর কোথায় ইংরেজী শিল্প-স্থাপত্যের জগাখিচুরি বীভৎস রূপ। কোথায় তাজমহলের মহান্ ভাবসত্য, আলোয়ারের স্থাপত্যকীর্তি, রাজস্থানী পল্লীর স্নিগ্ধ শিল্পশ্রী আর বাকিংহাম প্যালেসের পাঁচটি

শেলী অবরজঙ্।" প্রাচীন ও গ্রীক শিল্প সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ এবং ফরাসীদের শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলেও তাঁর-শিল্পের হুবহু প্রকৃতির অনুকরণকে (Naturalism) তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পের মর্যাদা দিতে পারেন নি। কারণ তাঁর ধারণা, যে জাতটা যত materialistic, তারা Nature-টাকেই ideal বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের expression শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিকেই ideal বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই nature-এর শক্তি সহায়ে শিল্পে express করতে চেষ্টা করে।···প্রথমোক্ত শ্রেণীর জাতের natureই হচ্ছে "primary basis of art". আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ।" আবার বললেন, "মানুষ যে জিনিষটি তৈরী করে, তাতে কোনো একটা idea express করার নামই art। যাতে ideaর expression নেই, রঙ্-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art বলা যায় না।"—এই ভাবের ঐশ্বর্যে, মহত্তম আদর্শের রূপায়ণেই, এককথায় আধ্যাত্মিক ভাবপ্রকাশেই ভারতীয় শিল্পের সাফল্য ও উৎকর্ষ। চিত্রে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে ভারতশিল্পীরা জীবনের গভীরতম ভাবসত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। তবে পরবর্তীকালে বাস্তবকে একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে শুধুমাত্র ভাবের অনুসরণ ক'রে ভারতশিল্পের অধঃপতন ঘটে। এই অধঃপতনের অন্ধকার থেকে প্রথম মুক্তির সন্ধান দেন স্বামীজী। আধুনিক ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনকে স্বামীজীই প্রথম আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন,—বলা যায়, ভারতশিল্পের প্রাণসত্যকে আবার নতুন করে উন্মোচিত ক'রে জাতির কাছে তুলে ধরলেন স্বামীজী। এমনি করেই স্বামীজী ভগীরথের মত আধুনিক ভারতীয় শিল্পধারাকে তাঁর নিজস্ব পথে নতুন করে প্রবাহিত ক'রে দিলেন এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে গেলেন এবং সে পথেই পরবর্তীকালে এগিয়ে চলল ভারতশিল্পে আধুনিক যুগের মুক্ত প্রবাহ।

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসংগীত :—ডঃ সুধাংশুশেখর শাসমল, দে'জ পাবলিশিং। ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট। কলিকাতা-৭০০০৭৩

রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বর্ণকুঞ্চিকা : রবীন্দ্রসঙ্গীত : এক অভিনব মূল্যায়ন। মূল্য ৪০·০০ টাকা।

রবীন্দ্রপ্রতিভার অতলান্ত মহাসমুদ্রে অনুসন্ধানীদের প্রয়াস অব্যাহত; রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রসৃষ্টি-সমীক্ষার পরিধিও আজ বহুবিস্তৃত। রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের চাবিকাঠি যে রবীন্দ্রসংগীত, এতকাল পরে এ-প্রত্যয় সুপ্রতিষ্ঠিত করলো এই অসাধারণ গ্রন্থটি। ধ্বনি-সৌন্দর্যতত্ত্ব ও বিষয়-রূপকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক-গবেষকদের কাছে বইটি দিকদর্শীরূপে চিহ্নিত হয়েছে। "তারা এই সুর নিয়ে শিল্প রচনা করে—ধ্বনির শিল্প"—রবীন্দ্রনাথের এই

সূত্রানুসরণে লেখক ধ্বনিবাদের কঠিন তত্ত্ব ও সূক্ষ্মকের বৈদগ্ধ্যভঙ্গিতনিতির তত্ত্বকে ধ্বনি-অনুপ্রাস-মিল, ছন্দমিল, উপমা, বাক্‌প্রতিমা, ভাষা-অনুসঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে যেভাবে অতিসহজ সন্তানী সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীত নয়, বিবিধ রবীন্দ্র-রচনার বিচার বিশ্লেষণে রসগ্রাহী লেখকের প্রয়োগপদ্ধতি একটি নবাবিষ্কৃত সূত্র হিসেবে গ্রহণীয় হবে। বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের ভাষাশিল্পের চরম পরাকাষ্ঠা এমন ছক-সারণী পরিমাপ-প্রক্রিয়ায় প্রমাণের চেষ্টা হয়নি ইতিপূর্বে। রবীন্দ্রসংগীত ও অন্যান্য রচনা অবলম্বনে বিদগ্ধগবেষক আশ্চর্য-বিশ্লেষণ, ভিন-এর রীতি, বাঁশি-বীণা, গান-সুর, দিনান্ত গোধূলি ইত্যাদি অনেক প্রসঙ্গ, শাব্দিক ও বৈষয়িক পর্যাপ্ত বিশ্লেষণ করেছেন, পদ-পংক্তির শত শত দৃষ্টান্ত-সারণী সংবদ্ধ করেছেন। রসগ্রাহী ও যুক্তিতথ্যসহ এই যে অপরূপ মূল্যায়ন-পদ্ধতি—এতাবৎ রবীন্দ্রালোচনার ক্ষেত্রে এ-কে ক্রান্তিকারী বলেই মনে করি। বক্তব্যে ও অতিচমৎকার গদ্যশৈলীতে ডক্টর শাসমলকে পুরাদস্তুর রাবীন্দ্রিক বলেই স্পষ্ট চেনা যায়।

..."রবীন্দ্রসংগীতের তাৎপর্য-উদ্‌ঘাটন তাঁর দ্বারাই সম্ভব, যে একাধারে সাহিত্যরসিক ও সংগীতবিশারদ। এই আদর্শরসিকের জন্য ভবিষ্যৎ উৎকর্ণ হয়ে আছে।" (দ্রঃ ৩য় পৃঃ)। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতানুসরণে বলা যায়—আদর্শরসিকদের দলে ডক্টর শাসমল এক যোগ্য প্রতিভা। সাহিত্য ও সংগীতে স্বভাবজ দক্ষতা শুধু নয়, এই উভয় বিষয়ে সুদুর্লভ এ্যাকাডেমিক উপাধিও তিনি অর্জন করেন। কবিতা গল্পগান ইত্যাদি অন্যান্য শাখায়ও লেখকের অবাধ সঞ্চরণ আছে। লেখকের বৈদগ্ধ্য, অনন্যশীলতা, গদ্যশৈলী ও রবীন্দ্রমনন কতদূর পৌঁছতে পারে, এই গ্রন্থের সাড়ে চারশ পাতায় তা স্পষ্ট হয়েছে। চল্লিশটি অনুচ্ছেদের প্রত্যেকটিতে বিষয় ও রূপ (Content and Form)-প্রযুক্তির বিশ্লেষণে আমাদের চিনিয়ে দেয় বারংবার সেই আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথকে।

রবীন্দ্রচর্চায় নিমগ্ন এই নির্জন সাহিত্যিক সংগীতজ্ঞ গায়ক অধ্যাপককে সুধীসমাজে পরিচায়িত করিয়েছেন বর্তমানকালের দিক্‌পাল মনীষী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ভিন্নিট, দীর্ঘভূমিকায় ছন্দ ও ধ্বনির তত্ত্বসম্পর্কে তাঁর মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর আছে। গ্রন্থটিরও নানামুখী বিশেষত্ব সম্পর্কে তিনি নির্দেশিকা দিয়েছেন। রবীন্দ্রালোচনার ধারায় 'ধ্বনিরশ্মিত রবীন্দ্রসংগীত' এক অসাধারণ অভিনব সাহিত্যিক কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত।

চমৎকার বর্ণোজ্জ্বল প্রচ্ছদচিত্র, জ্যাকেট, প্লাষ্টিক কভার বাঁধাই ইত্যাদিতে এমন শোভন আকর্ষণীয় প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশ ক'রে প্রকাশক ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

—ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

মহামনীষী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ—হেমচন্দ্র চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মূল্য : ২৫·০০ টাকা।

শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সংকটের দ্বারা জীর্ণ-দীর্ণ ভারতমাতার একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, তিনি রত্নগর্ভা ; যুগে যুগে যার কোল আলো ক'রে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে ; সে আলোকচ্ছটায় পৃথিবী হয়েছে প্রোজ্জ্বল। এমনই এক ভারতরত্ন আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ। উনবব্বই বছরের বিশাল এক বিস্ময়কর মানুষ ও অতি-মানসের সম্যক পরিচিতি রচনা করা সহজ কাজ নয়। একই জীবনাধারে এত বহুমুখী মনস্বিতা ও প্রতিভার স্ফুরণ এবং আধ্যাত্মিক উত্তরণের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে যাই। তাঁর বহুমুখী জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলীর মধ্যে তাঁর অতলান্ত মনীষার স্বাক্ষর, তাঁর প্রকাণ্ড জীবনচর্যার মধ্যে বিপুল কর্ম ও ধর্মের সাধনা ও সিদ্ধি। লৌকিক ও মানবিক হ'য়েও তিনি লোকোত্তর, আধ্যাত্মিক এক পরমপুরুষ। এমন এক মহানজীবনের এক সুবোধ্য জীবনী উপহার দিয়ে লেখক সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

জীবনী বা জীবনচরিত রচনার জন্য লেখককে নির্লিপ্ত ও যুক্তিবাদী হতে হয়। যদি ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে জীবনী আহৃত হয়—তাহ'লে অপ্রাকৃত অলৌকিক বিশ্বাস কিংবা ভক্তি-কল্পনার প্রলেপে সে-জীবন বহুলাংশে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। আচার্য সাধক গোপীনাথের পূর্বোক্তপর অসীম পাণ্ডিত্য, অধ্যাত্মচেতনা, পরা-অপরাবিদ্যা, তান্ত্রিকতা ও সাধনতত্ত্বের বিপুল সমাহার থাকা সত্ত্বেও তাঁকে অধিকতর মানবিকভাবে ভারতবাসী পেয়েছে, এটা সৌভাগ্যের কথা। 'এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা'। যে মানিক অদৃশ্য নয়, অস্পর্শ নয়। তাকে পরমসুখে গলায় পরা যায়। নদিয়াচন্দ্র শ্রীচৈতন্য, বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কিংবা শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ অতি-মানসের স্তরে থেকেও ধূলি মাটির কাছে ছিলেন অধিক সত্য। True to the kindred points of heaven and home—আকাশচারী স্কাইলার্ক পাখীর কাছে মাটি ও আকাশ যেমন সত্য।

গোপীনাথের জন্ম, বাল্য-কৈশোর-যৌবন, পারিবারিক সুখসমৃদ্ধি তাঁর জীবনের অগ্রগতি ও প্রেয়োলব্ধান খুবই আকর্ষণীয়ভাবে গ্রন্থটিতে বিন্যস্ত। বোধকরি, বিরাট মানুষের বিরাট এক অশ্রুর কান্না গোপনে বাসা নেয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের জীবনীর পাতায় পাতায় সেই অশ্রুর অক্ষরেখা। গোপীনাথেরও তাই। "এ কান্না ঘুমের মধ্যে শিশুর কান্নার মতো।" (পৃঃ ৫)। এ কান্না সত্যান্বেষণে অগ্রসর করায়, কাঁঠালিয়া গ্রামের মানবশিশুকে দেবপুত্রে পরিণত করায়। সেই মহান জীবনের সমস্ত ঘটনার ক্রম সাজানো হয়েছে চমৎকার। এমন নিবিড় নিগূঢ় জীবনীচর্চার জন্যে লেখকের আন্তরিক প্রস্তুতি যে কতখানি—তা সর্বত্র পরিস্ফুট। এ জীবনকথা মাত্র নয়, এ এক অচিন্ত্য মহাশক্তির লীলা। বাংলা জীবনী-সাহিত্যের ধারায় গ্রন্থটি এক মহামূল্য সংযোজন। কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদে এমন শোভন প্রকাশনার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ডঃ অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রদ্ধা-বিনম্র প্রতিবেদনটি আমাদের অন্তরে সাড়া জাগায়, মহান 'চরিত্রামৃত' অবধানে উদ্বুদ্ধ করায়।

পঞ্চতন্ত্রের গল্প—প্রহ্লাদ প্রামানিক, ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ১২০০ টাকা।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে কল্পকথা-রোমান্স ইত্যাদির ব্যাপক আকর্ষণ ছিল। দেবদেবী মানুষ পশুপাখী ভূতপ্রেত ইত্যাদি নিয়ে নানাপ্রকার লৌকিক গালগল্প বা নীতিকথার প্রচলন হয়। ভারতে সংস্কৃত কাব্য-গল্প রোমান্স ও নীতিকথা হিসেবে কথা-সরিৎসাগর, বৃহৎকথামঞ্জরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি এবং পালি জাতককাহিনীর প্রচার হয়। ভারতীয় সংস্কৃত লেখকদের অসীম মনস্বিতার প্রভাব সারা ভারতে অন্যান্য ভাষাভাষীদের ওপরে পড়ে। ফলে অনুবাদের চল শুরু হয়। নীতিউপদেশাত্মক শিশু-উপযোগী গল্পকথাকেও সংক্ষেপে ভাষানুবাদ করে খণ্ডে খণ্ডে প্রচারিত করা হয়। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের প্রচলন অধিক দেখা যায়। শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামানিক সম্পাদিত পঞ্চতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ শিশুবর্ষে সানন্দ উপহার, যথাযোগ্যভাবেই ন্যাশন্যাল কাউন্সিল কর্তৃক পুরস্কৃত।

পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা মিত্রভেদ-মিত্রপ্রাপ্তি ইত্যাদি পাঁচভাগে নীতি-গল্প রচনা করেন। বর্তমান গ্রন্থে ৪০টি গল্প সহজ গল্পশৈলীতে রচিত এবং সুচিত্রিত—যা শিশুচিত্তকে প্রভাবিত ও উদ্দীপিত করবে। পুরাকালে দুঃশীল রাজপুত্রদের নীতিবোধে উৎসাহিত করার যে প্রয়াস শুরু করেছিলেন আচার্য বিষ্ণুশর্মা, একালের প্রজন্মের কাছেও তাঁর শুভেচ্ছার স্পর্শ পৌঁছে দেয় তাঁর অমর সৃষ্টি পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থটি।

কবিতা : চক্রবাল—জ্যোতির্ময়ী দেবী, সিস্টেম লাইব্রেরী, ১২·০০ টাকা।

কবিতার তত্ত্ব ও রূপকল্প যেমনই হোক না—কবিতার অন্তরে তার ভাব-রসই আসল প্রাণ। স্বতঃস্ফূর্ত অন্তর্ভাবনা ও উপলব্ধির ফলই হলো কবিতা। সে মনন্ময় প্রেরণা থেকে বিষয় ও তার ভাষাপ্রতিমা রচিত হয়। কবিতার আবেগ-কল্পনার অনিবার্য সম্পর্ক। কালে কালে কাব্যচিন্তার পরিবর্তন হয়েছে। বৈদেশিক মতবাদের প্রভাব পড়েছে এদেশে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যান্দোলন নিয়েছে অনেক বাঁক। কবি ও কবিযশঃপ্রার্থীদের ভিড় বেড়েছে। অজস্র নাম, অজস্র কাব্যকবিতা। তবু সবাই কবি নন, কেউ কেউ কবি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর চক্রবাল-গ্রন্থের ৭১টি কবিতার সবকটিকে ভাব-ভাষা-ছন্দে সার্থক বলা না গেলেও তিনি যে কাব্য-মনস্কতার অধিকারিণী তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কবিতাগুলিতে বিষয়-বক্তব্য ও প্রকাশের সরলতা, সমাজসচেতনা, অনুভূতির গভীরতা আছে। অস্পষ্ট কল্পলোক অপেক্ষা বস্তু ও মানবজীবনই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে অধিক। সেজন্যই অহল্যা, গান্ধারী, পরশুরাম, সূর্পনখা প্রভৃতির সঙ্গে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ নিবেদিতা প্রভৃতি চরিত্রের নবভাষ্য রচিত হয়। নারীমর্যাদা, দুর্নীতি-ভ্রষ্টাচার প্রশ্নে তাঁর কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়। একজন সম্মানিতা ঔপন্যাসিকের বয়সের বোধ ও অভিজ্ঞতা কাব্যাকারে রূপ নিয়ে বহুক্ষেত্রে একান্ত আস্বাদ্য হয়েছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।　　—ডঃ সুধাংশুশেখর শাসমল

Sri Ramakrisna-Sahasra-Stotram : by T. A. Bhandarkar & Prof Panchugopal Bandyopadhyay—translated by T. M. P. Mahadevan : Sri Ramakrisna Math—Mylapur-Madras, Ptice Rs. 20/-

ভারতীয় ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে অবতারবাদ ও তার তাত্ত্বিক মত প্রতিষ্ঠার আয়োজন সকল কালেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন পুরাণাদিতে বিষ্ণু-শিব-কৃষ্ণ-লক্ষ্মী-প্রমুখ দেবদেবীদের নামকীর্তন বা নামাবলী কীর্তন ভারতীয় ভক্তিরসের একটি প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ঐতিহাসিক কালেও বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব অবতারদিগেরও স্তব ও নাম-কীর্তনের বিরাট ইতিহাস। বর্তমান যুগে ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনার সর্বাধিক আলোড়নকারী দীক্ষাগুরু মহাঅবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠাকুর। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ধর্মীয় চেতনা, বিবেকবোধ ও ভক্তিরসকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছেন তিনি—এমন নজীর আর নেই। মানবরূপে এই অতিমানবের প্রথম পরিচয় প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রমুখ মহান শিষ্যবর্গ বিরাট ভূমিকা নিয়েছেন। নাম ও নামাবলী কীর্তনের দ্বারাই ভক্তিরসের প্রকাশ হয়েছে ভক্তমণ্ডলীতে। এভাবেই রামকৃষ্ণদেবের প্রায় দেড় হাজার নাম প্রচলিত হয়ে যায়। অবতার-সাধু-গৃহী-কবি-দার্শনিক-ধর্মসমন্বয়কারী বিশ্বাত্ম এই মহাপুরুষের স্তবরূপে শতনামের পরিচয় সংস্কৃত-বাংলা ও ভারতীয় প্রায় সব ভাষায় রচিত ও প্রচলিত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থে ২০০টি উজ্জ্বল সংস্কৃত শ্লোকের সহস্র নামকীর্তন। প্রচলিত-অপ্রচলিত নামগুলিকে কাব্যাকারে সংগ্রন্থন করেছেন লেখকদ্বয়। শাব্দিক-শৈলী, ধ্বনিঝংকার অনেক শ্লোককে রসগ্রাহী করেছে। যেমন কলাকলাপ নিষ্কাত (২৯নং শ্লোক), কৃপাধারঃ করুণঃ করুনেক্ষণঃ (৯১নং), মুরলীবীণা সম্মুদিত স্বরধ্বনি (১৮নং) ইত্যাদি।

নির্গুণ নিরুপাখ্য যিনি —পরম ব্রহ্মময় দিব্যজীবন যিনি—তাঁকে সগুণাত্মক উপাধিতে বিচার করা ছাড়া উপায় কোথায় ? রামকৃষ্ণ স্তাবলীর মধ্যে 'সহস্রনামস্তোত্রম্' বইটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। বইটির ইংরাজী টীকা-ভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি সাবলীল ও চমৎকার।

Myth Symbol Language (a Vivekananda perspective) by Ananda, Belur Math, Howrah.

প্রাচীনতম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বেদ-উপনিষদ-পুরানাদির গল্প বা কল্পকথাগুলিতে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্ব-সংকেত সর্বস্বরী সংস্কৃতি চেতনার প্রকাশ ছিল, ক্রান্তিকারী প্রাজ্ঞ ঋষিদের উদ্‌ঘাটিত জীবনসত্য-তাৎপর্য ও উপলব্ধ আত্মদর্শনের উদ্‌ঘাটন ছিল। পরবর্তী যুগে কুসংস্কার-অজ্ঞানতার আঁধারে বা আচ্ছাদিত থাকে। কিন্তু সে-সব উজ্জ্বল রচনার মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতি ও সমন্বয়ের সার উপদেশ-নির্দেশ ছিল, যার বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি স্বীকৃত হচ্ছে—এটা খুবই শুভলক্ষণ। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্যমণ্ডলী বিশেষ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দের গভীরতম উপলব্ধি ও ব্যাখ্যায় সেই 'মিথ-সিম্বলের' নতুনতর প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শ্রীআনন্দ এই গ্রন্থে সপ্রমাণ সে-সব বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রন্থকার অসীম পাণ্ডিত্য ও মননের পরিচয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু ধর্মীয় ও অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা লোকায়ত ও সর্বজনগ্রাহ্য না হ'লে তার সার্থকতা কতখানি? বিষয় ও প্রসঙ্গের বিভাগ ও সূচী থাকলে এবং ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার কাহিনীর সূত্রসংযোগ থাকলে ভালো হতো। তা সত্ত্বেও গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় ও স্মরণীয় হবে।

—ডঃ সুধাংশুশেখর শাসমল

সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ (৩য় খণ্ড)—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। প্রাচী পাব্‌লিকেশন্‌স্। ৩/৪, হেয়ার ষ্ট্রীট। কলিকাতা ৭০০০০১, পৃষ্ঠা—১৪৮ মূল্য: বার টাকা। প্রথম প্রকাশ-১৩৮৮।

ভারতবিশ্রুত মনীষী ও সাধক, মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ বিরচিত 'সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ' (৩য় খণ্ড) অধ্যাত্মধর্মী গ্রন্থ-সমাজে এক উজ্জ্বল সংযোজন। মহামহোপাধ্যায়ের জীবনে পাণ্ডিত্য ও অনুভূতির এক বিরল সমাবেশ ঘটেছিল। বহু উচ্চ কোটির সিদ্ধ পুরুষের সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি তাদের দিব্য জীবন, ও আত্মিক উপলব্ধি সাবলীল ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। অধ্যাত্ম মার্গের পথিকদের কাছে এই গ্রন্থ পাথেয়স্বরূপ।

বিষয়বস্তু অনুসারে গ্রন্থটিকে দু'টি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে সাধু দর্শনের বিবরণ—চৌদ্দজন মহাসাধক ও সিদ্ধাত্মার জীবনী। দ্বিতীয় পর্বের আলোচ্য বস্তু সৎপ্রসঙ্গ। সাধন ও অনুভূতি জগতের কয়েকটি দুরূহ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। যথা, শ্রীচক্রের অবতরণ ও বিশ্বসৃষ্টিরহস্য, অঞ্জনা রহস্য, আরোগ সাধন প্রভৃতি।

মহামহোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ সাধারণ সাধক-জীবনী-গ্রন্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক, একাধারে তথ্য নির্ভর, অপরদিকে বিশ্লেষণধর্মী ও অনুভববেদ্য। এই গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—তপন কুমার শী

প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ চতুর্থ ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

- এই চতুর্থ ভাগে ২৬টি পরিচ্ছেদ, একটি পরিশিষ্ট ও শ্রীশ্রীকথামৃত যে সাহিত্য ও দর্শন-মুখর একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থ তাহা লিখিত হইয়াছে।
- এই চতুর্থ ভাগের প্রধান আলোচ্য বিষয় : হটযোগ ও রাজযোগের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, প্রতিমাপূজার প্রতিপাদ্য বিষয়, ঈশ্বরের অবতরণ ও অবতারবাদ, ষটচক্রের বিশদ বর্ণনা ও সপ্তভূমির সাধনা, শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি, পঞ্চকোষসাধন ও তার ক্রম, বেদান্তে আনন্দময়-অধিকরণ ও পঞ্চকোষরহস্য, মন্ত্রসাধনা ও জপমালা, অনাহত বা অব্যক্ত-নাদ, ষ্টার-থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ, বিজয় গোস্বামী ও শ্রীরামকৃষ্ণ এবং পরিশিষ্টে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কৃষ্ণযাত্রায় নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। প্রায় সাড়ে-চারিশত পৃষ্ঠা, ডিমাইসাইজ। ছবি : শ্রীশ্রীভবতারিণী, শ্রীমা সারদাদেবীর একটি নূতন চিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হাতের লেখা এবং রামায়ণের পুঁথি-নকলের ২ পৃষ্ঠা, স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানমূর্তি, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের বেঞ্চিতে বসা একটি গ্রুপ-ফটো এবং শ্যামপুকুর-বাটির ৪টি ছবি।

মূল্য—পঁচিশ টাকা

প্রকাশোন্মুখ—

মন ও মানুষ—দ্বিতীয় ভাগ

অভেদানন্দ দর্শন—প্রথম ভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

উত্তরপুরুষেরা লাভবান হবে বলেই তিনি বৃক্ষরোপন করেন....

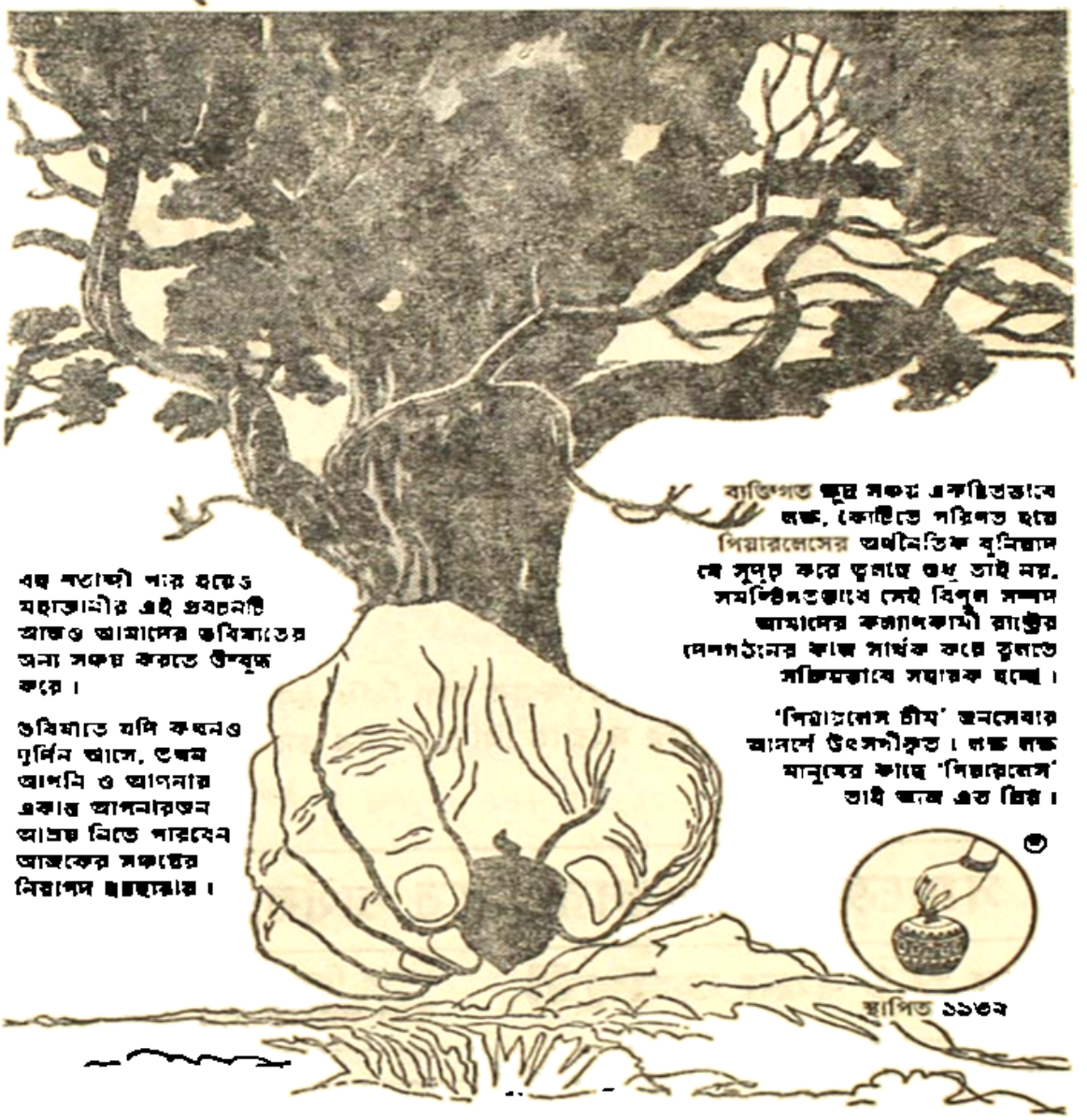

বহু শতাব্দী পার হয়েও মহাত্মাজীর এই প্রবচনটি আজও আমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে উদ্বুদ্ধ করে।

ভবিষ্যতে যদি কখনও দুর্দিন আসে, তখন আপনি ও আপনার একান্ত আপনারজন আশ্রয় নিতে পারবেন আজকের সঞ্চয়ের নিরাপদ ছত্রছায়ায়।

ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সঞ্চয় একত্রিভূতভাবে লক্ষ, কোটিতে পরিণত হয়ে পিয়ারলেসের আর্থনৈতিক বুনিয়াদ যে সুদৃঢ় করে তুলছে শুধু তাই নয়, সমষ্টিগতভাবে সেই বিপুল সম্পদ আমাদের কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দেশগঠনের কাজ সার্থক করে তুলতে সক্রিয়ভাবে সহায়ক হচ্ছে।

'পিয়ারলেস টীম' জনসেবার আদর্শে উৎসর্গীকৃত। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে 'পিয়ারলেস' তাই আজ এত প্রিয়।

স্থাপিত ১৯৩৮

দি পিয়ারলেস জেনারেল
ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস : পিয়ারলেস ভবন, ৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

★ ভারতের বৃহত্তম নন-ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান ★

কালোবাজারীর নাগপাশ না কাটালে সর্বনাশ

কোনও ফুলে ফলে বাড়ন্ত গাছে ঘুণ ধরলে যেমন তা ভেতর ভেতর ফোঁপরা হয়ে যায়, তেমনি কালো টাকাও দেশের অর্থব্যবস্থার ঘুণ ধরিয়ে দেয়।

এই পাপকে বাড়তে দেবেন না। এর জন্য সব কিছু নষ্ট হবে। এরই জন্য দরদাম বশে আসছে না।

কালো টাকা নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য বিধি এবং চোরা চালান রোধ ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিধি কঠোর ভাবে বলবৎ করা হবে।

এতে সমাজের উপকার হবে অর্থব্যবস্থা সুস্থ হবে

নতুন ২০ দফা কর্মসূচী

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন :

শ্রী ডি এন মোদানে
এ্যাসিস্টেণ্ট ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার
রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশন সেণ্টার
ডি. এ. ডি. পি.
৩১, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা—৭০০০৭৩

নাম _____
ঠিকানা _____
_____ পিন _____

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী অনুগ্রহ ক'রে এই সম্বন্ধে আমায় বাংলা ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন

davp 82/204

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই বছরটি একটি দুর্বৎসর। প্রথম দফার অনাবৃষ্টিজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে ওঠার আগেই আবার খরার কবলে পড়ে আমরা বৃহত্তর দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়েছি। সমস্ত রাজ্য জুড়েই এই খরার প্রকোপ চলছে। ফসলের অবস্থা বেশ খারাপ। ফলে, গ্রামাঞ্চলে মানুষেরা এক নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন।

এই বিপদের সময়ে আমাদের সকলেরই দেখা উচিত কী করে এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য চেয়েছি যাতে এই সংকটের মোকাবিলার জন্য আমাদের সামর্থ্য ও সংস্থান আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। খরাপীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। জনসাধারণের প্রতি নিঃস্বার্থ মমত্ববোধই এই অবস্থা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে।

আমি সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন।

—জ্যোতি বসু

মুখ্যমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলে সাহায্য করুন

ঠিকানা :—মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল, মহাকরণ,
কলিকাতা-৭০০০০১

আই. সি. এ.·····( )। ৮২

Space Donated By :—

S. PATRA

RAMCHANDRAPUR, JOKA,

24-PARGANAS.

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS CALCUTTA-700005

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটো

২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

স্থাপিত ১৯৩০, ফোন-৩৫-৪৬৩২

যশোহর কোম্ব ইণ্ডাষ্ট্রি কোঃ

প্রস্তুত কারক:- "SANKHA" ব্রাণ্ড চিরুনী ও 'JECY' ব্রাণ্ড পলিথিন পাইপ ইত্যাদি

১১৭ নং বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

কেশুতে পাতার রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিবাস পারফিউম প্রোডাক্টস প্রাঃ লিমিটেড

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট ফুগার-অফ-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

পঞ্চবিংশতি সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ৩০ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৌশলীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

হেড অফিস : "NEELAMBER", ২৮বি, শেক্সপীয়র সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ৪৪-৪০২৪, ৪৩-৪২৭৮/৯ টেলেক্স : ২১-২৫১১ TNGIN

ফ্যাক্টরী : ১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৫-১৬১৩

With Best Compliments From :— Phone : 24-4718

THE SMITAJA CHEMICALS PVT. LTD.

OUR PRODUCTS :—

ACTIVATED CARBON POWDER CRPH FOR CRITICAL APPLICATION;
ACTIVATED CARBON POWDER CRTECH FOR NON-CRETICAL APPLICATION;
ACTIVATED CARBON GRANULES FOR WATER TREATMENT AND OTHER USES;
ACTICARB-PI FOR PRINTING INK/PAINTS;
ACTICARB-RO FOR RUBBER.

Regd. Office : NARENDRAPUR 24-PARGANAS, WEST BENGAL

City Office : 30F, FREE SCHOOL STREET, CALCUTTA-700 016

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science		Reincarnation	
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi		Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion		Religion, Revelation and God	
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12 00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6 00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75 00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	
Ideal of Education		The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12.00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16.00	True Psychology	16 00
Memoirs of Ramakrishna		Universal Religion and Vedanta	12 00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	
Mystery of Death	18 00	Yoga : Theory & Practice	10.00
Path of Relization	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12 00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music	120.00	Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	16.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour		The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South-Asian Peoples Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its From' Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.

Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
44th Year, November 1982
VOL. IX

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6,Duff Street, Calcutta-700006
PRICE Rs. 1.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১·৫০টাঃ